# অপৌরুষেয় ১৯৭১

# অপৌরুষেয় ১৯৭১

অদিতি ফাল্গুনী

শুদ্ধস্বর

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে
শুদ্ধস্বর ২০১১

অপৌরুষেয় ১৯৭১ । অদিতি ফাল্গুনী

© লেখক

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১১
দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশক শুদ্ধস্বর
৯১ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা
৯৬৬৬২৪৭, ০১৭১৬৫২৫৯৩৯
shuddhashar@gmail.com
www.shuddhashar.com

প্রচ্ছদ শিবু কুমার শীল

মূল্য ২৫০ টাকা

ISBN 978-984-8972-29-8

Opaurusheyo 1971 by Audity Falguni
A publication of Shuddhashar

First published in February 2011
Second edition February 2012

Price ৳ 250 $ 4 £ 4

১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যে মুক্তিযোদ্ধারা হাত, পা, চোখ, কান সহ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ নানা অংশের আংশিক বা পূর্ণ প্রতিবন্ধকতাবরণের পাশাপাশি সারা জীবনের মতো হারিয়েছেন তাদের পৌরুষ শক্তি।

## সূচি

অপৌরুষেয় ১৯৭১ ৯
লেওয়াটানা নাচ-গাহেন আরো হাতি খেদালা উপকথা (লতাটানা গান ও হাতি খেদার উপকথা) ৭৩
বারগির, রেশম ও রসুন বোনার গল্প ৮২
পন্ডস ভ্যানিশিং ক্রিম ও সরলা কিস্কুর বিকেল ১০৬
বলো আমার নাম লাল ১১০
ইন্দুবালা, শিউলি ফুল ও মাঘন ঋষির মৃত্যু ১৩১
স্বপ্ন সংহিতা ১৪৯

# অপৌরুষেয় ১৯৭১

(প্রাক্-কথন ২০০০ সালে ঢাকার কলেজ গেইট এলাকায় অবস্থিত 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট' পরিচালিত 'যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা রোগ মুক্তি বিশ্রামাগার'-এ কিছু আহত মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গেলে সেখানে জনৈক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোদাচ্ছার হোসেন মধু বীরপ্রতীক একটি সাদা খাতায় লেখা তাঁর মুক্তিযুদ্ধ উত্তরকালে 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে'র গঠনের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী, মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত, জেনারেল জিয়াউর রহমান বা শাহ আজিজুর রহমানসহ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তথা জাতীয় ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের সাথে মুখোমুখি হওয়া বা তাঁদের কাছে থেকে দেখার স্মৃতিচারণার কিছু পৃষ্ঠা তুলে দেন। খাতাটা আমি ফটোকপি করে তাঁকে ফিরিয়ে দেই। ভুল বানান ও কাঁচা অক্ষরে লেখা হলেও ঐ স্মৃতিচারণায় স্কুল-কলেজের হিসেবে স্বল্পশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা মধু আমাদের জাতীয় ইতিহাসের কিছু অদেখা ও অজানা তথ্য তুলে ধরেছেন। লেখাটা কোথায় ছাপানো যায় সে নিয়ে বিস্তর ভাবনা সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনের নানা ব্যস্ততায় এ কাজে আর অগ্রসর হতে পারি নি। গতবছর কলেজ গেইটের ঐ বিশ্রামাগারে আবার গেলে জানতে পারি যে মধু আর বেঁচে নেই। অপরাধবোধ থেকেই মধুর সতীর্থ অন্যান্য প্রায় বিশ-বাইশ জন মুক্তিযোদ্ধার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি যা এখনো কোথাও মুদ্রিত হয় নি। মূলতঃ এই বাস্তব চরিত্রগুলো নিয়েই আমি আমার এই দীর্ঘ গল্পটি সাজিয়েছি। এখানে ব্যবহৃত মধুর দিনপঞ্জির পাতাগুলো সম্পূর্ণই বাস্তব। এমনকি বানান ও বাক্যগঠনের ভুল-চুকগুলোও অবিকৃত রাখা হয়েছে। অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের চরিত্রগুলোও বাস্তব ও তাদের নামগুলোও অবিকৃত রাখা হয়েছে। শুধু গল্পের কাহিনী গ্রন্থনাকারী উত্তম পুরুষের চরিত্র, সীমান্তে ভারতীয় চিকিৎসকের মতো এক/দু'টো চরিত্রই কল্পিত)।

**ধূলিঝড়ের এক সন্ধ্যায়**

বালিশের নিচে মধুর খাতাটা ছিল। খাতার সাদা কাগজগুলো হলদে হয়ে উঠেছিল। সুতো দিয়ে সেলাই করা। বছর দশেক আগে একবার শ্যামলী কলেজ

গেইটের পাশের এই বিশ্রামাগারে দিনভর অসহ ভ্যাপসা গরমের পর বিকেল বেলা হঠাৎই যখন ধূম ঝড় নামলো...ধূলা, বাতাসের মিহি ঠাণ্ডা আর গাছেদের পাতার নড়ানড়িকে একটু পরেই ভিজিয়ে দিয়ে নামলো বৃষ্টি...বারান্দা থেকে আমরা আমাদের হুইল চেয়ারগুলো টানতে টানতে ঘরের ভেতর ঢুকলাম। টি,ভি, আর তাস খেলা বাদ দিয়ে গল্পে মেতে উঠলাম। পাশাপাশি দুটো রুম। মধু ও মধু ছাড়াও আমাদের আরো দু'জনের বেড ছোট রুমটাতে পাতা। পাশের রুমটি বড়। সেখানে প্রায় পাঁচ/ছয়টা বেড। বৃষ্টি নামলে আমি, মধু আর সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজারের মান্নান আলী আমাদের ছোট ঘরটায় না ঢুকে বড় ঘরটায় পাবনার কেয়ামুদ্দিনের বেডের পাশে গিয়ে বসলাম। কেয়ামুদ্দিন সবেই তখন তার রবারের ডান পা'টি খুলে বিছানায় উঠে বসেছে। রবারের কালো পা'টা বিছানায় ঠেস দেওয়া। বেশ সুন্দর দেখতে। আমার যদি কেয়ামুদ্দিনের মতো একটা পা-ও থাকতো। তাহলে অমন আর একটা কালো রবারের পা আমারও হতে পারতো। তা' না। আমার তো দু'টো পা-ই কাটা গেছে। মধুরও তাই। কিন্তু, মধুর দুঃখ যে আমাদের তাও পেনিস আছে। মধুর তা-ও নাই। যুদ্ধে ওর পেনিস উড়ে গেছে।

'ও মধু! যুদ্ধে বুঝি তোর একারই গেছে? তুই ছাড়াও তো সেই যে দিনাজপুরের শাহ আলম, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার ঐ যে ছেলেটা যুদ্ধের পর ভেড়ামারা হতে ঢাকায় এসেছিল চিকিৎসার জন্য...এই কলেজ গেইটের এই বাড়িটাতেই...আমিই তো অন্তত দশ-পনেরো জনকে দেখলাম যাদের পেনিস নাই।'

মধু তিক্ত হাসতো, 'পুরুষের অঙ্গটা আছে বলে টেরটা পাও না!'

'এ তোর ক্যামন বুঝ? হাত-পা হারালে ও দিয়ে কি হয়?'

'হয়!' মধুর মুখ ভর্তি শ্বাস বের হয়ে আসতো। কেমন একটা রাগ আর ঘৃণা নিয়ে ও তখন আমার দিকে তাকাতো, 'তোমার কি? বড় লোকের ছেলে। তায় শিক্ষিত। তাতে পুরুষের অঙ্গটাও ঠিক আছে। বিয়েও তো হলো...সুন্দরী বউ।'

'শিক্ষিত? কই? আমার ত' কলেজ শেষ হলো না। দুইটা পা ইন্ডিয়ার হাসপাতালে ডাক্তাররা কেটে বাদ দিয়ে দিলো। দেশের বাড়ির এক গরিব আত্মীয়ের মেয়ের সাথে বিয়ে হয়েছে। সে মেয়ে ত' আমাকে নিয়ে সুখী না। ভাই-বোন, নতুন বউ...সব থাকতে আমার কেন ঢাকার এই কলেজ গেইটের বাড়িতেই থাকতে হয়?'

মধু এ কথার জবাবে খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে বিড়ি টানতো। তারপর হঠাৎই খেঁকিয়ে উঠতো , 'বলি...বাসর তো করছো? করছো না? দেশ থেকে চিঠিও তো আসছে যে বউ তোমার গর্ভবতী। হাত পা হারিয়েও তোমার লোকসান তো কিছু হয় নাই। বউ-বাচ্চা সবই তো আছে তোমার...পুরুষ মানুষের কানাই কি আর খোঁড়াই কি...সোনা থাকলেই হয়!'

এ কথার পর কিছুক্ষণ আমার মুখে আর কথা সরতো না। দূর, কি কথায় কি কথা সব এসে যাচ্ছে! আমি শুরু করতে যাচ্ছিলাম মধুর একটা সেলাই করা খাতার কথা দিয়ে। কিন্তু, সেকথা বলতে গিয়ে বলে ফেলছি ঝড়ের সন্ধ্যার কথা আর ঝড়ের সন্ধ্যার কথা বলতে গিয়ে সেটাও ঠিক বলতে না পেরে বলছি অন্য কথা। আপনারা...পাঠকেরা...হয়তো বিরক্ত হবেন। ভাববেন, এই লোকটি আসলে ঠিক কি বলতে চাচ্ছে? হ্যাঁ, আপনাদের বিরক্তি ঘটিয়ে পুরনো কাসুন্দি না ঘেঁটে আমার এই গল্পের বা বলা ভালো আমাদের এই গল্পের প্রথম লাইনটিতে আমি ফিরে যেতে পারবো না। কাসুন্দি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কাসুন্দি বা আচার আমাদের যা কিছু পুরনো ও যা কিছু স্বর্ণালী সেসবেরই সর্ষে বা বিবিধ মশলা মন্থিত যাদুঘর। যা বলছিলাম। আমি আর মধু যুদ্ধ করেছিলাম একই সেক্টরে। আমি...শাহরিয়ার হক...ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র...এবং মোদাচ্ছার হোসেন মধু...একটি ফ্যাক্টরির পার্মানেন্ট বা অস্থায়ী লেবার...আমাদের দু'জনের বয়সই তখন উনিশ। পুরো প্লাটুনে আমি একমাত্র শিক্ষিত ছেলে। ইপিআরের দু'জন, পুলিশের দু'জন আর সেনাবাহিনীর এক মেজর ত' আমাদের সেক্টর কমান্ডারই। বাদবাকি সবাই স্কুল কলেজের লক্ষণ গণ্ডি পার হতে না পারা ছোকড়া জোয়ান। শিক্ষার সাথে কি সাহসের বিরোধ থাকে কোন? নয়তো অস্বীকার করবো কেন... যে আমি সেই বয়সেই আর্মির মেজরের সাথে যুদ্ধের রণকৌশল বিষয়ে লেখা দেশী-বিদেশি নানা বই বাঙ্কারে শেয়ার করে পড়ছি, গেরিলা ওয়্যার স্ট্রাটেজির নানা বাঁক নিয়ে আলাপ করছি...রাতে খাবার সময় 'স্বাধীন' বাংলা বেতার কেন্দ্র' বা আকাশবাণী কি বিবিসির নব ঘুরিয়ে আমার স্বল্পশিক্ষিত সহযোদ্ধাদের শুনিয়েছি...আমি বরাবর ইংরেজিতে খুব ভাল... ইন্টারমিডিয়েটের পর ভার্সিটিতে ইংলিশ লিটারেচার পড়ার খুব শখ আমার... মধ্যযুগের চসার থেকে নবতম টি,এস,এলিয়টের কবিতা পড়তে আমার খুব ভাল লাগে...সেই আমি সত্যি বলতে শত্রুসৈন্যের সামনে রণহুঙ্কারে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় কেমন যেন জড়তা বোধ করতে থাকি। কিন্তু, এই মধু, আয়নদ্দি, চাঁন মিয়া কি সোলেমানরা অন্য সময় গুছিয়ে কথা বলতে জানে না, মাঝে মাঝে ভাল খাবারের জন্য চেঁচামেচি করে, ইংরেজি কেন...বাংলাও গুছিয়ে লিখতে বা বলতে পারবে না...তারা দেখি পাঞ্জাবি আর্মি ঠাসা থানা ঘেরাও করা, বর্ষার দিনে নৌকায় বসে উল্টো দিকে পজিশন নেওয়া রাজাকার নৌকায় ব্রাশফায়ার করা কি ব্রিজ বা সাঁকো উড়িয়ে দেবার জন্য মাইন পুঁতে রাখা...এসব কাজ তারা করে পাখির আয়াসে...আর, আমি বা আমরা যারা শিক্ষিত মানুষ...তারা যেন নিজের ছায়াটার সাথে লড়াই করতেই প্রাণান্ত হয়ে যাই...ছায়ার সাথে কত যে লড়াই! যুদ্ধে যেতে, কাউকে উজাড় করে ভালবাসতে, ঘুষ নিতে বা না নিতে, ঘৃণা করতে বা না করতে, সন্তানের পিতা হতে বা না হতে আমাদের শুধুই দোনোমোনো। অথচ, মধুর কোন ছায়া ছিল না

যার সাথে লড়াই করে তাকে দু'টুকরো হতে হবে। মধুর মতো মানুষদের ছায়া নেই। রাইফেল হাতে অ্যামুশ করতে, বাঙ্কারে ঘুমানোর সময় মাথার নিচে গ্রামের একটি হাসিখুশি মেয়ের ছবি রেখে দেখতে ও বন্ধুদের দেখাতে এবং এ সবের ফাঁকেই বর্ষায় দেশের বাড়ির আউশের বাড়ন নিয়ে ভাবতে কিম্বা ছেড়ে আসা ফ্যাক্টরির কাজের বেতন বিহারিরাই সব নিয়ে নিচ্ছে বলে লম্বা শ্বাস টানতে ওদের কোন খণ্ডন নেই। চসার বা কোলরিজরা কি আমাদের শুধুই খণ্ডন উপহার দেয়? তবে, এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর...আটটা মাস ওদের সাথে থাকতে থাকতে শেষের দিকে আমিও অনেকটাই ওদের মতো হয়ে উঠেছিলাম যেন! ভেতরের সব ভয় শেষের দিকে কেমন মুছে যাচ্ছিল। শেষ যুদ্ধে মধুই তো আমার হাত ধরে একদম সামনে টেনে নিয়ে গেছিল...আমিও কোন ভাবনা না করে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন জায়গাটায়...দু'জনেই আমরা আহত হয়েছিলাম সেই যুদ্ধে...আহত ও অচেতন...আহত হবার এগারো দিন পর আমাদের দু'জনেরই জ্ঞান ফিরেছিল সীমান্তের একটি হাসপাতালে...আমার দুটো পাই অ্যাম্পুটেড আর মধুর অ্যাম্পুটেড দুই পায়ের সাথে আরো ছিল না...

বেশ মনে আছে, ভারতীয় চিকিৎসক অমরেন্দ্র নাথ পাল আমার কাটা দুই পায়ের ব্যান্ডেজের উপর হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিলেন, 'ইয়ং ম্যান, ইউ আর আ কিড। তুমি আমার বড় ছেলের বয়েসি হবে। আমিও ওরিজিন্যালি পূর্ব বাংলারই মানুষ। তোমাদের বাবা-মায়েরা কি ভেবে তোমাদের ছাড়লো বলো ত'?' সেই চিকিৎসককে বলা হয় নি বাবা মা'র মতের কত যেন ধার ধেরেছি আমরা! রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছিলাম যুদ্ধে রিক্রুট হবার জন্য। দূর, কি বলতে কি সব বলছি! হ্যাঁ, আজ থেকে দশ বছর আগের কথা। জুন মাসের সেই দিনটায় সকাল থেকে অসহ্য গুমটের পর সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামলো। সেদিন আমি, মধু আর মান্নান আলী আমাদের ছোট রুমটায় না ঢুকে বড় রুমটায় কেয়ামুদ্দিন মোল্লার বিছানার পাশে গিয়ে বসলাম। গল্প ততক্ষণে জমে উঠেছে। রন্টু, আমাদের এই বিশ্রামাগারের কেয়ারটেকার ছেলেটা কোন্ দয়ায় কে জানে চানাচুর আর মুড়ি কাঁচা মরিচ-সরিষা তেল-পেঁয়াজ দিয়ে মাখিয়ে এনেছে! জীবন বুঝি কম সুন্দর? এই ময়লা তেল চিটচিটে বিছানা-বালিশ-কাঁথা কি ঝুল লাগা মশারির নিচে বসে তাস খেলতে খেলতে আমরা এমন সব দিনে যুদ্ধের গল্প করি। সবাই সবার সেক্টর, সেক্টর কমান্ডার ও সাব-সেক্টর কমান্ডার, ট্রেনিং, অপারেশন, ফাঁড়ি লুট, শত্রুর হাত থেকে অস্ত্র উদ্ধার, শত্রু খতম করা, আহত হওয়া...আমাদের গল্প কখনো ফুরাতে চায় না। আর কেউ না শুনুক বা না শুনতে চাক। আমরা নিজেরা কি নিজেদের বলতে পারি না? যেন কখনো না ভুলে যাই? বিশেষ দিনগুলোয় সাংবাদিকরা আসে। অনেক তাড়া তাদের। মাঝে মাঝে ধমকও লাগায় আমাদের। সংক্ষেপে শেষ করতে হবে কিনা তাই। আমাদের ভেতর কেউ কেউ

আবার ত্যাড়া। হাজার অনুরোধ করলেও ঠাঁই গেড়ে বসে থাকে। ফরিদপুরের নিজামুদ্দিন যেমন। আমারই মতো কলেজে পড়া ছেলে। আমার এক বছরের ছোট। যুদ্ধের সময় ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়তো। ভারি সুন্দর দেখতে। গরমের দিনে খালি গায়ে থাকলে ধবধবে হলদে পিচ্ছিল চামড়া...এই বিশ্রামাগারের শতেক ময়লার ভেতর ও এই বয়সেও কি করে এত সুন্দর? শুধু কোমর থেকে নিচটা অবশ। ওর মেরুদণ্ডে ছয়টা গুলি লেগেছিল। অথচ, পা কাটা পড়ে নি। কিন্তু, ঐ যে মেরুদণ্ডে গুলি? ফলে গোটা শরীরটাই অসাড়। একবার টিভি থেকে এক সুন্দরী সাংবাদিক এসে পঙ্গু নিজামকে দেখেও লাল হয়ে উঠছিল লজ্জায়। রূপবান পুরুষ দেখলে যে কোন মেয়ের যেমনটি হয়। নিজাম বুঝেছিল। মুখে ব্যঙ্গের বেঁকা হাসি নিয়ে মেয়েটিকে দেখে সে হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে সরে এসেছিল। মেয়েটি অনেক অনুরোধ করেছে তাকে কিছু বলতে। নিজাম শোনে নি। মেয়েটি কি আর জানে নিজামও মধুর মতোই শিশ্নহীন?

দূর...কি সব বলছি! সেদিন সন্ধ্যায় খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো। সামনে একটা বিশাল টিনের গামলায় মুড়ি-চানাচুর নিয়ে আমরা গল্প করছি। আমাদের বারবার বলা ও বারবার শোনা সব গল্প। এসব গল্প হয়তো আমাদের মৃত্যুর সাথে সাথেই কর্পূরের মতো মিলিয়ে যাবে। যাবে কি? কেয়ামুদ্দিন তার রবারের কালো ও সুন্দর পা'টি মাত্রই বিছানায় ঠেস দিয়ে বলছে, 'জানোই ত' তোমার যে দেশ আমার পাবনার চরতারাপুর ইউনিয়নের দীঘিগোয়ালবাড়ি। আমাদের দিকে যুদ্ধ শুরু হলো জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে। যুদ্ধের সময় আমার বয়েস ছেলো ১৯ বছর। আমরা ছেলাম ছয় ভাই এক বোন। কৃষিকাজ করতাম। একটু-আধটু ক্ষেতের কাজ আর বাদ বাকি সুমায়ে বাপের হোটেলে খাতাম। আমাদের গিরাম কিন্তু চর এলাকার মদ্যি। পদ্মা নদী চারদিকি ঘের দেয়া। এপারে কুষ্টিয়া, ওপারে পাবনা। মধ্যে রাজবাড়ি, পাংশা এই সব জাগা। যুদ্ধ বাঁধলি পরা আমি কুষ্টিয়ার জলঙ্গি বর্ডার পার হইয়ি চুয়াডাঙ্গা থেন মালদা গেলাম। সিখানে গৌড়বাগান ক্যাম্পে রিক্রুট হলাম। দিন চোদ্দ আমাদের পিটি-প্যারেড করিয়ে, শরীরটা একটু ফিট করার পর পাঠালো জলপাইগুড়ির পানিহাটা। সিখানে আরো আঠাশ দিন অস্ত্র ট্রেনিং করার পর জলঙ্গি আসি। সব মিলায়ে প্রায় আট/দশটা অপারেশনে অংশ নিই। পাবনা মেন্টাল হাসপাতালের সামনেও অপারেশন করিচি। তা' আমি কিনা আবার যুদ্ধ করিচি ৭ নম্বর সেক্টরে। দিনাজপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট আর ইদিকে পাবনার ফুলগাঁ পর্যন্ত এই ৭ নম্বর সেক্টরের মদ্যি ছেলো। এইখানে এট্টা কতা কই: আমার খালাতো ভাই কিন্তু রাজাকার ছেলো। সে থাকতো বুবলিয়া রাজাকার ক্যাম্পে। ইউনিয়ন বোর্ড অপিসে তারা ক্যাম্প করিছিলো। তা' ঐ ইউনিয়ন বোর্ড অপিসের আট/দশ মাইলের ভেতর কারেন্ট ছেলো না। একবার সন্ধ্যাকালে রাজাকাররা তাদের ক্যাম্পে হ্যাজাক জ্বালিলো আর আমরা বোর্ড অফিসের সামনে গিয়া ফায়ারিং শুরু করলাম। আমারি গুলি পিঠির পর লাগি এক

রাজাকার দেখলাম দোতলায় পড়ি গেলো। আমার পাশে ছিলো মঞ্জু। আমার সাথিরা তো রাজাকারদের সাথে আন্ধা-গোন্ধা (এলোপাতাড়ি) গুলি চালাতিছে। একটা গুলি আমার পায়ের গোড়ালির উপর লাগলো। সাথিরা আমার সাথে সাথে হাতের ব্লেড দিয়ি গুলিটা টাইনে ফাঁড়লো। ভাগ্যি গুলি খুব ভিতরে ঢোকে নাই। উপর দিয়া গিছিলো। আমরা ছিলাম ৩২ জন আর অরা ছিল ৫০ জন। ওরা বিল্ডিংয়ের উপর থেন (থেকে) গুলি চালাইছে আর আমরা নিচ থিকি এল,এম,জি, চার্জ করিছি। এক পর্যায়ে আমরা দু'পক্ষই যুদ্ধ থামাই। কিন্তু, পরের দিন...সে ধরো তোমার জষ্টি-আষাঢ়-শাওন-ভাদর মাসের দিন... দীঘিগোয়ালবাড়ি চরের সামনি দুইটা নৌকায় বিশ জনা করি আমরা চল্লিশ জনা মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র হাতে উঠিচি। গাঁয়ের লোক আবার আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ভাল জানতো। মনে করো একজনের বাড়ি দুইজন খাতাম কি আর একজনের বাড়ি গিয়া পাঁচজন খাতাম এমন আর কি। তা' আমার সেই রাজাকার খালাতো ভাই মাজে মইদ্যেই আমার বাড়ি গিয়া মা'কে বলছে, 'খালাম্মা, ওদের সারেণ্ডার করতি বলেন। ওদের যুদ্ধ থামাতি বলেন!' তা' যে দিনির কতা কচ্চি...সিদিন নদীর ভিতরে ভিতরে চরে তুষের ক্ষেত আর পাটের ক্ষেত...এইসময় দুইটা নৌকায় তো আমরা বিশ জনা করি চল্লিশ জনা মুক্তিযোদ্ধা...কেউ পানিতে আবার কেউ নৌকায় অস্ত্র হাতে...তখনি রাজাকারদের নৌকা আমাদের মুখামুখি। একটা এল,এম,জি,তে কিন্তু ২৮-৩২টা গুলি ভরা যায়। পাঁচ/ছয়টা ম্যাগাজিন থাকে। একজনের কাজ গুলি ভরা, একজনের ম্যাগাজিন টানা আর একজনের ফায়ার করার কাজ করতি হয়। আমাদের সাথে একটা ভাল ব্রিটিশ এল,এম,জি, ছেলো। তা' আমরা ফায়ার করা শুরু করলাম। দুই জন রাজাকার মারা গেলো। যাগো একজনা আমার খালাতো ভাই। এ ঘটনার পর আজ পর্যন্ত আমার খালার সাথে আমার মা'র কথা হয় নি।'

কেয়ামুদ্দিন এটুকু বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বৃষ্টির ছাঁট অসম্ভব বেড়েছে। জোর হাওয়া আসছে জানালা থেকে। রন্টু উঠে জানালা গুলো দিতে থাকে।

'আজ পর্যন্ত কথা হয় নি?' আমাদের ভেতর কে যেন জিজ্ঞাসা করে।

'না। ছোট বেলায় কত খালার বাড়ি বেড়াতে গিয়িচি...'

আরো একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কেয়ামুদ্দিন আবার এক মুঠো মুড়ি চানাচুর গামলা হতে তুলে মুখে পোরে। যেন সবকিছু অস্বীকার করতে চাইবার এক ঝাঁজ থেকেই ঈষৎ মাথা ঝাঁকিয়ে সে আবার বলা শুরু করে, 'আমি এই যুদ্ধে আহত হলাম। ঈশ্বরদী ব্যাক করি বাবুলছড়া ক্যাম্পে আমারে রাখা হলো। এখানে আরো ২৫০ মুক্তিযোদ্ধা ছেলো। কিছুদিন বিশ্রাম নেবার পর আবার যুদ্ধের শ্যাষের দিকি আমি অপারেশন শুরু করি। তকন সালিন্দির চরে মেন্টাল হাসপাতালের সামনিই ফাইট চলছে। চারপাশে মিলেশিয়া আর রাজাকার। পূর্ব-উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ...এই চার দিকে প্রায় ২৫০ জন মুক্তি...মানে বাবুলছড়া

ক্যাম্পের সবাই পজিশন নিছে। এইটা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের কতা। তারিক একদম ঠিক ঠিক কতি পারবো না। তা' সেই রাত একটার দিকে ফায়ার শুরু হলো। যারা গ্রেনেড চালায় তারা শত্রুর পঞ্চাশ গজ ও শুদু বন্দুকঅলারা শত্রুর একশ' গজের ভিতর থাকি যুদ্ধ শুরু করলো। সকাল পর্যন্ত দুই পক্ষেই গুলি চললো। সকালের দিকি মরতে লাগলো। উভয় পক্ষেই। আমি ২টা শার্টের উপর একটা জাম্পার পরা ছিলাম। একে শীত তাতে গুলিগালার কাজ। তাই সকালবেলায় দেখি কি পানি পিপাসায় আর এক পা নড়তে পারি না। আমার সাথিরা আমারে ডাক্তারবাড়ি নিয়া গিয়া সেলাই দিলো। আমারে কোলকাতায়ও পাঠানো হলো। সেখানে দুই মাস থাকি। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর দেশে আসি। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালেও ম্যালাদিন থাকলাম। তা' সেই ইন্ডিয়ার হাসপাতাল থেকে ফিরার পর থেকেই এই রবারের পা'টা সাথি হয়ে উঠলো আমার। এই রবারের পাখানাই আমার জীবন সঙ্গিনী...আমার শয্যাসঙ্গিনী!'

...ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে একটা হাসি ওঠে চারপাশ থেকে। কথাটা মন্দ বলে নি কেয়ামুদ্দিন। রাতে সে অনেক সময় ঘুমাতে গেলেও পাশে রবারের পা টা নিয়ে ঘুমায়। কেয়ামুদ্দিনের গল্প শেষ না হতেই বিশ্রামগারের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ বা আমাদের সবার মুরব্বি সিলেটের বিয়ানীবাজারের সোনাখিরা গ্রামের মোহাম্মদ আব্দুল রকিব বলা শুরু করে, 'আমার বয়স বর্তমানে হইলো আশি বছর। আমার দুই ছেলে দুই মেয়ে। যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম কৃষক। যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন আমার গ্রাম সোনাখিরায় রাজাকারের খুব উৎপাত। যন্ত্রণায় টিকতাম পারি না। আমি আওয়ামি লীগ করতাম। যুদ্ধ শুরু হইলে পরা...আমি চিরকালই দ্বিনের মানুষ...লম্বা দাড়ি ছিল...তা' পাতাইরখণ্ডি মাদ্রাসার মাওলানাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করলাম ফ্রন্টে কাজ করার জন্য দাড়ি শেভ করলে গুনাহ্ হয় কিনা। তিনি কইলেন 'দাড়ি নিয়াই যুদ্ধ করো।' তিন দিন পর বর্ডারের ওপারে রিক্রুটের লাইনে খাড়া হইলাম। এইটা ভারতের 'লোহার বল' ট্রেনিং সেন্টার। তো আমারে লাল কার্ড মানে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কার্ড দিছে। কিন্তু, ইন্ডিয়ান ব্রিগেডিয়ার আমারে কোন ট্রেনিং দিচ্ছে না। আমার বয়স তখনি চল্লিশের উপর। আবার লম্বা দাড়ি। উনি ভাবছেন আমার অনেক বয়স। তো বাঙালি সুবেদারকে বলছে কি, 'এ তো মুরব্বি আদমি। একে বেশি কষ্ট দিও না।' আমি কইলাম, না, আমারে ট্রেনিং দিতে হবে।' তিন মাস ট্রেনিং নিলাম। রাইফল, এল.এম.জি., স্টেনগান...সব কিছু চালানো শিখলাম। তিনমাস পর আমারে কইলো ফ্রন্টে যাইতে। পয়লা কইলো যে আপনি লাতু যান গিয়া। কইলাম লাতু আমি যাইমু না। তখন কয়, 'আপনি যান গিয়া বালিয়া ক্যান্টনমেন্ট।' গেলাম। সেইখান থেকে আমারে ইস্যু করছে দত্ত বাবু আর কর্নেল ওসমানী। আমারে কয়, 'সামনে খোরমা টি গার্ডেনে এক ব্যাটালিয়ন পাঞ্জাবি সৈন্য আছে। তুমি অপারশনে যাবার আগে রেকি করো।' আমি তাদের কাছে চারদিন সময় নিলাম আর কইলাম,

'আমি অপারেশনে আর্মি, ইন্ডিয়ান আর্মি কি বি.এস.এফ., নিতাম না। দশ/বারোজন মুক্তিযোদ্ধা শুধু সাথে নিমু।' তো সেইমতো রেকি করার পর খোরমা টি গার্ডেনের চারপাশ ঘেরিয়া ব্রাশ ফায়ার করার পর রিপোর্ট দিলাম। তারপর ইন্ডিয়ান আর্মি কিতা করছে আমি কইতাম পারি না। খোরমা টি গার্ডেনের পর চাম্পারণ টি গার্ডেন আর কাঁঠালবাড়ি টি গার্ডেনেও অপারেশন করি। কাঁঠালবাড়িয়া অপারেশনের সময় লাড়িতে (নিতম্বে) আর পায়ে গুলি লাগে। সেই থেকে আমি আতুর (অসুস্থ)।'

মুরব্বির গল্প শেষ না হতেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি মধু নেই। কই গেল?

'আমি একটু আসছি।' রুমে আড্ডার মৌতাতে জড়ো হওয়া সবাইকে বলে হুইল চেয়ারটা ঠেলে আমাদের ছোট ঘরটায় ঢুকে পড়ি। মধু হুইল চেয়ারে বসে খাটের উপর এক টুকরো কাগজ আর একটা শীষ কলমে কি যেন লিখছে।

'কি লিখছিস?'

'ডায়েরি।' মধু মুখ তুলে ওর কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফের ভেতর থেকে আমার দিকে তাকায়।

'ডায়েরি?'

মধু কোন উত্তর না করে ঘাড় নাড়ে। আমি অবাক হয়ে আমার এই সপ্তম শ্রেণী অবধি পড়ুয়া বন্ধুর লেখার ইচ্ছাটি অবলোকন করি। অথচ, আমি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ার অবধি পড়েছি। ইংরেজিতে সব সময় লেটার মার্কস থাকতো। আমাদের মফস্বল শহরের আটপৌরে মধ্যবিত্ত বাসাটায় বাংলা, ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদে প্রগতি প্রকাশনীর মুদ্রিত প্রচুর রুশ বই পাওয়া যেত। বাবার বই-পত্রের দিকে ঝোঁক ছিল। এই বিশ্রামাগারের বিকলাঙ্গ মানুষগুলোর ভেতর আমিই একমাত্র শিক্ষিত বিকলাঙ্গ। এই লেখা আমারই লিখবার কথা ছিল! মাঝে মাঝে ভেবেছিও যে সময় কাটাতে লিখি বা লিখব। কিন্তু, যুদ্ধ, যুদ্ধের পরের ঘটে যাওয়া সব ঘটনা, বঙ্গবন্ধুর ভুল আর পরাজিত পক্ষের পুনরুত্থান, ব্যক্তি আমি, আমার এই অবস্থা মানতে না পেরে প্রথমে বাবার স্ট্রোক, বাবার চলে যাবার অল্প কিছু বছর পর মা'র চলে যাওয়া, ভাইবোনদের নিজেদের জীবনের কক্ষপথে গতানুগতিক ব্যস্ত হয়ে পড়া, এর ভেতরেই চিরতরে কানাডা প্রবাসী হবার আগে আমার বড় আপার এক ধরনের দায়িত্ববোধ নিয়ে আমাকে বিয়ে দেওয়া, আমাকে নিয়ে আমার অসুখী ও রুষ্ট স্ত্রীর ওষুধ গেলার মতো সতীত্বে ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সাল অবধি তিনটি সন্তানের জন্মদান যারা প্রত্যেকেই আমারই মতো দেখতে (আমার ভাইবোনরা বেশ ভালই বলতে হবে; সম্পত্তিতে আমার বরাদ্দ অংশটুকু ছাড়াও মফস্বল জেলা শহরের আমাদের পৈতৃক বাড়ির পুরোটাই ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে...যেখানে আমার স্ত্রী আমার তিন সন্তানকে নিয়ে থাকে আর কিছুটা অংশ ভাড়া দেয়, সেই ভাড়ার টাকায় বেশ চলে...আমার অন্য চার ভাইবোন প্রবাসী...ইংল্যান্ড কানাডাসহ নানা জায়গায় বাড়ি-গাড়ি নিয়ে থিতু;

আমার ছোট বোনটা শুধু ওর স্বামীকে নিয়ে আজো আমাদের মফস্বল শহরেই রয়ে গেল...আমাদের পৈতৃক বাসা থেকে অল্প দূরেই একটা বাসা ভাড়া নিয়েছে...আমি বাড়ি গেলেই ও নানা কিছু রান্না করে নিয়ে আসে, আজো... এতবছর পরও সবকিছু মানতে না পারার দুঃখে ফুঁপিয়ে কাঁদে, ছোট বেলায় আমাদের দুই ভাইবোনের সঞ্চয় যত রুশ সাহিত্যের বই বা নতুন কেনা কোন ভারতীয় উপন্যাস...সবই সে আমি ঢাকায় ফিরে আসার আগে আমার ঝোলায় পুরে দ্যায় যেন বিশ্রামাগারে আমার সময় কাটে, নিজেকে হাজারবার গাল-মন্দ পাড়ে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা দেখতে পারে না বলে...আমার স্ত্রী আমার বোনের এই সব পাগলামি চুপ করে দ্যাখে, বেশ বুঝি আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা দেখার আগ্রহ তার নেই, আমার সন্তানরাও আমি গেলে যেমন খুশি হয়, তেমনি এক অজানা ভয় বোধেই বোধ করি দূরে দূরে সরে থাকে...আমার স্ত্রীও অবশ্য আমার জন্য রান্না করে নানা কিছু, রাতে আমার সাথে শোয়ও...এক অর্থে তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞই হওয়া উচিত...দুই পা কাটা একটি মেয়ের সাথে আমি নিজে কি শুতাম? যদি বাড়ি গিয়ে আমি তিন দিন থাকি, তবে অন্তত একটা রাতে সে ভাল একটা শাড়ি পরে, চুল ছেড়ে, চোখে কাজল দিয়ে আমার কাছে আসে...এই কি কম? কিন্তু যখন আমার হাঁটু থেকে নিচের দুই পা হীন কর্তিত আর নগ্ন শরীরটা নিজেকে মেলে ধরে তার অক্ষম, অসহায় বুভুক্ষায়...বেশ বুঝি ভেতরে ওর রুদ্ধ ঘৃণা...নিজেকে নিয়ে আক্ষেপ আর সেই সাথে মেয়ে হিসেবে কি দরিদ্র পরিবারের মেয়ে হিসেবে এই বিয়ে মেনে নেবার অসহায়ত্বে ও কেমন সিঁটিয়ে থাকে। সিঁটিয়ে থাকতে থাকতেই কেমন এক করুণায় আমাকে গ্রহণও করে...তিনটি সন্তানই আমার মতো দেখতে, ওর কোন প্রেমিক হলো না কেন? কিম্বা, হয়তো আছে যার কথা আমি জানি না?) ...সব কিছু ভাবতে গিয়ে মনটা এই বিকল শরীরের চেয়েও বিকলতর হয়ে পড়ে। তাই কি লিখব আর? কিন্তু, মধু কি লিখবে? কি লিখতে চায় ও?

সে কথাই জিজ্ঞাসা করি ওকে, 'কি লিখবি তুই?'

মধু মুচকি হাসে, 'ইতিহাস।'

'ইতিহাস?'

'হ্যাঁ, আমরা না লিখলে কারা লিখবে? এখন রাজাকাররাও ইতিহাস লিখতেছে। অথচ, যুদ্ধ তো আমরাই করছি। আমাদের লেখা উচিত না?'

সস্নেহে ওর পিঠে হাত রেখেছিলাম, 'অবশ্যই উচিত। কিন্তু, এই মাত্র এক পাতা কাগজে?'

'না, কালই রন্টুকে দিয়ে কাগজ আনাবো।'

...তেমনি হয়েছিল। পরের দিন সকালে রোদ উঠেছিল। রন্টু আমাদের জন্য সিঙ্গারা আর চা আনার পাশাপাশি মধুর জন্য কাগজও এনেছিল। সুঁইয়ে সুতা ভরে মধু খাতা সেলাই করলো। সেই ওর ডায়েরি লেখার শুরু। ঈষৎ লজ্জিত

মুখে বলতো, 'কি দ্যাখো? তুমি তো শিক্ষিত মানুষ। লেখা শেষ হইলে আমার বানান-টানান ঠিক কইরা দিয়ো।'

...মধুর সেই খাতার পাতাগুলো আজ দিন দিন হলুদ হয়ে যাচ্ছে। চার বছর আগে দেশের বাড়ি গিয়ে আর ফিরলো না! পরে অবশ্য ওর লাশ এসেছিলো এই বিশ্রামাগারে। ১৯৭২ থেকে ২০০৬...৩৪টা বছর ওর তো এখানেই কেটেছে। মৃত্যুর মাত্র বছর ছয়েক আগে গ্রামের বাড়ির এক বিধবা মহিলার সাথে ওর বিয়ে হয়েছিলো। মহিলা তিন সন্তানের মা। মধ্যবয়সিনী। বিয়েটা হয়েছিল দেশের বাড়িতে মধুর পোড়ো ভিটেবাড়িটা দেখার জন্য। সন্তান সঙ্গত কারণেই আর হয় নি বা হতে পারে নি। ওর বউ ঢাকায় এসে ওর অবশিষ্ট পেনশনের টাকা, কল্যাণ ট্রাস্টের ফান্ডের সামান্য যা কিছু বরাদ্দ সব নিয়ে গেলে আমার হাতে থাকলো শুধু সাদা সেলাই করা খাতাটায় লেখা মধুর ইতিহাস। তিন মাস আগে বাড়ি গিয়ে ছোট বোনের ছোট মেয়েকে দিলাম কম্পিউটারে এটা টাইপ করতে। গত মাসে আবার গেলে ছোট ভাগ্নি আমার হাতে তুলে দিল কম্পোজ করা কিছু কাগজের পৃষ্ঠা।

'কম্পোজিটর ছেলেটা বলছিল যে ডায়েরিটায় প্রচুর বানান ভুল আছে। দাঁড়াও, আমি প্রুফ দেখে দেব।'

' না- না- ওর ঐ ভুল আর কাঁচা বানানই এই ডায়েরির প্রাণ। খবরদার ওটা শুদ্ধ করতে যাস না।'

**দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে...**

'ইস্কান্দার যে! অনেকদিন পর!'

সাদা ধবধব পাজামা পাঞ্জাবি পরা ইস্কান্দারের চেহারা আজো খুবই সুন্দর। ফর্সা, হাল্কা-পাতলা আর মাঝারির চেয়ে কিছুটা বেশি লম্বা। একটা চোখে কালো ঠুলি। না, যুদ্ধ ত' ওকে অন্ধ বা খঞ্জ করেনি। তবে চোখে ঠুলি কেন? হাতে একটা লাঠি। ইস্কান্দারের পাশে সালোয়ার-কামিজ পরা এক ফুটফুটে তরুণী। ইস্কান্দার আমাকে চিনলো। যুদ্ধের সময় ভারতের লক্ষ্মৌয়ের সেন্ট্রাল মিলিটারি কমান্ড হাসপাতালে আমরা কয়েক মাস পাশাপাশি বেডে ছিলাম। আমার আঘাত নিরাময়যোগ্য হলো না বলে দেশে ফিরলাম হুইল চেয়ারে। ইস্কান্দার সুস্থ হয়েই ফিরেছে। এই রেস্ট হাউসে মাঝে মাঝে আসত বা আসে ইস্কান্দার। 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে'ই চাকরি করে। কিন্তু চোখে কি হয়েছে?

'তোমার চোখে ওটা কি পরেছো? কি হয়েছে?'

ইস্কান্দার উত্তর করলো না। উত্তর করলো ওর সাথে আসা মেয়েটি,

'আঙ্কেল, আব্বুর রিসেন্টলি ব্রেইন টিউমার ধরা পড়েছে। একটা চোখ হঠাৎ করেই আই সাইট লস করেছে। গলার স্বরও হঠাৎ করেই প্যারালাইজড্ হয়ে

যাওয়ায় কথা বলতে পারছেন না। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।'
ইস্কান্দার আমার দিকে তাকিয়ে পরিচিতের হাসি হাসলো। আমাদের এই বিশ্রামাগারে হাতের বাম দিকের অংশে আমরা থাকি। আর ডান দিকে একটা ছোট অফিস রুম। অফিস রুমের পাশেই একটা টিভি রুম। যেখানে পাশাপাশি কয়েকটা সোফা। অসুস্থ দিন-রাতের বেশ কিছুটা সময় এই টিভি রুমে চলে যায়।
'তুমি ইস্কান্দারের মেয়ে? তোমাকে কি আগে দেখেছি মা?'
'আব্বুর সাথে নানা কাজে-কর্মে আমার ছোট ভাইয়াই আসে। ভাইয়ার রিসেন্টলি বগুড়ায় একটা জব হওয়ায় ঢাকায় নেই। তাই আমাকেই আব্বুর সাথে বের হতে হচ্ছে। আমি শায়লা। ইউডায় বিবিএ থার্ড ইয়ারে অনার্স পড়ছি।'
'বসো।'
হাত দেখিয়ে বসতে বলি ওদের অফিস রুমের সোফায়। যুদ্ধে আধাআধি অসুস্থ প্রাক্তন সৈনিকেরা কখনো সরকারের কাছে ওষুধ খরচ, ডিসঅ্যাবিলিটির পার্সেন্টেজ অনুযায়ী ভাতার পরিমাণ নিয়ে দর-দস্তুর ইত্যাদি নানা আবেদন নিয়ে তেজগাঁওয়ের 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট' অফিস থেকে অসংখ্য সিল সাপ্পড় যুক্ত নানা চিঠি এনে চলে আসে এই বিশ্রামাগার অফিসের ইন-চার্জের কাছে। আবার ইন-চার্জের কাছ থেকে নতুন সিল সাপ্পড় ভরা চিঠি নিয়ে ছোটে 'কল্যাণ ট্রাস্ট' অফিসে। এই বিশ্রামাগারও 'কল্যাণ ট্রাস্টের'ই আওতাধীন। আমার মতো সম্পূর্ণ হুইলচেয়ার বন্দিরা থাকে সম্বৎসরকাল। ঢাকার বাইরের আধা অসুস্থ যোদ্ধারা বছরে এক/দু'বার চেক-আপ করতে আর যুদ্ধে পুরোপুরি চলৎশক্তি হারানো পুরনো সাথীদের দেখতে আসে এখানে। চেক-আপের সময়টা বিশ্রামাগারের অফিসেই তারা ডাক্তার পায়। ডাক্তার তাদের প্রেসক্রিপশন দেখে প্রয়োজনে ওষুধের রদবদল করেন। ঢাকায় অন্য কোন হোটেল বা আত্মীয় বাড়ি থাকার চেয়ে এই বিশ্রামাগারেই ক'দিন থেকে খেয়ে দিব্যি চলে তাদের। আসলে যুদ্ধে একবার আহত হলে...আমাদের মতো সম্পূর্ণ পঙ্গু না হলেও...শরীরটা আর কখনোই স্ববশে থাকে না। যত দিন যায় ততই ডিসঅ্যাবিলিটির পার্সেন্টেজ বাড়তে থাকে। যার হয়তো দশ বছর আগেও হাতে, কোমরে বা পায়ে পাঁচ পার্সেন্ট ডিসঅ্যাবিলিটি ছিল, দশ বছর পরে সেই ডিসঅ্যাবিলিটি হয়তো বেড়ে পনেরো বা কুড়ি পার্সেন্টে দাঁড়ায়। যুদ্ধের পরও লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারা কেউ কেউ ১৯৮০-৮১ সাল নাগাদ হুইল চেয়ার বন্দি হয়ে এখানে চলে আসে নি বাকি জীবনের মতো? ঢাকার ভেতরেও যারা আধা অসুস্থ যোদ্ধা...যারা জীবনের স্রোত থেকে আমাদের মতো পুরোপুরি ছিটকে পড়েনি... তারাও কখনো কখনো চেক-আপ বা প্রেসক্রিপশন আপডেট রাখতে কি কখনো আমাদের মতো সম্পূর্ণ অচল হয়ে যাওয়া সাথীদের দেখতে চলে আসে। ইস্কান্দার সুস্থ, সবল মানুষ। দিব্যি চাকরি করছিল। তার হঠাৎ কি হলো? মনে আছে লক্ষ্মৌয়ের সেন্ট্রাল মিলিটারি

কমান্ড হাসপাতালে আমি ওর দিন পনেরো আগেই ভর্তি হয়েছিলাম। আমি আর মধু। ইস্কান্দার...ভিন্ন সেক্টর আর ভিন্ন এলাকা...১১ নম্বর সেক্টর আর টাংগাইল থেকে যুদ্ধে আহত হয়ে এখানে এসেছিল। প্রথমে অবশ্য ওকে পাঠানো হয়েছিল মেঘালয়ের 'তুরা টেন্টস্ হাসপাতালে।' ইস্কান্দার আসার আগের দিনই দক্ষিণ ভারতীয় নার্স শ্রীলেখা আমাদের বলেছিল, 'অ্যানাদার বাংলাদেশী বয় ইজ কামিং টুমরো ইন ইওর ওয়ার্ড।' তামিল শ্রীলেখা কখনোই আমাদের সাথে হিন্দিতে কথা বলে নি। শ্রীলেখাই জানালো যে এই নতুন ছেলেটি অলরেডি এই হাসপাতালের পোস্ট অপারেটিভ সেকশনে বিশ্রামে আছে। আরো জানা গেল যে 'তুরা টেন্টস্ হাসপাতালে' পাঁচ দিন অচেতন থাকার পর সামরিক হেলিকপ্টারে করে লক্ষ্মৌ হাসপাতালে গত পরশু দুপুর বারটায় পৌঁছানোর পরই কোমর আর মেরুদণ্ডের নিচে যেখানে গুলি লেগেছে সেখানে অপারেশন করে গুলি সরানো হয়েছে। দু'দিন ইনটেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে থাকার পর আগামীকাল সন্ধ্যায় তাকে আমাদের এই ওয়ার্ডে আনা হবে। আসলে লক্ষ্মৌয়ের হাসপাতালে বসে আমরা সবসময়ই অপেক্ষা করতাম বাংলাদেশ থেকে, মুক্তিবাহিনী থেকে নতুন কেউ আসে কিনা!

...আহত হয়ে লক্ষ্মৌ হাসপাতালে পড়ে থাকার ঐ দিনগুলোয় মুক্তিবাহিনীর কতজনই ত' আহত হয়ে আসছে গেছে। ইস্কান্দারের আসার কথা এ কারণে মনে আছে যে ওর ঝোলায় ছিল 'রূপসী বাংলা।' স্ট্রেচারে করে সন্ধ্যায় যেদিন প্রথম আনা হলো তখন ওর হাতে স্যালাইন। অবশ্য সেন্স আছে। স্যালাইন তার খোলা হলো আর পরদিন সন্ধ্যায়। সেদিন আমাদের ওয়ার্ডের জানালা থেকে সন্ধ্যার রক্তবর্ণ আকাশ দেখে আমি কি ওর পাশের বেডে গুনগুন করে উঠেছিলাম: 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা!?' সেই অবর্ণনীয় সঙ্কট মূহূর্তেও কি সুর ভেঁজেছিলাম?

...ইস্কান্দার তার সদ্য স্যালাইনের সুঁই মুক্ত হাত কিন্তু ব্যান্ডেজ বন্দি কোমর নানা কসরতে নাড়িয়ে বেডের পাশের টেবিল থেকে ওর ব্যাগ হাতড়ে একটা বই বের করলো। আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, 'এটা দ্যাখো!'

'কি এটা? আরে 'রূপসী বাংলা!'

ও মিটিমিটি হাসে, 'আমার মনে হয় আমি সেন্সলেস হবার পর আমাকে তুরায় পাঠানোয় সময় কল্যাণই আমার ব্যাগে জামা-কাপড়ের সাথে এটা দিয়ে দিয়েছে।'

'কল্যাণ কে?'

'টাংগাইলের সাদত কলেজে আমরা একসাথে পড়তাম। একই সাথে যুদ্ধেও নাম লিখিয়েছি। একই ক্যাম্পে থাকতাম।'

'দারুণ। তুমি কবিতা পড়ো?'

'আকাশটা দ্যাখো। কেমন লাল!'

ইস্কান্দার বইয়ের পাতা হাতড়ায়ঃ

*'আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে*
*বসে থাকি; কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো*
*গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে- আসিয়াছে শান্ত অনুগত*
*বাংলার নীল সন্ধ্যা- কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশেঃ'*

'চমৎকার কবিতা পড়ো ত' তুমি!'
'এ আর কি? আমাদের সাঈদ ভাইয়ের আবৃত্তি যদি শুনতে?'
'সাঈদ ভাই কে?'
'আমাদের ক্যাম্পের টুআইসি ছিলেন। ফুলপুর থানা অপারেশনে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে...'
'কি হলো?'
'কি আর হবে? আমি তার বন্ধুর ছোট ভাই বলে আমাকে আগলাতে গিয়ে নিজে মরলো। শুধু যদি মরতো! আমার চোখের সামনে মানুষটার নাড়ি-ভুঁড়ি সব তিন হাত কাছের কাঁঠাল গাছটায় জড়িয়ে গেল...পাঞ্জাবিদের শেলিংয়ে...অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো? মৃত্যুর আগের রাতে 'রূপসী বাংলা' থেকে আমাদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন...বিশেষ করে 'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও' কবিতাটি। *দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে* আবৃত্তি করে মৃত্যুর আগের রাতে যে ঘুমাতে গেল, পরের দিন সকালে একটা কাঁঠাল গাছেরই ডাল-পালা আর পাতায় রক্ত ও নাড়ি-ভুঁড়ি ছিটকে সে মারা গেল!'
'দেখি, বইটা দাও ত' আমাকে!' আমি পাশের বেড থেকে হাত বাড়িয়েছিলাম।
ইস্কান্দার আমাকে বইটা দিলে আমি চোখ বুলাই,
*'তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও- আমি এই বাংলার পারে*
*র'য়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;*
*দেখিব খয়েরি ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে*
*ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে*
*নেচে চলে- একবার- দুইবার- তারপর হঠাৎ তাহারে*
*বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে;'*

'তোমাদের এই অপারেশনটা ঠিক কোথায় হয়েছিল?'
'আসলে দ্যাখো, টাংগাইলের ফুলপুর থানাটা যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজিক কারণেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই থানার পাশেই ঘাপটি মেরেছিল পাঞ্জাবি, বিহারী আর রাজাকাররা। থানার একদম মুখোমুখি মুক্তিবাহিনীর 'চর বাংলা' ক্যাম্প। এপ্রিল থেকে টানা যুদ্ধ চলছে। তখন ছিল নভেম্বর মাস। আড়ালে ১১ নম্বর সেক্টরের ছেলেদের প্রশিক্ষণ মেঘালয়ের তুরা পাহাড়েই হয়েছিল। নভেম্বর থেকেই মিত্র বাহিনী তার আড়াল সরিয়ে সরাসরি মুক্তিবাহিনীর ব্যাক-আপ করছে। কোন

কোন জায়গায় সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর থেকেই মিত্র বাহিনীর সরাসরি সাপোর্ট শুরু হয়েছে। তার আগে বর্ডার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর গেরিলা যুদ্ধই বেশি চলেছে। ১১ নম্বর সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর বেশির ভাগ ছেলেই কলেজের ছাত্র। এর ভেতর করটিয়ার সাদত কলেজের ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি হারে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। টাংগাইলের আছিমতলায় '৭১-এর ৪ঠা এপ্রিল ছাত্র-জনতার প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধেও কলেজের ছেলেরা অনেকেই ছিল।

...কি বলতে কি বলা? নভেম্বর থেকেই মিত্রবাহিনী প্ল্যান করলো যে মুক্তিবাহিনীর সাথে মিলে হালুয়াঘাট থানা থেকে অপারেশন শুরু হবে। তারই অংশ হিসেবে ফুলপুর থানার পাশের ঘাঁটিকে টার্গেট ঠিক করা হয়েছিল। টুআইসি কমান্ডার আবু সাঈদ ভাই তার এই অল্পবয়সী সাবোর্ডিনেট যোদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের কি ক্ষতিটাই না করলেন।
'আমাকে সামনে আগাইতে দ্যান্'
' না- না- তুমি বাচ্চা ছেলে! আমার বন্ধুর ছোট ভাই- সরো!'

...জানো, আগের রাতে ক্যাম্পে রাতের খাবারের পর রেডিওতে কিছুক্ষণ 'আকাশবাণী'র খবর আর 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্র শুনবার পর এই আবু সাঈদ ভাই-ই আমাদের জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা থেকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। গলাটা ভালই ছিল তাঁর; ক্যাম্পে রাতে খাওয়া-দাওয়ার শেষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে' কি 'জয় বাংলা বাংলার জয়' বা 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে' গাইতে শুরু করলে আমরা ওর দোহার হতাম। সাঈদ ভাইই ছিল মূল গায়েন! বয়সে আমাদের বছর ছয়েকের বড়। আমরা সবে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছি আর আবু সাঈদ ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে তার জন্ম শহর টাংগাইলে ছুটি কাটাতে এসেছে। মাস্টার্সের রেজাল্ট হতে আরো কয়েক মাস বাকি। চাকরি খোঁজা শুরুর আগে হঠাৎই তো সেই ছোট বেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়া ডাকাত দলের মতো হা-রে-রে-রে করে আমাদের সবার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল এই যুদ্ধ। আমাদের 'চর বাংলা' ক্যাম্পে প্রায় পাঁচ/ছয় জন ছাত্র ছিল। 'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও' পড়ার পর সবাই মিলে তাকে বললাম: 'সাঈদ ভাই, 'যতদিন বেঁচে আছি'টা একটু পড়েন!'
'আরে আমি একাই পড়বো নাকি? আসো, সবাই মিলে পড়ি!'
আমরা সবাই একসাথে আবৃত্তি করেছিলাম,

*'...আমি যে দেখিতে চাই,- আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে;*
*পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে*
*ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব ব'য়ে,*
*যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে,...'*

...অপারেশনের দিনের সকালটা ছিল কুয়াশা ঢাকা। ফুলপুর থানা ক্যাম্পাসের চারপাশটা ছিল আম, জাম, কাঁঠাল আর হিজল গাছে যাওয়া। কেউ যেন 'রূপসী বাংলা'র চরণগুলো সাজিয়েই রেখেছে। মাথার উপর ধূ ধূ নীল আকাশ। আকাশ যেখানে অপরাজিতার মতো আরো নীল হয়ে আকাশে হারিয়ে গেছে।...আমারও কোমর আর মেরুদণ্ডের নিচে গুলি লেগেছিল। আমি জ্ঞান হারাতে হারাতেই টের পেলাম আবু সাঈদ ভাই স্পট ডেড। অচেতন আমাকে কারা 'তুরা টেন্টস্ হাসপাতাল'-এ পাঠালো কে জানে? সেখান থেকে আবার লক্ষ্মৌয়ে মিলিটারি সেন্ট্রাল কমান্ড হাসপাতাল! আমার ব্যাগটা গুছিয়ে দেবার সময় আমাদের দলের কল্যাণ 'রূপসী বাংলা'ও ব্যাগে দিয়ে দিতে ভোলে নি। তা' হাসপাতাল মানেই ওষুধ, ইঞ্জেকশনের ভাঙ্গা অ্যাম্পুল, ডেটল-স্যাভলন-ফিনাইলের মিলিত গন্ধ, স্টিলের ট্রে-তে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার খাবার, সাদা জামা পরা কবুতরের মতো নার্সের দল! সত্যিই এই বাংলা ছেড়ে আমাদের সাঈদ ভাইয়ের আর কোথাও যাওয়া হলো না!'

...বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী কে? মন। নয়তো আজ প্রায় বছর খানেক পর ইস্কান্দারকে বিশ্রামাগারের অফিস রুমে বিকাল পাঁচটার দিকে ঢুকতে দেখে...আমি যখন মাত্রই আমার হুইল চেয়ারটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অফিস রুমের পাশের টিভি রুমে ঢুকবার চেষ্টা করছিলাম...ওকে দেখে অফিস রুমেই হুইল চেয়ারটা সামান্য ঘুরিয়ে ঢুকে দু'একটা কথা না হতেই পুরনো এত কথা ধাঁ করে মনে পড়ে গেল?

'শায়লা...আব্বুর ব্রেন টিউমার...ডাক্তার কি বল্‌ছে?'

'আঙ্কেল...আব্বুকে ত' একটা ক্লিনিকে ভর্তি করেছিলাম। গত পনেরো দিনে প্রায় ৬১/৬২ হাজার টাকা নানা মেডিকেল ইনভেস্টিগেশনেই শেষ হয়ে গেছে। ক্লিনিক থেকে ফোর্সড রিলিজ দেওয়ায় আব্বুকে বাসায় নিয়ে এলাম। এখন রিলেটিভদের কাছে যদি টাকা পয়সা কিছু ধার করা যায়, তাহলে আবার...আবার ভর্তি করবো...আর তেজগাঁর কল্যাণ ট্রাস্ট অফিস থেকেই আমাদের বললো এখানে এসে আব্বুর মোস্ট রিসেন্ট অসুস্থতার কাগজ-পত্র জমা দিতে। যদি চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা পাওয়া যায়! কিন্তু তেজগাঁ থেকে চিঠি পেতেই তিনটা বেজে গেল। পথে এত জ্যাম। এখানে আসতে আসতেই ত' পাঁচটা বেজে গেল।'

'হ্যাঁ, তোমাকে কাল সকালে আর একবার আসতে হবে। তোমাদের বাড়ির দখল নিয়ে কিছু ঝামেলা ছিল। ওটা মিটেছে?'

'না, আঙ্কেল। সরকার থেকে সেই চুরাশি সালে জাকির হোসেন রোডে বিহারিদের একটা ফেলে যাওয়া বাড়ি আমাদের দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু আজো ত' সেটা কাগজ-কলমেই। আমরা ত' এখনো তার দখল বুঝে পাই নি।'

'একদিক থেকে তোমার আব্বু অনেক লাকি। ভারতের লক্ষ্মৌয়ের হাসপাতালে আমরা পাশাপাশি বেডে ছিলাম। দু'জনেই তখন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। আমি সারা জীবনের মতো পঙ্গু, হুইল চেয়ার বন্দি হয়ে ফিরলাম। তোমার আব্বু অবশ্য সুস্থ হয়ে গেলেন। মনের জোরও ছিল। দেশে ফিরে ইন্টারমিডিয়েট-অনার্স-মাস্টার্স করে কল্যাণ ট্রাস্টে চাকরিও নিল। বিয়েও করলো। দিব্যি সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন। শেষ জীবনে এমনটা ঘটলো কেন?'

'সবই আল্লাহর ইচ্ছা, আঙ্কেল। আজ উঠি।'

বাবার হাত ধরে তাকে সাবধানে ওঠায় শায়লা। একটা কথাও বলতে না পারা...গলার স্বর ও এক চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলা ইস্কান্দার...লক্ষ্মৌ হাসপাতালের বেডে সন্ধ্যা বেলায় কামরাঙা লাল আকাশ দেখে গঙ্গাসাগরে ডুবে যাওয়া মৃত মুনিয়ার কবিতা পড়া ইস্কান্দার...আমার দিকে তাকিয়ে অসহায় হেসে হাত নাড়ে।

## কাঠের পা, নকল পা- জীবন পেয়েছো তুমি

আজ পহেলা বৈশাখ। নববর্ষে এবার বাড়ি যাই নি। বাসে এত ঘন ঘন যাতায়াতেও তো কষ্ট। রন্টু, আমাদের কেয়ারটেকার ছেলেটাকেই তো সব কষ্ট করতে হয়। বাসে আমাদের মতো যত নুলা-কানা-লেংড়াদের তুলে দিয়ে আসা আবার ঢাকায় ফেরার সময় আমাদের রিসিভ করা! বাড়িতে গেলেও আমি ত' শেষপর্যন্ত একজন বিকলাঙ্গ মানুষই। স্বাভাবিক মানুষদের সাথে তার ক'দিনই বা চলে? যুদ্ধে পঙ্গু যদিবা হয়েছিলাম মাত্র উনিশ বছর বয়সে, আমার বিয়ে হয়েছে আর চুরাশি সালে। তখন আমার বয়স বত্রিশ। ততদিনে বাবা মা দু'জনের কেউই আর বেঁচে নেই। আমাকে বিয়ে দিলেন বড় আপা। চিরতরে প্রবাসী হবার আগে। উনিশ থেকে বত্রিশ...তেরো বছর ধরে আমি ঢাকার কলেজ গেইটের রেস্ট হাউসে জীবন পার করছি। মাঝে মাঝে বাড়ি যাওয়া হয়। আগে বড়, মেজো আর ছোট ভাইয়া ঢাকায় এসে আমাকে নিয়ে যেত বা বাসস্ট্যান্ডে আমাকে রিসিভ করতো...এখান থেকে হয়তো তুলে দিত বিশ্রামাগারের কেয়ারটেকার...তিন ভাইয়া আর বড় আপা প্রবাসী হবার পর এখন কখনো আমার ছোট বোনের হাসব্যান্ড, কখনো আমার বড় বা মেজো ছেলে আমাকে রিসিভ করে। ওরাও ত' এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। আমার বিয়েটা আমি অবশ্য প্রথমে করতে চাই নি।

'বড় আপা, সারাজীবন আমাকে ঢাকায় কলেজ গেইটের রেস্ট হাউসে কাটাতে হবে। দুইটা পা-ই নাই। কোন কাজকর্ম করতে পারব না। গরিব আত্মীয়ের মেয়ে বলে ধরে-বেঁধে যাকে বিয়ে দেবে, তার জীবনটা এমন করে তোলার কোন

অধিকার কি তোমার আছে? তুমি নিজেও ত' মেয়ে। তুমি নিজে হলে এমন বিয়ে করতে? তোমার ছোট বোনকে তুমি এমন বিয়ে দেবে?'

'ব্যস্- ব্যস্- শোন্, মনোয়ার মামাদের বাড়িতে এম্নিতেই হাঁড়ি চড়ে না। তারপর এই মেয়ের কপাল খারাপ...পরপর দু/দু'টা বিয়ে যৌতুক দিতে না পারায় তালাক হয়েছে। বাচ্চা-কাচ্চা অবশ্য নাই। এই মেয়ের আর বিয়ে হবে? তুই ওকে বিয়ে না করলে গরীবের মেয়ে...দু'বার তালাক হওয়া...মেয়েটার শেষ পরিণতি হবে সমাজ থেকে বের হয়ে.. দেখতে কিন্তু সুন্দরী। মানুষ জ্বালাতন করবে কিন্তু দু'বার তালাক হওয়া মেয়ের বিয়ে হবে না! সে যে কি মর্মান্তিক ব্যাপার হবে! অমত করিস না। বিয়ে করে ফ্যাল্।'

...এভাবেই দু'বার তালাকপ্রাপ্তা রুমা খাতুন আর দুই পা কর্তিত শাহরিয়ার হকের বিয়ে হয়েছিল। ফুলশয্যায় পর্যাপ্ত বেলি ফুলের মালা, গাঁদা ও গোলাপ ছিল। বেনারসি শাড়ি ও বরের পাগড়ি ছিল। কিছু খাওয়া-দাওয়াও হয়েছিল। আমার আর রুমার বড় দুই ছেলেই এখন একটা বিভাগীয় শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষের পথে। রুমা আমার সাথে কোনদিন মন্দ ব্যবহার করে নি। বাসরেও আমার মতো দুই পা কর্তিত মানুষকে দেখেও সে স্বাভাবিক থেকেছে। কোনদিন একটা খারাপ কথা বলে নি। তবু, এই অস্বাভাবিক মানুষটিকে নিয়ে ওর এই অত্যধিক স্বাভাবিক আচরণই বরং আমাকে কোথায় যেন দূরে ঠেলে দেয়! ইদানীং কেউই আর কারোর কোন তল যেন খুঁজে পাই না! এ সব মিলিয়েও বাসায় যেতে কেমন যেন লাগে আজকাল! যাক গে এসব কথা।

...আজ বাংলা নববর্ষের পহেলা দিনটাই নিঝুম হয়ে আছে আমাদের এই কলেজ স্ট্রিটের বিশ্রামাগারে। দুপুর বারোটার দিকে দিনাজপুরের অনিল কান্তি রায় আর সিলেটের মোহাম্মদ মানিক আলী এলো। আহত হলেও ভাগ্যের তুলনামূলক আনুকূল্যে ওদের অবস্থা আমাদের চেয়ে ভাল। যুদ্ধের সময় মেট্রিক পাস অনিলের একটা পা আজো শক্ত। অন্য পা টা কাঠের। আমার মতো হুইল চেয়ার বন্দি না বলে সচিবালয়ে একটি কেরানির চাকরি জুটে গেছিল মেট্রিক পাসের সুবাদে। সেই চাকরি আর একটি পা অক্ষত থাকার সুবাদে বিয়ে করে আজিমপুরের স্টাফ কলোনিতে দু'কামরার বাসায় বউ আর দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে আছে। মানিকের দুই চোখই গেছিল। তবে, কর্নেল ওসমানীর রেকমেন্ডেশন লেটারে বঙ্গবন্ধু তাকে হাঙ্গেরি পাঠালে সেখানে টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা করে দেশে ফিরে মানিক ভাল চাকরি পেয়েছে। ওর ছোট ছেলে এসেছে ওর সাথে। ওরা দু'জন তরমুজ আর মিষ্টি নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য।

'অনিলের শরীর কেমন?' অলিলুর প্রশ্ন করে।

'ব্যথাটা একটু কম। এবারের কাঠের পা টা আমার লাইফ পেয়ে গেছে বলতে

পারো।'
' লাইফ পাওয়া মানে?'

অনিল সিগারেট ধরায়, 'জানোই ত' সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল থেকে ১৯৭৪ সালে আমি প্রথম পা পাই। এটা ব্যবহার করছি ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত। কোন কোন কৃত্রিম পা 'লাইফ' পায় মানে অনেকদিন চলে। দ্বিতীয় পা ভারতের পুনা থেকে পেলাম। এটা সেই ১৯৮৪ সাল হতে আজ অবধি ব্যবহার করছি। মাঝে মাঝে অবশ্য অমাবশ্যা পূর্ণিমায় শিরদাঁড়া, উরু ও আর ভাল পা'টায় খুব ব্যথা হয়। এখন এই কাঠের পা টাই আমার নিজের পা বলে মনে হয়!'
'ভাল কও আর মন্দ কও ব্যথার ওষুদ একটাই!' মোস্তফা টকটকে লাল চোখে বলে। ওর হাতে ধরা হুঁকার তামাকের ভেতর সব সময়ই গাঁজার ছিলিম পোরা, 'বুলেটে-বেওনেটে-ডাক্তারের ছুরিতে শরীরে কি কিছু আছে? ডাক্তারের ওষুধ কি আর ব্যথা কমাবে? আমার বন্ধু এই...!' বলে মোস্তফা মুচকি হেসে হুঁকাটা তুলে ধরে। ফ্যানের বাতাসে ওর বড় বড় চুল দাড়িগুলো ওড়ে। এই বিশ্রামাগারে আমাদের প্রায় সবার চুল দাড়িই লম্বা। আমারও তাই। অসুস্থ মানুষের নিয়মিত চুল দাড়ি কামানোও একটা ঝক্কি।

...সবার সাথে তরমুজ আর মিষ্টি খেতে খেতে আমার ছোট ভাগ্নির কাছ থেকে কম্পোজ করে আনা মধুর লেখা ইতিহাস পড়ি আমি। প্রথম কিছু কাগজে বানানগুলো শুদ্ধ করা। পরের কাগজগুলোয় অবিকৃত ওরই বাক্যগঠন ও বানান রাখা হয়েছে।

**'বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ এবং 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট' গঠনের মূল ইতিহাস : মোদাচ্ছার হোসেন মধু বীর প্রতীক।**

১৯৭২ ইং সালের ১০ই জানুয়ারি মাতৃভূমি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য কারা বরণ শেষে বাংলার মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই এক শ্রেণীর কুচক্রী রাজনীতিবিদসহ মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বড় ভাইয়েরা বঙ্গবন্ধুর সরলতার সুযোগে তাঁকে কান কথায় ভুলিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে বাঁকা পথে নিয়ে যাবার জোর চেষ্টা চালায়। কিন্তু বাংলার নয়নমণি, স্বাধীন বাংলার স্থপতি মহা-মানব ভুল পথে অগ্রসর হননি। বিশাল দেহ ও মনের অধিকারী জাতির পিতা বাঙালি মনে করে পিস কমিটির চেয়ারম্যান, মেম্বার, দালাল, রাজাকার ও আলবদরদের সাধারণ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তবে, তিনি যদি রাজাকার আলবদর ও দালালদের নির্যাতন করার কথা শুনতেন, তাঁর হাজার সন্তানের শাহাদাত বরণ ও পঙ্গুত্ব বরণের এর কথা শুনতেন, তবে কোনদিন তিনি সাধারণ ক্ষমার কথা মুখে উচ্চারণই করতে পারতেন না।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার কিছুদিন পর মোহাম্মদপুরের এক সমাজ সেবক শ্রদ্ধেয় মৃত নজরুল ইসলাম চাচা বঙ্গবন্ধুকে সেই বীরাঙ্গনাদের (মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে

অবস্থানকারী) কথা জানালে চুপিচুপি বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধেয় মৃত নজরুল ইসলামের সাথে বাবর রোডে বীরাঙ্গনাদের দেখতে আসেন। এবং তাদের টাকাসহ জামাকাপড় ও কম্বল প্রদান করেন। প্রতিটি বীরাঙ্গনার মাথায় হাত দিয়ে 'মা' বলে ডাক দিয়ে তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। বাবর রোড থেকে ফেরার সময় শ্রদ্ধেয় নজরুল চাচা মোহাম্মদপুরের কলেজ গেটে অবস্থানরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন যে কলেজ গেটে বেশ কিছু পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করেছেন। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার বিবরণ নজরুল চাচা বঙ্গবন্ধুকে শোনালেও তিনি তখনকার পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং বর্তমানের 'যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা রোগমুক্তি বিশ্রামগার'-এ যান নি। একটা চিরন্তন সত্য কথা হলো এই যে যোদ্ধা যদি যুদ্ধ করেন তবে তাঁকে শাহাদাত বরণ থেকে শুরু করে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হবেই। খাঁটি যোদ্ধাদের মধ্যে অন্তত ১% পার্শেন্ট হলেও যুদ্ধে শাহাদাত বরণ অথবা পঙ্গুত্ব বরণ করবেই। যখন সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল ও বিশ্রামাগারে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা হুইল চেয়ার ক্রাচ নিয়ে পঙ্গু অবস্থায় পিতার সাথে দেখা করার জন্য ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে তাঁর বাসস্থান ও গণভবনে যাতায়াত শুরু করল, তাঁকে সময় সুযোগ বুঝে বিরক্ত করতে লাগল, তখনি তিনি ধীরে ধীরে মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারদের সম্বন্ধে অবগত হতে লাগলেন। একদিনের কথা, বঙ্গবন্ধুর গাড়ির চালক ফকিরদ্দীন (আমার সেসময়ের বন্ধু; বর্তমানে ফইক্কা পাগল) একদিন আমাকে গোপনে খবর দিল যে আজ বিকাল ৩:০০ টা হতে ৪:০০টা নাগাদ বঙ্গবন্ধু গণভবনে নারকেল গাছ লাগাবেন। খবরটা পেয়ে আমি মোদাচ্ছার হোসেন 'মধু' বীরপ্রতীক, কুমিল্লার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীরপ্রতীক, নোয়াখালীর নুরুল আমিন বীরপ্রতীক ও সিলেটের মো. আ: রহমান তাঁর সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। রহমান ছাড়া আমরা তিন জনই হুইল চেয়ারে চলাচল করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে পাক জান্তা বাহিনীর গুলিতে চির জনমের মত পঙ্গু হয়ে পুরুষত্ব পর্যন্ত হারিয়েছি। আর রহমান? গুলি লেগে তার পুরুষাঙ্গের অংশ বিশেষসহ ১টি অণ্ডকোষ পর্যন্ত উড়ে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু প্রস্তুতি নিচ্ছেন নারকেল গাছ লাগানোর। এমন মূহূর্তে আমরা ৪ জন একসাথে গণভবনে প্রবেশ করতে গেলে নূর ইসলাম নামে একজন সাধারণ প্রহরী আমাদের বাধা প্রদান করতে উদ্যত হয়। বন্ধু নূরুল আমিন বীর প্রতীক (মৃত) নূর ইসলামকে লাল চোখে ধমক দিয়ে ওঠে, 'অ্যাই ব্যাটা তুই কেরে? আমরা আমাদের নেতার সাথে দেখা করব। ভাগ!'

'অনিলের পা খানা জানি কোন্ অপারেশনে গিইল?' চাঁপাইনবাবগঞ্জের শামসুদ্দিন মুখে এক টুকরা তরমুজ পুরতে পুরতে জিজ্ঞাসা করে।

অনিল হাসে, 'আমি যুদ্ধ করছি ৭ নম্বর সেক্টরে। দিনাজপুরের অর্ধেক, বগুড়া, বৃহত্তর পাবনা ও বৃহত্তর রাজশাহী ছিল এই ৭ নম্বর সেক্টরের আওতায়। ১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ১৭। আমি তখন এস,এস,সি, পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। ফুলবাড়ি থানার পাঁচ মাইল দক্ষিণে বাড়াইহাট গ্রাম আর দুই মাইল উত্তরে দইমারি গ্রাম। আমরা এই দুই গ্রামের মাঝামাঝি থাকতাম। মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনী ও রাজাকারদের প্রধান টার্গেট ছিলো হিন্দু জনগোষ্ঠী। তাই

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই আমরা বর্ডার পার হয়ে ওপার বাংলার পশ্চিম দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ থানার খলসামায় একটা টিনের ছাউনি ঘরে গোটা পরিবারসুদ্ধ উঠলাম। আমার বাবা ছিলেন কৃষক। পাঁচ ভাইয়ের ভেতর আমি ছিলাম চতুর্থ। আমাদের কোন বোন ছিল না। আমার ভেতর যুদ্ধে যাবার একটা ইচ্ছা ছিলই। আরো যখন গোটা ফ্যামিলি একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে, আমার কোন পিছুটান রইলো না।

জুলাইয়ের শেষে ডাঙ্গারহাটে একটা ট্রানজিট ক্যাম্পে আমি সহ মোট আটটি ছেলে ভর্তি হলাম। ১৪ই আগস্ট আমরা একটি উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পানিঘাটাতে গেলাম। পানিঘাটাতে এক মাস ট্রেনিং পেলাম। দুই ইঞ্চি মর্টার, এল.এম.জি., এস.এল.আর., থ্রি নট থ্রি, হাই অ্যান্ড লো সহ দু'ধরনের এক্সপ্লোসিভস্ হ্যান্ডেল বা অপারেট করা শিখলাম। এছাড়াও, মাইন বিশেষ করে ধরো তোমার এন্টি-ট্যাঙ্ক ও এন্টি-পার্সোনেল মাইন বা ব্যুবি ট্র্যাপ প্রস্তুত করা কি বসানো এসব কিছুই শিখেছি। এন্টি-পার্সোনেল মাইন ১০ থেকে ২০ পাউন্ড ওজনের ভেতর হলেই অনায়াসে বার্স্ট হয়। এটা আবার বেস টাইপ ও জাম্পিং টাইপ...দু' ধরনেরই আছে। এ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন সাধারণত ১৫০ পাউন্ডের মতো ওজন হয়। ট্রেনিং ক্যাম্পে এক্সপ্লোসিভসের ব্যবহার আমি বিশেষ ভাবে শিখলাম। ধরা যাক, এক পাউন্ড এক্সপ্লোসিভসে আমি এক ইঞ্চি কাঠ বা স্টিল কাটবো কি বার্স্ট করবো। দুই ইঞ্চি কাঠ বা স্টিল কাটবো তিন পাউন্ড এক্সপ্লোসিভসে ইত্যাদি। কত কি করেছি! পাকিস্তানি কম্যুনিকেশনস্ ধ্বংস করতে গিয়ে রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া, কৃষক ও রাখাল সেজে ক্যামোফ্লেজ করা...'

'একা তুমিই করছো শুধু? আমরা করি নাই?'

বরিশালের মনেশ্বর আলী একটা লাল চমচম মুখে পোরে।

'হুশ্...ওর গল্পটা শেষ হোক আগে!' কয়েকজন মনেশ্বরকে তাড়া দেয়।

'সবচেয়ে মনে পড়ে ফুলবাড়ি থানার মাচুয়াপাড়া যুদ্ধ। এটাই প্রথম যুদ্ধ যেখানে বিপক্ষের দু'জন নিহত ও চারজন আহত হয়েছিল। তারপর ধরো রাঙামাটির যুদ্ধ যেখানে সবাই পালিয়ে গেছিল, দু'জন রাজাকারকে ধরা হয়, পার্বতীপুর থানার চৌহাটির যুদ্ধ...ঐ যুদ্ধে আমরা দু'জন বিহারীকে মারি, খোলাহাটি রেল লাইনের উপর যুদ্ধ, রংপুরের বদরগঞ্জ যুদ্ধ ও দিনাজপুরের মহারাজা স্কুলের যুদ্ধ...এই শেষেরটায় আমি আহত হই। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমরা বড় পুকুরিয়া রেল লাইনের অপারেশন করছিলাম। বড় পুকুরিয়া রেললাইনে চার/পাঁচজন রাজাকার স্ট্যান্ডিং পেট্রোলের মাধ্যমে পাহারা দিত। সেই পাহারা এড়িয়ে রেল লাইনের সামনে ব্রিজের কাছে রাত এগারোটার দিকে বারুদ, কর্টেস, সেফটি ফিউজ, জিসি প্রাইমা, ডেটেনাটার জড়ো করে ফায়ারিং দিলাম।

কোথাও কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। রাজাকাররা হয়তো পাহারায় একটু ঢিলা দিছিল। আশপাশে চেক করে, কাউকে না পেয়ে ব্রিজ উড়ানোর সরঞ্জাম ব্রিজে ফিট করলাম। জিসি প্রাইমার, কর্টেস, সেফটি ফিউজ সংযোগ করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যার যার পজিশনে থাকলাম। ব্রিজ ওড়ানোর পর সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন সুবেদার নায়েব আলীর কাছে রিপোর্ট করলাম। দু'দিন পরে ক্যাপ্টেন বললেন 'মাচুয়াপাড়ায় পাকিস্তানি ক্যাম্প আছে। ক্যাম্প উড়াতে হবে। ইউ আর সিলেক্টেড। ঠিক সন্ধ্যার সময় খলসামা সীমান্ত গ্রাম অতিক্রম করে দেড় মাইল ভেতরে পাক সেনাদের ক্যাম্পের কাছে যাবে। ঐ ক্যাম্পে প্রায় ১০০ জন পাকিস্তানি সৈন্য আছে।' সন্ধ্যায় খেয়ে ১৯/২০শে সেপ্টেম্বর রওনা দিলাম। রাত আটটার দিকে বর্ডার ক্রস করে হাঁটা শুরু করলাম। ধানক্ষেতে হাঁটুর উপর পানি। না যায় হাঁটা, না যায় সাঁতার কাটা। মূল টার্গেটের শ' খানেক গজের ভেতর এসে পজিশন নিলাম। পাঁচ মাইল পেছন থেকে মিত্র বাহিনী আর্টিলারি কাভারেজ দিচ্ছে। আমরা ত' পজিশন নিয়েছি। আর্টিলারি কাভারেজ শুরু হয়েছে। মাথার উপর দিয়ে একটার পর একটা উড়ে আসা আর্টিলারি শেলের শোঁ শোঁ আওয়াজ আর আমাদের সামনে শত্রুর অবস্থানের উপর বিকট শব্দে সেগুলোর বিস্ফোরণ... এর ভেতর দিয়েই আমরা মুক্তিযোদ্ধারা অ্যাডভান্স করছি। পাকিস্তানিদের ভেতর ২০/২৫ জনের লাশ পড়লো। আমাদের দু'জন মুক্তিযোদ্ধা 'অন দ্য স্পট' মারা গেল।

আমি নিজে আমার পা হারাই ৬ই জানুয়ারি দিনাজপুর মহারাজা স্কুলের এক যুদ্ধে। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় নিয়াজিরা আত্মসমর্পণ করলেও দেশের ভেতরে নানা জায়গায় তখনো পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ চলছিল। ৬ই জানুয়ারি আমরা মুক্তিযোদ্ধারা বর্ডার ক্রস করে দিনাজপুর শহরের মহারাজা স্কুলে এসে ক্যাম্প বানালাম। কিন্তু, আশপাশে পাকবাহিনী মাইন পুঁতে রাখছিল। হঠাৎ এক মাইন বিস্ফোরণে মহারাজা স্কুল সুদ্ধা আশপাশের পাঁচশ' গজের ভেতর সব ঘরবাড়ি গেল গা! প্রায় ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েও কোনমতে বেঁচে গেল। আমার পা আমি ঐ দিনই হারাইলাম। দিনাজপুর সদর, রংপুর সদর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট আর মগবাজার সুশ্রী হাউসে কত চিকিৎসা নিলাম! লাভ নাই।'

...অনিলের গল্প শুনতে শুনতেই মধুর ডায়েরিতে আবার চোখ বুলাই, 'এখনকার মত তখন বঙ্গবন্ধুর মত একজন প্রধানমন্ত্রীর ফটকে কোন ভারী প্রটোকল অথবা হাতে হাতে মোবাইল ছিল না। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর গণভবনে বোধ হয় একটি টেলিফোনই ছিল। আমাদের মতো চারজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে গণভবনের একেবারে ভেতরে দেখে ডাক দিলেন, "ফকির!" বঙ্গবন্ধু তাঁর গাড়ির চালক ফকিরুদ্দীনকে স্নেহ করে ডাকতেন "ফকির।"

ত্বরিতগতিতে ফকির তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তিনি আমাদের চারজনের দিকে আঙুল

দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারারে? এরা কি চায়?' পাতলা মুখের ফকিরউদ্দীন আমাদের কথা বলার পূর্বেই প্রথমে মৃত নুরুল আমিন বীর প্রতীক তাঁর নাম ঠিকানা, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসহ পরিচয় বঙ্গবন্ধুকে জানায় বাকি আমরা ৩জনও আমাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পিতাকে দেই। ৪ জনের মধ্যে আমি মধু, নুরুল আমিন ও নজরুল ইসলাম ৩জনই তাঁকে বলি, আমাদের মধ্যে এখনও পাক বাহিনীর বুলেট রয়ে গেছে। ভারতের ডাক্তারগণ সব গুলি বের করতে পারে নি!' তিনি নারকেল গাছ লাগাবার কথা ভুলেই গেলেন। ফ্যাল ফ্যাল নয়নে কতক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে থেকে ফকিরের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, ফকির, টেলিফোনটি নিয়ে আয়। ফকির দৌড় দিয়ে ঘর থেকে ফোনের তার ছুটিয়ে নিয়ে এলো তাঁর সামনে। তিনি গণভবনের ঘাসের উপর বসে পড়লেন। কাকে যেন টেলিফোনে বললেন, 'I have need you now. So please meet to me. তারপর শুরু করলাম আমাদের চিকিৎসা চাই, আমাদের বুকের গুলি আপনি বের করে দেন। তিনি সেই মুহূর্তে আমাদের মাথায় হাত রেখে বলতে লাগলেন, 'তোমরা দেশ স্বাধীন করেছ। তোমরা ত' দেখছ যে দেশের সব কিছু ধ্বংস তাই...। তাঁর বাকি কথা শেষ করার পূর্বেই সিলেটের রহমান তার প্যান্ট এবং জাঙ্গিয়া খুলে ফেলে একে বারে উলঙ্গ হয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল আমরা বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা আপনার নির্দেশের সাথে সাথে ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং সাহাদাত বরণসহ এই এমনভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করেছি। বঙ্গবন্ধু রহমানের দিকে দেখেই দুই চোখ ঢেকে ফেললেন। কেঁদে ফেললেন। অভিমানী উত্তেজিত কনিষ্ঠ বয়সী মুক্তিযোদ্ধা রহমান আবার বলে উঠলো। আপনার নির্দেশে যা হারিয়েছি ফিরিয়ে দিন। কামলা গিরি খেটে খাব। চিকিৎসার দরকার নাই।'

ওহ্, হ্যাঁ...আমিও ত' গেছিলাম সেদিন? সিলেটের সেই অভিমানী রহমান আজ কই? সব কিছু এত খুঁটিয়ে মনে রেখেছে মধু? সব কথা লিখে গেছে সে? কিন্তু কে পড়বে এই ডায়েরি? কেউ কি কখনো ছাপবে এক স্বল্পশিক্ষিত যোদ্ধার এই দিনপঞ্জি? আমার এমন ভাবনার মাঝেই সিলেটের জুয়েল আলী চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে বলছে, 'যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ১৭ বৎসর। বাবা কৃষক ছিলেন। মেট্রিক পরীক্ষা দেবার পরের বছরই যুদ্ধ শুরু হয়। আমি এপ্রিল মাসে ৪ নম্বর সেক্টরে মেজর সি,আর, দত্তের অধীনে যুদ্ধ করেছি। সিলেট থেকে করিমগঞ্জ হয়ে লাতু ট্রানজিট ক্যাম্পে গেলাম। স্টেনগান ও রাইফেল চালানো, মাইন প্রস্তুত করা...প্রায় ৪৪ ধরনের মাইন প্রস্তুত করার কাজ আমি আড়াই থেকে তিন মাসে শিখে ফেললাম। পাক বাহিনীর সাথে একটা অপারেশনের কথা আজো ভুলতে পারি না। আমরা জিতেছিলাম সেই অপারেশনে। জকিগঞ্জ ক্যাম্পে ঈদের আগের দিন আমরা ঘেরাও করি। ওরা কিন্তু সংখ্যায় প্রায় ২০০-৩০০ জন ছিল। ভোররাত চারটার দিকে আমরা অ্যাটাক করি। পাঞ্জাবিদের ওয়্যারলেস তার ও টেলিফোন সংযোগ আমরা বিচ্ছিন্ন করে দিলাম। রাস্তা কেটে যানবাহন চলাচলের পথও বন্ধ করে দিই। পরদিন সকাল ১১টা পর্যন্ত গোলাগুলি চলে। মিত্র বাহিনী পাকিস্তানি এক ক্যাপ্টেনকে বন্দি করে। কিন্তু, আমার দুই

চোখ আর ডান হাতের পাতা হারাই ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১। আমাকে অথরিটি নির্দেশ দিল যেন এয়ারপোর্ট থেকে সিলেট শহরের দিকে ঢোকার পথে মাইন বসায় রাখি। কিন্তু, আমার কাছে ফিউজ কাটার কিছু ছিল না। মুচড়ে ছিঁড়তে গিয়ে গান পাউডার হাতের ভেতর বার্স্ট করে ও দুই চোখও জখম হয়। ভোর পাঁচটায় আমাকে আসামের করিমগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। দশ/পনেরো দিন সেখানে চিকিৎসার পর আমাকে নিয়ে আসা হয় সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এভাবেই চোখ গেল আর কি! তবে, আমার ভাগ্যটা অনেকের চেয়েই ভাল ছিল। তাই কর্নেল ওসমানীর রেকমেন্ডশনে হাঙ্গেরি গিয়ে টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে ফিরে মোটামুটি ভাল চাকরি পেয়েছি। '৭২-এর মার্চে হাঙ্গেরি গেলাম। ফিরলাম '৭৪-এর আগস্টে। 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে'ই টেলিফোন সুপারভাইজরের চাকরি নিলাম। এখনো সেই চাকরিটাই করছি। ১৯৭৭ সালে বিয়ে করলাম। তিন মেয়ে আর দুই ছেলে হলো। তিন মেয়েরই বিয়ে দিছি। বড় ছেলে উকিল। কোর্টে প্র্যাকটিস করে। আর এই আমার ছোট ছেলে। বিবিএ অনার্স পড়ছে।'

'শাহরিয়ার- তুমি কি এইহানে আছো না আকাশে উইড়্যা গেছ? হাতে ঐডা কি? কি পড়তেছ?' বরিশালের মনেশ্বর আলী বলে।

আমি ব্যস্ত হই, 'না-না- শুনছি ত'- তোমাদের সবার কথাই শুনছি!' এটুকু বলতে না বলতেই বেশ বুঝতে পারি যে মাখাটা আমার আবার মধুর ডায়েরিতেই নুয়ে পড়েছে,

'মহান মুক্তিযুদ্ধে লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ হারা উত্তেজিত রহমান বঙ্গবন্ধুর সামনে কথাগুলি বলে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। আমরাও অশ্রু সংবরণ করতে পারি নি বঙ্গবন্ধু ও ফকির তাঁদের চোখেও পানি। রহমান ও আমরা ৩জন। ফকিরুদ্দীন ১টা গামলায় করে চানাচুর মুড়ি, সরিষার তৈল পিয়াজ দিয়ে এনেছেন। বঙ্গবন্ধু নির্দেশ করলেন ফকিরকে গামলাটা ধরে রাক ওরা মুড়ি খাক, ফকিরুদ্দীন পাথরের মুর্তির মতো গামলা ধরে দাড়াল আমরা ৪জনকে ইশারা করে বঙ্গবন্ধু একই গামলা থেকে মুড়ি নিয়ে খেতে লাগলেন আমরা চারজন আর তিনি ৫জন মুড়ি খাচ্ছি। ২/৩ বার মুড়ি হাতে নিয়েছি হঠাত নেতা স্নেহভাজন গাড়িচালক ফকিরুদ্দীন এর উপর ধমক মেরে বললেন, কিরে মুড়ি খাওয়া তোর বাবার নিষেধ আছে? নে। আহ্হারে মহামানব, যাঁর কাছে ছেলে, চাকর, গাড়ি চালক মন্ত্রী সেনাপতি সবাই ছিল সমান। সেদিন ১৯৭২ ইং সালের আগস্ট মাসে তিনি সেভাবেই অনুভব করেছিলেন। ইতিমধ্যে গনভবনে এসে হাজির হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী। আমার গর্বিত জীবনে সেদিন এক সাথে বসে বাংলাদেশের স্রষ্টা এবং প্রথম প্রধানমন্ত্রী আর স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের ১ম সেনাপতির কথোপকথন শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি যা দেখেছি তাতে ১জন বিচারকও বলতে পারতেন না কে, কাকে বেশী শ্রদ্ধা করেন। ভাল বাসেন। আমি সেদিন সুনে ছিলাম এবং দেখেছিলাম, জেনারেল সাহেব, এসে পিতার সামনে সোজা

দাড়িয়ে মাথা নত করে চোখে চোখ ফেলেছেন। তিনি সেনাপতি জেনারেল ওসমানীকে How জেনারেল? are you know who is they জেনারেল সিলেটের রহমানকে ব্যাক্তিগতভাবে চিনতেন। বিধায় মহান মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি বঙ্গবন্ধুকে জানালেন, Yes PM. They College students. At fist they are folow your command and Fought against Pakistani Army. They are Freedom Fighter. They are taken triening from India Fought and Get Disability. জেনারেল এর কথা সুনে বঙ্গবন্ধু আরো বেশি অস্থির হয়ে পড়লেন। জেনারেলসহ সবাই এক সাথে মুড়ি খেলাম। বঙ্গবন্ধু সবার মাথায় হাত দিয়ে পিতার স্নেহে বলতে লাগলেন আমি তোদের চিকিৎসা করাবো। তোদের ভিতর থেকে গুলিও বের দিব। আমরা পিতার স্নেহ বিজড়িত সান্তনা নিয়ে ফিরে এলাম গনভবন থেকে। সেদিন আর প্রধানমন্ত্রী গণভবনে নারকেল গাছ লাগাতে পারেননি।

... আজও সেই ফকিরুদ্দীন, গার্ড নূর ইসলাম ও আমি সেদিনেরসহ পরের অনেক ঘটনার কালের সাক্ষি হয়ে বেঁচে আছি। প্রায় একমাস পরে সেপ্টেম্বর ৭২ ইং মাসের ১৪ তারিখ প্রধানমন্ত্রী, মুক্তি যুদ্ধের মহান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গনী ওসমানী ও মুক্তিযুদ্ধের চীফ অব স্টাফ, জেনারেল এম, এ, রব বীর উত্তমসহ এক আলোচনায় মিলিত হন এবং সেদিনের সেই আলোচনায় পিতা তাঁর সন্তানদের ভরণ পোষণ ও চিকিৎসার প্রয়োজনে আরো ছিলেন ১১ নম্বর সেকটর এর সেকটর কমান্ডার আবু তাহের। যুদ্ধ পরবর্তী একমাত্র জেনারেল ওসমানী ছাড়া প্রত্যেক সেকটর কমান্ডার কে 'বীর উত্তম' খেতাবে ভুষিত করা হয়। এছাড়াও প্রত্যেকটি সেকটরে মেজর, ক্যাপটেন, লেফটেন্যান্ট এমনকি সিভিল হইতেও মিলিয়ে ৪/৫ অথবা ৫/৬ জন সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তার পরেও কোমপানী কমান্ডার সেকশন কমান্ডারসহ সব মুক্তিযোদ্ধা মিলিয়েই মুক্তিযুদ্ধ।'

সিলেটের সুরুজ মিঞার পুত্র নূরুল মিঞা ততক্ষণে গল্প জুড়েছে, 'আজ দশ/বারো বছর হয় পুরা হুইল চেয়ারে বসা আমি। যুদ্ধ করছি তিন নম্বর সেক্টরে। যুদ্ধের এক বছর আগে আমি দুই বছর আনসার ট্রেনিংয়ে ছিলাম। আমি বর্ডারের কাছে বাল্লা বিওপিতে ই,পি,আর, ...এখন যেটা বি,ডি,আর, সেইখানে আনসার ব্যাটালিয়নে চাকরি করতাম। যুদ্ধ বাধলে বর্ডারের ওপার গিয়া দুই সপ্তাহ ট্রেনিং নিলাম। তয় তারিখ এবং সময় ঠিকমতো কইতাম পারি না। সব কথা স্মরণ নাই। ইতিহাস একেবারে আটাইয়া ঘুরাইয়া কইতাম পারি না। আমরা যুদ্ধ করছি খোয়াই নদী, বাল্লা বিওপি, রেমা গার্ডেনের কাছে। ভাদ্রের ১০-১৫ তারিখে সিলেটের একডালা বসন্তপুর প্রাইমারি স্কুলে রাত্রি দশটা-এগারোটার দিকে অ্যাটাক করি। স্কুলটায় পাঞ্জাবিরা ছিল। আমি এল,এম,জি, নিয়া অ্যাটাক করি। ঐ যুদ্ধেই আমার শিরদাঁড়ার পাশে গুলি লাগে। আমার জ্ঞান ছিল না। আমার সাথে যারা ছিল তারা আমাকে বর্ডারের ওপারে নিয়া যায়। ইন্ডিয়ার খোয়াই-আগরতলা-শিলচর-গৌহাটি-লখনৌ-রামগড় নানা হাসপাতালে আমার চিকিৎসা হয়। ভাদ্রের তিন-চার মাস পর দেশ স্বাধীন হয়। ঢাকায় সি,এম,এইচ, হাসপাতালেও কিছুদিন ছিলাম। যুদ্ধের সময় আমার মা

জীবিত ছিল। দেশ স্বাধীনের পর আমি আনসার ব্যাটালিয়নে তিনশ' টাকা বেতনে আবার যোগ দিই। তখনো আমার হুইল চেয়ার লাগতো না। হাঁটা-চলা করতে পারতাম। বিয়া করি। চারটা ছেলে আমার। চারজনই নাইন পাশ। ছোট ছেলে কুয়েতে থাকে। ধীরে ধীরে আমি পুরা পঙ্গু হইতে থাকি। আজ বারো বছর হয় সম্পূর্ণ হুইল চেয়ারে বসা। দেশ স্বাধীনের পর আহত হিসাবে শুরুতে পাইতাম ৭৫ টাকা। এখন হুইল চেয়ারে বসি বইলা মাসে ১৪,৫০০ টাকা পাই। দেশের বাড়িতে হুইল চেয়ার রোগীরে কে দেখবে? তাই এইখানেই থাকি।'

নেত্রকোণার আবু সিদ্দিকই বা বাদ যাবে কেন: 'আমার বয়স ৫৭-এর একটু বেশি। আমার দেশের বাড়ি হইলো নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ থানার চান্দপুর গ্রাম। যুদ্ধ করছি ৫ নং সেক্টরে, সিলেট জেলার বুলাগঞ্জে। আমাদের পরিবারে আমরা ভাই-বোন ছিলাম আটজন। আমি ছিলাম তিন জনের ছোট। যুদ্ধ যখন শুরু হয়, আমি তখন ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। ভারতের শিলংয়ের মোহনগঞ্জে ২১ দিন ট্রেনিং নিছি। একটা ইওথ ক্যাম্পে এই ট্রেনিং নিছিলাম। আমাদের বাঙালি কমান্ডারের নাম ছিল আব্দুল হামিদ। ইন্ডিয়ান ইনস্ট্রাক্টর আমাদের রাইফেল, এস.এল.আর., গ্রেনেড ও এল.এম.জি. চালানো শিখাইছিলো। আগস্ট মাসে আমরা বর্ডার পার হয়ে দেশের ভিতরে আইসা যুদ্ধ করতে থাকি। আগস্ট মাসে টানা ১০/১৫ দিন যুদ্ধ করছি। এর দুই মাস পর অক্টোবর মাসের ছয় তারিখের এক যুদ্ধে আমি কাবু হই। সেই দিন ছিল মঙ্গলবার। ছাতকের এক ফ্যাক্টরির পাশে রাতে আমরা বিশ জন মুক্তিযোদ্ধা...ফ্যাক্টরির সামনে একটা মরা নদী...নদীর একপাশে আমরা পজিশন নিছি আর একপাশে পাঞ্জাবিরা। তিন জন ঐ যুদ্ধে আহত হইছিলাম। আমি, আলতাফ ও আর একজনের নাম মনে নাই। আমি জ্ঞান হারাইলাম। জ্ঞান ফেরে আর তিন/চার দিন পর। আমার সাথি যারা ছিল, তারা আমাকে শিলংয়ের হাসপাতালে প্রথম নিয়া গেছিল। জানুয়ারি মাসে শিলং থেকে বিহারের লামকুমের হাসপাতালে আমাকে নেওয়া হয়। বর্তমানে আমি অঙ্গহীন অবহেলিত। তবু, আল্লাহর প্রতি আমি নারাজ না।'

...মধুর ডায়েরিতে আবার চোখ বুলাই, 'বঙ্গবন্ধু যখন দেখলেন যে এই সব কুলি, মজুর, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতীর সন্তান ও স্কুল কলেজের ছাত্ররাই সর্বাগ্রে দেশের জন্য প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং তারাই আহত হয়েছে। পঙ্গু হয়েছে। শহীদ হয়েছে। তখন তিনি সেইসব আহত, পঙ্গু ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ভেবে। তাঁদের ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের কথা ভেবে ১৯৭২ ইং সালের সেপ্টেম্বর মাসে গঠন করেন 'মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট।' মুক্তিযুদ্ধের চীপ অব স্টাফ মরহুম জেনারেল এম. এ. রব বীর উত্তমকে ১ম চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে বঙ্গবন্ধু গঠন করেন 'বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট।' কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠনে সগিয়া ইন্দিরা গান্দী ৭২ লক্ষ রুপী অনুদান হিসাবে প্রদান করেন। ভারত মাতার ৭২ লক্ষ রুপীসহ মোট ৪ কোটি টাকা মূলধন ও মিসেস

আদমজীর কোকো কোলা কোম্পানি, মিসেস মাদানীর গুলিস্তান সিনেমা হল, চু, চিন, চৌ, রেষ্টুরেন্টসহ গোটা গুলিস্তান ভবন নাজ সিনেমা ওয়াইজ ঘাটে মুন সিনেমা নবাবপুরে মডেল ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ হাটখোলায় হরদেও গ্লাস। ঢাকায় পূর্ণিমা ফিলিং ষ্টেশন। তেজগাঁয়ে কোকো কোলা, মেটাল প্যাকেজেস মিমি চকলেট কোঃ সিরকো সোপ এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি, মিরপুরে বাক্স রাবার কোম্পানি, চট্টগ্রামে ইষ্টার্ন কেমিক্যাল কোঃ, হোমেদিয়া ওয়েল কোঃ। বাক্সলী পেইন্টস কোঃ আলমাস, দিনার সিনেমাহলসহ মোট পাঁচটি সিনেমা হল ও ১৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ৮৮, মতিঝিল বা/এ ১টি ১তলা বিল্ডিংসহ মোট ২২টি প্রতিষ্ঠান নিঃসর্ত দান করে সেগুলো চালনার জন্য বঙ্গবন্ধু গঠন করে দেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট।

কমান্ডার এস, এম, নূর ইসলাম ততক্ষণে গল্প জুড়েছেন, 'আমার দেশ বৃহত্তর রংপুরের নীলফামারি জেলার...তখন নীলফামারি থানা ছিল.. সেই নীলফামারির চিকনমাটি গ্রামে। যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। আমি তখন মাত্র মেট্রিক পরীক্ষা দিয়া উঠলাম। আমি যুদ্ধ করছি ৬ নম্বর সেক্টরে তেঁতুলিয়া-পঞ্চগড় বর্ডারে। কর্নেল শাহরিয়ার ছিলেন আমাদের সাব-সেক্টর কমান্ডার। মে মাসের প্রথম দিকে আমাদের গ্রাম থেকে আমরা প্রায় ৮০-৮৫ জন ছেলে একসাথে বর্ডার ক্রস করি। সেসময় আমাদের ওদিকে ভাসানী-ন্যাপ পলিটিক্সের প্রভাব ছিল। তাই, রাজনৈতিক ভাবে আমরা মোটামুটি সচেতন ছিলাম। এছাড়াও গ্রামে যুদ্ধ শুরুর পরপরই এক রাজাকার চাকুর ভয় দেখিয়ে ছয়/সাত বছরের একটা মেয়েকে রেপ করার পর আমরা অনেকেই খুব কষ্ট পাই ও প্রতিকারের কথা ভাবতে থাকি। যাহোক, দার্জিলিং শিলিগুড়ির পাশে বাগডোগরার কাছে ডাঙ্গার হাট নামে একটা জায়গায় আমরা ২৯ দিন ট্রেনিং নিলাম। রাইফেল, এস.এল.আর., এস.এম.জি., এল.এম.জি., মর্টার, মাইন বা আরো নানা এক্সপ্লোসিভের ব্যবহার আমরা তখন শিখলাম। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে নেওয়া হলো। বিল্ডিং ওড়ানো, মাইন ওঠানো, ব্রিজ বা টাওয়ার ধ্বংস করা প্রভৃতি আমি শিখেছিলাম। এমন বেশ কিছু অপারেশন আমি সফলভাবে সম্পন্ন করি। আমাদের নানা অপারেশনের ভেতর উল্লেখযোগ্য একটি অপারেশন হলো পঞ্চগড়ের বোদা থানার বোয়ালমারীর যুদ্ধ। আমরা মোট ১১০ জন বাঙালি এফ,এফ, বা ফ্রিডম ফাইটার এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। এদের ভেতর আমরা দশ জন আবার ছিলাম ইন্টেলিজেন্সের লোক। তিস্তা নদীর পশ্চিম পাড়ে প্রায় ৩ মাইল এলাকা জুড়ে আমরা মাইন পুঁতে রেখেছিলাম। আমরা পজিশন নিয়েছিলাম নদীর পশ্চিম পাড়ে। আর, খান সেনারা ছিল পূর্ব পাড়ে। প্রায় ৭০ জন খান সেনা এই যুদ্ধে মারা যায়। রাশিয়ান মাইন, শর্ট গান ও স্টেনগান আমরা এই যুদ্ধে ব্যবহার করেছিলাম। আমাদের সোর্স আগের দিনই নদীর পূর্ব পাড়ে খান সেনাদের ঘাঁটি গাড়ার কথা জানালে আমরা ওদের প্রস্তুতি নিয়ে ওঠার আগেই উল্টা দিকে পজিশন নিয়ে যুদ্ধ শুরু

করি। বললে বিশ্বাস হবে না, যুদ্ধের পর রক্তে কয়েক মাইল জায়গা মনে হয় চোখের সামনেই লাল হয়ে গেল। আমরা ওদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র-শস্ত্রে প্রায় ৭টা মহিষের গাড়ি বোঝাই করলাম।'

ইসশ্...মধুর ডায়েরি এত বড়! পড়ে শেষই হতে চায় না। এত কথা ও লিখল কখন?

'মুক্তিযুদ্ধের চীপ অব স্টাফ মরহুম জেনারেল এম এ, রব বীর উত্তম ও মুক্তিযুদ্ধে চার নম্বর সেক্টর এর সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল সি,আর,দত্ত ছাড়া আর কোন ব্যক্তিত্ব কল্যাণ ট্রাষ্টকে শুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করতে পারেন নি। উক্ত দুইজনই একমাত্র সরাসরি চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব এসেছিলেন। বাকী যত জন এসেছেন এম ডি পদে ডেপুটেশনে এসেছেন ২/৩ বৎসর থেকে আবার চলে গেছে গাড়ি চালক, জি. এম, ডি, জি, এম, এম, ডি, সকলেই ডেপুটেশনে এসেছে। আবার চলে গেছেন। বাংলাদেশের জীবনে যেমন যেভাবে সরকার বদল হয়েছে। ঠিক তেমনই ভাবে কল্যাণ ট্রাষ্টের পরিচালক এম, ডি, বদল হয়েছেন। আর দেশকে না চালিয়ে যেমন প্রত্যেকটি সরকার নিজকে চালাতে চেয়েছেন চালিয়েছেন। তেমনি বিভিন্ন প্রকার আমলার পাল্লায় পড়ে ট্রাষ্ট সেভাবেই চলেছে। বুকভরা আসা নিয়ে বঙ্গবন্ধু যাঁদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে গঠন করেচিলেন কল্যাণ ট্রাষ্ট তাঁদের কোন কল্যাণ আজও ট্রাষ্টের পক্ষে করা সম্ভব হয় নাই। বঙ্গ বন্ধুর ইচ্ছা ছিল, এই ট্রাষ্টের আয় থেকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার ভরণ পোষণ হবে। মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে। তাঁদের ছেলে মেয়ের বিয়ে হবে। সকল কল্যাণমূলক কাজ করবে কল্যাণ ট্রাষ্ট। কিন্তু তদন্ত করলে দেখা যাবে, কল্যাণ ট্রাষ্টের আয় থেকে কল্যাণ ট্রাষ্টের কর্মকর্তারা হজ্ব করে হাজী হয়েছেন। বাড়ির, গাড়ির মালিক হয়েছেন। রঙ্গিন টি, ভি, ফ্রিজের মালিক হয়েছেন। কিন্তু যাঁদের কল্যাণ এর জন্য গঠন করা হয়েছিল কল্যাণ ট্রাষ্ট তাঁদের বাড়িতে রঙ্গিন টি, ভি, ফ্রিজ এর প্রশ্নই উঠেনা। মীরজাফরী রাজনীতি আর আমলাগিরীর কারণেই যেমন দিন দিন দেশ অধঃপতে যেতে বসেছে। কল্যাণট্রাষ্ট ত আমলাদের হাতে পড়ে বিলুপ্ত প্রায়। কোন প্রকারে ২/৫টা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকলেও সেগুলি আমলাদের নজের পড়ে সেগুলিও হাত ছাড়া হতে বসেছে। রাজনিতিক ভাবে প্রতিটি সরকার যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করেছেন। এম,পি থেকে মুক্তিযোদ্ধা বড়ভাইয়েরা পর্যন্ত হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সাধারণ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করেছে। করে নিজেরা লাভবান হয়েছে। হয়েছে গাড়ি বাড়ির মালিক। কিন্তু যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা? তিন বেলা খাবারও তাঁদের ভাগ্যে জোটেনা। একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত তাঁদের হচ্ছেনা। ২৯ বৎসরের বাংলাদেশে এক এক করে এক ডজনের উপর সরকার অতিবাহিত হয়েছে এর মাঝে অর্ধ ডজন বিচারপতি পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করেছেন। কিন্তু দেশমাতৃকার কল্যাণে কেউই সাফল্য ব্যঞ্জক উন্নয়নে সক্ষম হন নি। তেমনিভাবে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সয়ং দেশের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারদের না খেয়ে দিনাতিপাত করতে হয়।

'এছাড়া, পঞ্চগড়ের শিপটিহারিতেও আর একটা সাকসেসফুল অপারেশন করি আমরা, বুঝলে?' কমান্ডার নূরুল ইসলাম তাঁর অপারেশনের গল্পের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন, 'পঞ্চগড়ে পাকিস্তানিদের প্রায় তিন তলা উঁচু বাঙ্কার ছিল। বালুর বস্তা, কলাগাছ এই সব দিয়ে বাঙ্কারটা তারা তৈরি করেছিলো। আগস্টের শেষের দিকে বাঙ্কারের সামনে গিয়ে আমরা হামলা চালাই। এই যুদ্ধে একজন কর্নেলসহ ২জন পাকিস্তানি সৈন্য ও স্থানীয় পিস কমিটির হাফেজসহ আরো বেশ কিছু রাজাকার আমাদের হাতে ধরা পড়ে। বাকি পাকিস্তানিরা অনেকেই অবশ্য পালিয়ে যায়। ১৭টা বাঙালি মেয়েকে এই বাঙ্কার থেকে আমরা উদ্ধার করি। তবে, আমি নিজে যে যুদ্ধে আহত হলাম, সেটা হলো ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখের যুদ্ধ। দিনাজপুর জেলার খানসামা হাটের কাছে নদীর ধারে ভোর পাঁচটায় সম্মুখযুদ্ধ শুরু হলো। সকাল চারটা থেকেই আমরা অবশ্য সৈয়দপুরের দিকে অ্যাডভান্স করা শুরু করি। নদী পার হওয়ার সময় পাকিস্তানিদের সাথে আমরা মুখামুখি হই। ওরা পালাচ্ছিল। আমারা ইন্দো-বাংলা মিত্রশক্তি সংখ্যায় বেশ ভারিই ছিলাম। দুইটা ভারতীয় ব্রিগেডের প্রায় ১০,০০০ সৈন্য ছাড়াও আমরা বাঙালি ফ্রিডম ফাইটারই সংখ্যায় ছিলাম ১২০০ জন। ১৯ গুর্খা রেজিমেন্ট ও পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটা ব্রিগেড আমাদের সাথে ছিল। ৭০/৮০ টা ট্যাঙ্কও ছিল আমাদের সাথে। আমরা যখন নদী ক্রস করছিলাম...প্রায় হাজারখানেক গজ পথ ক্রস করার পর...হঠাৎই একটা মাইন বার্স্ট করে আমি আহত হই। আমাকে ভারতীয় সৈন্যরা অ্যাম্বুলেন্সে তুলে পরে সোজা হেলিকপ্টারে করে ঠাকুরগাঁ আকাশপথের বর্ডার পার হয়ে বাগডোগরা হসপিটালে ভর্তি করে। সেখান থেকে পুনার কির্কি ও কোলকাতা মেডিকেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসে আমি কোলকাতা মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য শয্যাবন্দি। আমার আব্বা খবর পেয়ে আমাকে সেখানে দেখতে গেলেন। এই তো আমার পঙ্গু হবার কাহিনী। অনিলের একটা কথা অবশ্য ঠিক। কাঠ বা রবারের...মানে নকল পা অনেক সময়ই লাইফ বা জীবন পায়। আমিও ত' একটা নকল পা নিয়ে বহুদিন হাঁটছি। একটা সময় নকল পা-ই জাগ্রত হয়ে ওঠে। যদি একবার একটা নকল পা গোটা বডি সিস্টেমের সাথে এডজাস্ট করতে পারে, তাহলে জীবনটা একরকম ভালই কেটে যায়!'

'১টা কথা এদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ থেকে শুরু করে অনেকেই জানেন ১১-৩-৭৩ ইং মুক্তিযোদ্ধা বিশ্রামাগার আহত, পঙ্গু, মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন হিসাবেও নামে থাকা সময় থেকে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ ইং পর্যন্ত কোন দিন বঙ্গবন্ধু কলেজ গেইট-এ অবস্থান রত আহত, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে আসেন নি। যে পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে, জন্মদাতা পিতামাতাকে উপেক্ষা করে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে আহত হয়েছে, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, কলেজ গেইটে অবস্থান রত সেই সন্তানদের কোন দিন কোন ভাবেই

দেখতে আসেননি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলীয় নেতা থাকা অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা বিশ্রামাগারে সেই সব মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে এসে আহত, পঙ্গুত্ব দেখে এবং তাদের অভিমানের কথা শুনে কেঁদে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে গেছেন। কিন্তু কেন? বঙ্গবন্ধু সেইসব সন্তানদের দেখতে আসেননি? সে কথা একমাত্র মোহাম্মদপুরের মরহুম নজরুল চাচা এবং আমি জানতাম। আসলে আহত, পঙ্গু সন্তানদের ২/৩ বা ৩/৪ জনকে দেখলেই তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন, কেঁদে ফেলতেন। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের মাথায় হাত দিয়ে সান্তনার ভাষাও হারিয়ে ফেলতেন। আর সেইসময় কলেজ গেইটে ২২৯ জন বিভিন্ন প্রকারের আহত, পঙ্গু, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। কারো বুকে, পেটে, কমরে, কলিজায় গুলি। চির জনমের মত পঙ্গু হয়ে গেছে। হাঁটতে পারে না। হুইল চেয়ারে চলাচল। কারো হাত নেই, কারো পা নেই। কারো শেলের আঘাতে চোখ, নাক নেই। মুখ পোড়া। এক সাথে এমনতর আহত, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা। একসাথে ২২৯ জন এমনতর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সন্তানকে দেখে সহ্য করতে পারতেন না বলেই বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২ থেকে ১৪ই আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত কলেজ গেটে মুক্তিযোদ্ধা বিশ্রামাগারে আসেননি। আসতে পারেন নি। আমি শ্রদ্ধেয় মৃত নজরুল চাচার মুখে শুনেছি জেনেছি এবং শুনে কেঁদেছি পর্যন্ত।

বাবর রোডে অবস্থানরত ১টি ৩তলা লাল রংএর বাড়িতে অবস্থান করতেন এই সোনার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারিনী বীরাঙ্গনারা। সেখানে তাঁরা (বীরঙ্গনা) কতজন থাকতেন, একমাত্র মরহুম নজরুল চাচা আর বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কেও অবগত ছিলেন না। আমরা তাঁদের দূর থেকেই দেখেছি। শুধু ১ জন বীরাঙ্গনা নিজে তাঁর পরিচয় দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা বিশ্রামাগারে আসতেন এবং গল্প গুজব করে আমাদের সময় দিতেন। আমার মনে আছে যে তিনি বলেছিলেন তিনি বি,এ, পাশ এবং তাঁর নাম "ডলি", আসল নামটি আমি জানতে পারিনি। আমি বরাবর সাক্ষাৎ হলে সালাম করে ডাকতাম "ডলি আপা।" ডলি আপা অনেক বার আহত, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা সেন্টারে এসেছেন। এক সাথে চা খেয়েছেন। বলেছেন, 'তোরা কিন্তু কম দিস নি। আমি নারী। আমার নারিত্ব লুন্ঠন করে নেওয়ায় আমার নারিত্বের যেমন সব শেষ হয়ে গেছে, তোদেরওতো পুরুষত্ব শেষ হয়ে গেছে। আমার চেয়ে তোরা কিসে কম? আমি ত' হাঁটতে পারছি তোরা? কোন দিন হাঁটতে পারবি না!' আমার সেই ডলি আপা নাকি পুলিশের কমিশন চাকুরী পেয়েছিলেন। কিন্তু, আজ, এখন ডলি আপা কোথায় আছেন কেমন আছেন জানি না।'

বুকের ভেতরটা চিনচিনে এক ব্যথা করে উঠলো। হ্যাঁ, ডলি আপা! মনে পড়ছে তাকে। সাদা সাদা রঙের শাড়ি পরতেন। চাঁপা ফুলের মতো রঙ আর লম্বা কালো চুল। তাকে দেখে মনেই হতো না যুদ্ধের এত ক্ষত আর বিভীষিকা তার উপর দিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তাকে গুনগুন করে গান গাইতেও শুনেছি, 'মধু গন্ধে ভরা!' পৃথিবীটাকে এত কিছুর পরও তার মধু গন্ধে ভরা কি করে মনে হতো?

## হাডুডু কাবাডির খেলোয়াড়

বুঝি এমনো হয়? না এমন হওয়া সম্ভব? মোহাম্মদ শামসুর আলী মণ্ডলের সাথে লতা বেগমের যখন বিয়ে হয়, তখন মানুষটা সারা শারশার সব গ্রামের ভেতর সেরা হাডুডু কাবাড়ি খেলোয়াড়। বছর বছর কাপ পায়। সপ্তম শ্রেণী পাস লতা বেগমের বিয়ে ঠিক হয়েছিল যশোর শহরের ওয়াপদার এক বিএ পাস কেরানির সাথে। রীতিমতো মাস মাইনের চাকরি করা ছেলে। কিন্তু বিয়ের কথাবার্তা শুরু হবার আগেই মোহাম্মদ শামসুর আলী মণ্ডল সকাল সন্ধ্যা দু'বেলাই লতা বেগমদের বাড়ির সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা শুরু করেছে। সেটা পাক-ভারত যুদ্ধের পরের বছরের কথা। আর লতা বেগম বাড়িতে ট্রানজিস্টারে সারাদিন কবরী-রাজ্জাকের ছবির গান শুনে এক মনে গুনগুন করে। ডুরে শাড়িতে পলকা, ফর্সা দেহ মুড়ে নিয়ে আর দু'টো কলা বেনীতে যে পাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে, অবাক করা আর কি যে তার বাড়ির সামনের মাঠেই দাঁড়িয়ে থাকবে গ্রামের সেরা হাডুডু কাবাডির খেলোয়াড়? ১৯৬৬ সালের শবে বরাতের পরের সন্ধ্যায় লতা বেগমের বাড়িতে যশোর শহরের ওয়াপদার কেরানি হাফিজুর রহমান আসাদের সাথে পান চিনির তারিখ ঠিক করা হয় আর সেদিন দুপুরেই প্রথমে খোদ যশোর শহরের কাজি অফিস ও পরে 'রূপালী চিত্র' স্টুডিওতে শামসুর আলী ও লতা বেগমকে দেখা যায়। স্টুডিওতে বড় বড় লাইটের সামনে সদ্যবিবাহিত শামসুর আলী মণ্ডল ঠিক সিনেমার নায়কদের মতোই লতা বেগমের আঁচল টেনে ধরার ভঙ্গিমায় বউকে নিয়ে ছবি তোলে। লতা বেগমের বাড়িতে দিন দশেক অনেক ফ্যাসাদের পর ধীরে ধীরে বিএ পাস কেরানি জামাইয়ের বদলে অষ্টম শ্রেণী পাস কিন্তু শারশা থানায় রাঘবপুর গ্রামকে বারবার হাডুডু কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন করে তোলা শামসুর আলী মণ্ডলকে মেনে নেওয়া হয়। সুন্দরী লতা বেগমকে বরণ করতে করতে শাশুড়ি আকিমন্নেসা বলেন, 'মিয়ের চিহারা ভাল। কিন্তু কেমন হাসি হাসি। গেরস্থ ঘরের বউ হবে গম্ভীর-সম্ভীর!' তা' সেই লতা বেগমের সংসার করার শুরু। কাবাডি খেলোয়াড় স্বামী তার চাকরি করে না। কিন্তু জমি-জমা ভালই আছে। একমাত্র ছেলে। তিন ননদই শ্বশুরবাড়িতে ঘর করছে। শ্বশুর বেঁচে নেই। শাশুড়ির সাথে এক বেলা ঝগড়া আর এক বেলা রান্নাঘর সামাল দেওয়া, আচার রোদে দেওয়া, কাঁথা বোনা কি গল্প করতে করতেই পাঁচ বছরে লতা বেগমের একটা ছেলেও হয়ে গেল। ছেলের মা হয়েও লতা বেগম ফর্সা ও পলকা শরীর ডুরে শাড়িতে মুড়ে আর দুই কলা বেণীতে গ্রামের সেরা সুন্দরী। আর আকিমন্নেসা বেগমেরও থেকে থেকে একই কথা, 'বউ কাজকাম ভালই করে। চিহারাও ভাল। শুধু বেশি বেশি হাসি। গেরস্থ ঘরের বউ হবে গম্ভীর-সম্ভীর!' ছেলের বউকে যে গম্ভীর হতে তার কাবাডি চ্যাম্পিয়ন ছেলেই দ্যায় না, তা' কি আর আকিমন্নেসা বোঝে না? ছেলের বাপ মা

হয়েও এরা দু'জনা পারলে প্রতি সপ্তাহে সিনেমা দেখতে যায়, রাতের খাওয়া খেয়ে নিদ না যেয়ে ট্রানজিস্টারে ফিল্মের গান শোনে। একজন আছে জমা-জমির কাজের পাশাপাশি কাবাডি হাডুডু নিয়ে, আর একজন বাচ্চার মা হয়েও কবরীর গান গায়। তা' সেই শামসুর আলী মণ্ডল যুদ্ধের শুরুর দিকে দক্ষিণ বর্ডারে খেলতে গিয়ে ফেরার পথে বাঘাছড়া এলাকায় দ্যাখে লাশের পর লাশ। কি হলো মণ্ডলের কে জানে? সে রাতেই আরো দু'জনকে সাথে নিয়ে সে চলে গেল ভারতের হাতিপুর। আকিমন্নেসা আর লতা বেগমের সংসারে দিন কতক পরপর রাজাকাররা এসে খোঁজ-খবর নয়, 'মণ্ডল কি মুক্তিতে ভিড়ল নাকি?' লতা বেগম তখন শুধু শঙ্খমালা পালার কথা স্মরণ করে আর কাঁদে। স্বামী চলে গেলে শঙ্খমালার ঘরে যেমন রাত-বিরাতে নানা পুরুষের টোকা, লতা বেগমেরও সেই দশা। তার উপর যুদ্ধের সময়। চারপাশে রাজাকার থিকথিক করছে। তিন মাস পর...ঠিক শঙ্খমালা পালার মতোই...রাতে যে টোকা দিল সে শঙ্খমালা থুক্কু লতা বেগমের স্বামী। দিশেহারা লতা বেগম শাশুড়িকে ডেকে তুললে শাশুড়ি সেই রাতে পিঠেসিটে বানিয়ে লতা বেগমের স্বামীকে খাওয়ায়। কি পিঠে? না, ছিটা রুটি আর খোলা মুচি পিঠে। দুই ধামা পিঠে খেয়ে শামসুর আলী তারপর আবার চলে যায় যুদ্ধে। বর্ডারে। কাবাডি খেলা, কখনো কখনো রেসলিং করা শামসুর আলী, পাঁচ সের চালের ভাত খাওয়া শামসুর আলী বর্ডারের যুদ্ধে লাইন পজিশনে থাকার সময় ক্রলিং করছিল। শরীরের বাম পাশে এসময় শেলিংয়ের গুলি লাগলে সাথীরা তাকে বশিরহাট থেকে বারাকপুর মেডিকেলে নিয়ে যায়। দুই বগলে দুই ক্রাচ সম্বল শামসুর আলী বাড়ি ফিরে, রাতে দরজা আটকে লতা বেগমের কাছে কেঁদে পড়ে, 'আমি যে আর পুরুষ নেই কো বউ! আমি যে আর তোকে সুখী করতে পারব নানে! তুই যদি তালাক চাস, আমি দিতি পারি!'

লতা বেগমও কাঁদে, 'রাখো ত'? একটা ছেলে ত' আছেই। আর কি লাগবি? সিনেমা হলে অ্যাডভাটাইস দ্যাখায় না যে *ছোট পরিবার সুখী পরিবার*? না হয় তাই হলো! আল্লাহ আমাদের সুখী পরিবার দেলেন?'

'সেই ছোট পরিবারেও ত' অন্তত দুইটা বাচ্চা লাগে। আমি যে তোকে আর বাচ্চা দিতে পারব নানে, তোর এই ভরা যৌবন...আমি যে নপুংসক হয়ে গেলাম রে বউ...আমি আর পুরুষ নেই রে বউ! এই পঙ্গুরে তোর আর ভাল লাগবে নানে....আমি জানি!'

...বিশ্রামাগারের বারান্দায় লতা বেগম হুইল চেয়ারটা ঠেস দেয়।
'ফাইলটা দে ত'। ফর্মটা ঠিক মতো ফিলাপ হলো কিনা দেখি?'

*বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট,*
*৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।*

তারিখ: এপ্রিল ১৫, ১৯৮২ ইং:
পিতার নাম:
ডাকঘর:
থানা:
জিলা:

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এর তালিকাভুক্ত এবং রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা প্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন তথ্যাবলীর সচরাচর প্রয়োজন হয় বিধায় নিম্নোক্ত ছকগুলি যথাযথভাবে পূরণ করে আগামী ২৫/৬/৮২ ইং-তারিখের মধ্যেও ট্রাস্ট এ প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(লে: কর্নেল মো: নজরুল হক, বি,পি)
পরিচালক (কল্যাণ বিভাগ)

বি: দ্র: অবিবাহিত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে সাথে সাথে কল্যাণ ট্রাস্টে বৈবাহিত তথ্যাবলী অবগত করতে হবে।

কেবলমাত্র যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য:

১) স্থায়ী ঠিকানা:
নাম: মো: সামছুর আলী মণ্ডল
পিতার নাম: মো: গোলাম আলী মণ্ডল
গ্রাম/মহল্লা: রাঘবপুর
ডাকঘর: চলতিবাড়িয়া দীঘা
থানা: শারশা
জিলা: যশোর।

২) বর্তমান ঠিকানা: ঐ

৩) বর্তমান পেশা: বেকার

৪) স্বাধীনতা যুদ্ধে পঙ্গুত্ব/অংগহানির বিবরণ: স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার পেটে শেল লাগে। পরে অপারেশন করিয়া কৃত্রিম নাড়ি সংযোজন করিয়া দেয় এবং অণ্ডকোষের বিচি নষ্ট হইয়া যায়।

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণী।

৬) বিবাহিত/অবিবাহিত: বিবাহিত।

৭) বিবাহিত হলে স্ত্রীর:

| নাম | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা |
|---|---|---|---|
| মোছাঃ লতা বেগম | ৩২ | ৭ম শ্রেনী | গৃহিনী |

ছেলেমেয়েদের বিবরণ:

| নাম | বয়স | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা |
|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ রাকিব হাসান | ১৩ | ৮ম শ্রেণী | ছাত্র |

*৯) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স কমিটি প্রদত্ত পরিচয় পত্র পেয়েছেন কি?*
*না*
*১০) পরিচয়পত্র পেয়ে থাকলে তার ক্রমিক নং: প্রযোজ্য নয়*
*১১) চিকিৎসার জন্য বিদেশে গিয়েছেন কি: গিয়েছি*
*১২) বিদেশে চিকিৎসার বিবরণ:*

| *দেশের নাম* | *চিকিৎসার প্রকৃতি* | *বিদেশে অবস্থানের দিন/সময়* |
|---|---|---|
| *ভারত* | *পেটে শেল লাগায় পেটের নাড়ি বাদ দিতে হয়; কৃত্রিম নাড়ি সংযোজন করতে হয়। এছাড়াও অণ্ডকোষের বিচি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।* | *ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ১২/০৫/৭২* |

*১৩) অংগীকার নামা: আমি এ মর্মে অংগীকার করছি যে, আমার প্রদত্ত উপরোক্ত তথ্যাবলী সম্পূর্ণ সত্য। মিথ্যা প্রমাণিত হলে তার জন্য আমি আইনত: দোষী সাব্যস্ত হব।*

*যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার স্বাক্ষর.....*
*তারিখ*

'ইংরেজি চিঠিখান কই রে বউ? আমার সাব-সেক্টর কমান্ডারের লেখা? কই রাখেছিস?'

লতা বেগম তড়িঘড়ি করে স্বামীর কাছ থেকে ফাইল নিয়ে ফাইল হাতড়ায়।

'এইখানা?'

'হ্যাঁ- হ্যাঁ-'

**TO WHOM IT MAY CONCERN**

Mr. Shamsul Ali Mondol, S/O. Golam Ali Mondal of Village: Raghabpur, P.O. Chaltiparia Degha, P.S. Sharsa, Dist: Jessore is a freedom fighter. He fought against the enemy under my command in Sector No. 8, Sub-sector A during Liberation movement of Bangladesh. He suffered a serious mortar shell blast and was admitted in Barrackpore Military Hospital, India.

I wish him every sucess in life.

Capt (Hony) Mahbubuddin Ahmed
Erstwhile P.S.P.
Sub-Sector Commander,
Sub-Sector A
Sector 8
South-Western Command
Bangladesh Liberation Army.

'আর ইন্ডিয়ার হাসপাতালের ডাক্তারের চিঠিখানা? সেটা কোন্‌খানে রাখেছিস বউ? সব কাগজ য্যানো ঠিক থাকে। নইলে ভাতা পাবনানে। কেউ বিশ্বাসই করতি চায় না আজকাল যে আমরা যুদ্ধ করিচি। যুদ্ধ ত' করি নাই- য্যানো উল্টো ডাকাত ছেলাম!'

'ওগো তোমার সব কাগজ আচে। দ্যাখো এইখানা, না?'

'হ্যাঁরে, ময়না পাখির দেখি আমার সবই মনে আচে...হ্যাঁ, এইখানা!'

CERTIFICATE

Certified that one MURPHY RADIO (bearing no 0792) in possession of MR SAMSUR ALI MONDOL was presented by a civil person on 15.1.72 as a gift when he was a patient of this hospital.

BASE HOSIPITAL (N G GANGOPADHYAY)
BARRACKPUR MAJOR
12 MAY 1972

'এবার দেখি কোন্ শালা আমারে অ-মুক্তিযোদ্ধা কয়?'

**তেলের ফেরিঅলা**

*ফোন: ৮৮২৬৮২৮, ৮৮২৭১৫৩ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট*
*কেবল: মুক্তিট্রাস্ট ২৫৭, তেজগাঁও শিল্প এলাকা*
*ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮২১৬৮ ঢাকা-১২০৮*
*তারিখ: ৭/১১/১৪১৫ বঙ্গাব্দ*
*১৯/২/২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ*
*পত্র নং- ক-১/যুঃ/ শের-১৫/০৯/৩৮০*

*বিষয়: রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা এর চিকিৎসা প্রসঙ্গে*

*বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা,*

*পিতা-মৃত সিদ্দিক উল্ল্যাহ, গ্রাম- কাকিলাকুড়া, পোঃ মলামারী, থানা- শ্রীবর্দী, জেলা- শেরপুর-কে ট্রাস্টের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়* হাসপাতালে চিকিৎসা পরামর্শ দিয়েছেন (কপি সংযুক্ত)।

*২) অতএব, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম মোস্তফাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করা হলো।*

**পরীক্ষিত**

*তত্ত্বাবধায়ক মহাব্যবস্থাপক,*
*বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল কল্যাণ।*
*কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ।*
*শাহবাগ, ঢাকা।*

গোলাম মোস্তফা এই বিশ্রামাগারে থাকে না। তবে মাঝেমাঝে আসে। স্বাধীনতার পর সে বোধ করি রক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর গত ত্রিশ বছর ধরে সে তেল ফেরি করে সংসার চালিয়েছে। ২০০৩-এ একটা ব্রেইন স্ট্রোকের পর ওর শরীরের চল্লিশ ভাগই নাকি এখন অচল। প্রায়ই হাতে একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে এই বিশ্রামাগারের অফিস কক্ষের সামনে হত্যা দিয়ে বসে থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা।

'মোস্তফা নাকি? কি খবর?'

'এই তো ভাই। তোমার কি খবর?"

'শরীরটা ভাল না। সামনে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। এইজন্য কল্যাণ ট্রাস্টের জিএম আর পিজির বড় ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে ছোটাছুটি করছি।'

'তুমি যেন কোন্ এলাকার মানুষ? কোথায় যুদ্ধ করেছো?'

'আমার বাড়ি ত' নোয়াখালি। কিন্তু যুদ্ধ করছি শেরপুরে। বাবা শেরপুরে পাটের ব্যবসা করতো। আমরা আছিলাম চার ভাই তিন বোন। ট্রেনিং নেই মেঘালয়ের তুরায়। এপ্রিলের ১৪ তারিখ ট্রেনিং শুরু হইছিল। মেঘালয়ের মহেন্দ্রগঞ্জে বি,এস,এফ ক্যাপ্টেন নেগি আমাদের তাঁবু দিল। প্রায় একশোর মতো ছেলে আমরা জড়ো হইছিলাম। প্রাথমিক ট্রেনিংয়ের পর কারো পোড়াখাসিয়া, কারো মাহেন্দ্রগঞ্জ আবার কারো বাহাদুরাবাদ ঘাটে দায়িত্ব পড়ে। আমাকে দেওয়া হলো পোড়াখাসিয়া ক্যাম্পে। রাজারবাগ পুলিশের আলম সাহেব ঐ ক্যাম্পে সেকেন্ড ইন কমান্ড বা টু-আই-সি'র দায়িত্বে ছিল। কর্নেল তাহের ছিলেন আমাদের সেক্টর কমান্ডার।'

'হুম্...তাহেরের কথা মনে আছে?'

'থাকবে না? যুদ্ধের শেষের দিকে আমাদের চোখের সামনেই ত' ইনজুরি হইয়া জন্মের মতো ল্যাংড়া হইয়া গেল। এমন মানুষটারেও এই দেশ ফাঁসিতে

ঝোলাইছে...হায়রে দেশ! আমার সোনার বাংলা!'
'তোমার বড় যুদ্ধগুলা কোনটা কোনটা? একটু বলবা নাকি?'
'এতকাল পরে এইসব শুইনা কি লাভ?'
'আসলে মধু ছিল না? চাঁপাইনবাবগঞ্জের? মারা গেছে কয়েক বছর হয়?'
'হ্যাঁ'...
'ও একটা ডায়েরি রেখে গেছে। ওই ডায়েরিটা পড়তে পড়তেই মনে হলো...আমাদের এই রেস্ট হাউজে যত অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা আছে, রেস্ট হাউসের বাইরে থেকেও তোমরা যারা মাঝে মাঝে এখানে আসো...সবারই ত' যুদ্ধে কত কাহিনী আছে। আজকাল কেউ এসে জিজ্ঞাসাও করে না। করলেও ঐ ২৬ শে মার্চ আর ১৬ই ডিসেম্বর। তাই মধুর দেখাদেখি আমিও একটা খাতা বানালাম। সবার অপারেশনের স্মৃতি তুলে রাখছি।'
'তুমি পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা। হুইল চেয়ারে চলো। পত্র-পত্রিকা বা টিভির জার্নালিস্ট ত' না। তাহলে এইগুলা তুইলা লাভ?'
'লাভ অলাভের ত' কথা না। আগে সবার যুদ্ধের গল্পগুলা ত' শুনি।'

'শুনলে শুনবা। আমার ত' তিন/চার ঘন্টা এম্নিতেও সিরিয়ালে বসে থাকতে হবে। তার ভেতর তুমি যদি আমার অপারেশনের গল্প শুনতে চাও ত'...ত' শোনো..'৭১-এর মাঝামাঝি পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আমাদের প্রথম মুখামুখি সঙ্ঘর্ষ হয়। তখন জুন মাস। রাত ৩:৩০টার মতো বাজে। তেনাছড়া ব্রিজ উড়াইতে আমরা প্রায় দেড়শ' ছেলে রাত তিনটা কি সাড়ে তিনটায় সুরমা নদীর ব্রিজের উপর উঠে দেখি গাড়ির আলো। পাঞ্জাবিদের গাড়ির আলো। আমি ডিনামাইটে আগুন দিলাম। পাঞ্জাবিদের তিনটা গাড়ি নষ্ট হইলো। অনেক বিহারী আহত হইলো। বর্ডারের এক পাশে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প আর এক পাশে বদর বাহিনী ও বিহারীদের ক্যাম্প। আমাদের সাথে ছিল থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এস,এল,আর, স্টেনগান ও লাইট মেশিন গান। সেই প্রথম দিনের অপারেশনে খুব ভয় পাইছিলাম। পরে ধীরে ধীরে ভয় কাটে আমার। শ্রীবর্দী, বক্সিগঞ্জ, কামালপুর, শেরপুর, ভায়াডাঙা, নক্সি এইসব জায়গায় অনেক অপারেশন করছি আমি। আমরা শ্রীবর্দী থানার বিহারী ক্যাম্প ও বক্সিগঞ্জ, ঝিনাইগাতি আর কামালপুরের বিহারী ক্যাম্পও উড়ায় দিছি। তাহের ছিলেন মাহেন্দ্রগঞ্জে। কাকিলাকুরার যুদ্ধে কয়েকজন বিহারী আমার পিঠে ও পেটের ডানদিকে বেয়োনেট চার্জ করে। তখন কর্ণজোড়া পাহাড়ের দীনেশ চৌধুরী তার বাবার সম্পত্তি বিক্রি করে আমাকে এক মাস সেবা শুশ্রুষা করে। নভেম্বরের ২৮ তারিখ আমরা বিহারীদের কাছে 'সারেন্ডার লেটার' পাঠানোর নোটিশ দিই। শেষ যুদ্ধ হয়েছিল ময়মনসিংহের শেরপুরে। এখন তো শেরপুর নিজেই আলাদা জেলা। আমি এক মাস বিশ্রামের পর এই শেষ যুদ্ধে অংশ নিই। যুদ্ধ শেষে ১১

নম্বর সেক্টরের সবাই আমরা জমায়েত হয়ে অস্ত্র জমা দিই। যুদ্ধের পর বিয়া করলাম। চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে। এখনো কেউ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে নাই। সংসার চালাই তেল ফেরি করে। এই ত' আমার গল্প।'

(গত কয়েকদিন মধুর ডায়েরিটা নিয়ে বসা হয় নি। আজ আবার পড়লাম কিছুটা! পাঠক বিরক্ত হতে পারেন। ভাবতে পারেন যে কেমন প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে আমি লাফিয়ে চলেছি নির্দিষ্ট কোন গল্প না শুনিয়েই। আসলে পাঠক, আপনাদের আমি নির্দিষ্ট কোন গল্প শোনাতে চাচ্ছিও না। আমি শুধু চেয়েছি আমার স্বল্পশিক্ষিত বন্ধু ও সহযোদ্ধা বীর প্রতীক মোদাচ্ছার হোসেন মধু...যার সাথে যুদ্ধের বাঙ্কারে আটটি মাস আর পরের ৩৪টি বছর একই রেস্ট হাউসে কাটিয়েছি...তার অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত দিনপঞ্জি উপহার দিতে। আসলে মধুর ডায়েরি আমিই আমার ভাগ্নি নাতাশাকে বানান সংশোধন না করে ও বাক্য গঠন রীতি অবিকৃত রেখেই কম্পোজ করতে নির্দেশ দিয়েছি। পাঠকের হয়তো কষ্ট হবে। তবে, একজন স্বল্পশিক্ষিত যোদ্ধার অকৃত্রিম কণ্ঠস্বর তারা এখানে পাবেন):

...প্রথম দেশ স্বাধীনের পর একটা গোপন সরযন্ত্র অবশ্যই হয়েছিল তা যতদুর সম্ভব আমাদের শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক বড় ভাইয়েরা করতে বসেছিলেন। যেমনটি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের খেতাব নিয়ে। স্পষ্ট যে ৭জন বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে কোন এফ, এফ মুক্তিযোদ্ধা নেই। অথচ আমার জানা মতে ভারতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আমার সাথী মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মো. সামসুদ্দীন ও আমি দুজনেই বীর শ্রেষ্ঠ ক্যাপটেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর এর অধীনস্ত ৭ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা সামসুদ্দীন চাপাই নবাবগঞ্জ সাব সেক্টরে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে একা ১৮জন পাক সেনাসহ ৭/৮ জন রাজাকারকে হত্যা করার পর সাথীদের জীবন রক্ষা করে নিজে সাহাদাত বরণ করেন। অথচ তাঁর বৃদ্ধা মাতা মালেকা খাতুন ১৫শ টাকা মাসিক রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সামসুদ্দীন এফ. এফ বলে জোটেনি তাঁর ভাগে ১টি রাষ্ট্রীয় খেতাব। ঠিক মুক্তিযুদ্ধের বীর শ্রেষ্ট, বীর উত্তম, বীর বীক্রম ও বীর প্রতীক খেতাব গুলি নিয়ে যেমন একটা টান টানাটানি ও ষড়যন্ত্র হয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে বড় ভায়েরা বঙ্গবন্ধুকে নানান রকম কান কথায় ভুলিয়ে নি:শ্চিহ্ন করে ফেলতে চেয়েছিলেন ভারতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের।

দির্ঘ্য নয়মাস মরন পন লড়াইয়ের ফসল ১৯৭১ ইং সালের ১৬ইং ডিসেম্বর বাঙ্গালী ঘরে উত্তোলন করে। ৩০ লক্ষ শহীদ ২ লক্ষ্যাধিক মা বোন এর ইজ্জত ও কয়েক শত দুর্দাম দামাল সন্তান এর অঙ্গ হানির বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ এর স্বাধীনতা লাভ এর পর পরই বিভিন্ন জেলা থেকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা চিকিৎসার প্রয়োজনে রাজধানি ঢাকাতে এসে উপস্থিত হতে থাকে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, পিজি হাসপাতাল, মহাখালী বক্ষ ব্যাধী হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালসহ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সব খানে আহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা অথবা মহান মুক্তিযুদ্ধে

পাক হানাদার বাহিনীর গোলার আঘাতে আহত বাঙ্গালী জনগন। সবাই চিকিৎসার প্রয়োজন মনে করে ঢাকায় উপস্থিত। ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারাও নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতার স্বাধ ভোগ করার জন্য ভারতের হাসপাতালের উন্নত চিকিৎসা ত্যাগ করে মাতৃভূমিতে এসে রাজধানিতে ভীড় জমায়। ফলে প্রতিটি হাসপাতালে সাধারণ রোগীদের স্থান সংকুলান হয়ে পড়ে। হাসপাতালে সাধারণ রোগী চিকিৎসার সাথে সাথে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারাও চিকিৎসায় আসলে প্রতিটি হাসপাতালে স্থান সংকুলান হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা মগবাজারে ১টি বাড়িকে 'শুশ্রী' নাম দিয়ে চিকিৎসাধীন বসবাস করতে থাকেন।"

## মাত্র চল্লিশ পার্সেন্ট

সৈয়দপুর শহরের আবুল কালাম যুদ্ধের পরপর...সেই ১৯৭২ সালে যখন আমাদের এই বিশ্রামাগারে বাস করতে এলো...তিন-চার মাস পর নিজেই অস্থির হয়ে রিলিজ নিয়ে বাড়ি চলে গেল। বয়সে সে আমাদের কিছু বড়ই ছিল। চব্বিশ-পঁচিশের মতো বয়স তখন তার। তা' আবুল কালামের একটাই কথা। যুদ্ধে তার মাত্র একটা হাতই একটু ভেঙেছে, দু'টো চোখের একটাই না হক কানা হয়েছে আর কাণের পর্দা ফেটেছে, তবু সে ত' মাত্র চল্লিশ পার্সেন্ট ডিসএবল। বউ আর একটাই ছেলে তার...তাদের সাথে ঘর করার যোগ্যতা...মাত্র এটুকু ক্ষতিতে পুরুষ মানুষ সংসার করার যোগ্যতা হারায় কি? সে দেশে ফিরে...দুই পা ত' তার অক্ষত...হাত একটা ভেঙেছে কিন্তু নুলো ত' হয় নি...শুধু চোখের দৃষ্টি সামান্য কমে যাওয়া...একটা মার্বেল পাথরের নকল চোখ না হয় সে বানিয়েই নেবে...তাতে বউয়ের কাছে রূপও তার কমবে না...রোজগারের ক্ষমতাই কি কমে যাচ্ছে? দুই হাত আর দুই পা ঠিক থাকলে সে চাইলে আজো রিক্সা চালিয়েও সংসার দেখা-শোনা করতে পারে। আবুল কালাম ফিরে এলো এক বছরের মাথায়।

'তুমি কি চেক আপ করাতে এলে? ক'দিন থেকে চলে যাবে নাকি...?'

আবুল কালাম এর উত্তরে কিছু বলে না। শুধু টের পাই ওর ভেতরের অব্যক্ত গোঙানি আর ফোঁপানি। ক'দিন এমনি চললো। খানিক বাদে বাদে কেয়ার টেকার তখন যে ছেলেটা ছিল...রন্টু না...রন্টু ত' অনেক পরে এলো... খোকন ছিল ছেলেটার নাম...তাকে দিয়ে বিড়ি আনায় আর বিড়ি খায়...আর মন খারাপ করে বসে-শুয়ে থাকে। বাঁধ ভাঙ্গলো এক রাতে।

'মেয়ে মানুষ যে এত ছেনাল হয়...'

'কী ব্যাপার? গালি দিচ্ছেন কাকে? কালাম ভাই?'

'কাকে আর দেব? দেই আমার কপালকে!'

'কী হয়েছে?'

কী আর হবে? আবুল কালাম ভাই নিরুদ্ধ ক্ষোভে গর্জে উঠেছিলেন। তার এত যত্নের, এত আদরের বউয়ের আর সংসারে মন নেই। কানা আবুল কালামকে তার আর ভাল লাগে না। যতই মার্বেলের চোখ নিক আবুল কালাম, সারাদিন তো ঐ নকল চোখ পরে সে বসে থাকতে পারে না। ঘুমানোর সময় কি হাত-মুখ ধোবার সময় নকল চোখ সে খুলে ফ্যালে। বউ তখন কেমন কেমন করে। বাসা থেকে সামান্য দূরে একটা চায়ের দোকান দিয়েছিল বৈকি আবুল কালাম। দিন শেষে ভালই লাভ হচ্ছিল। কিন্তু দু'দিন অসময়ে ঘরে ঢুকে বউয়ের এক দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই আফজালকে আবিষ্কার করেছে সে। একদম বিছানায় না হলেও...মোটামুটি অন্তরঙ্গ ভঙ্গিমাতেই দু'জন ধরা পড়েছে...অন্তরঙ্গ ভঙ্গিমা অর্থ সে যে তাদের চুমু খেতে বা আলিঙ্গন করতে দেখেছে তা'-ও নয়...কিন্তু তারা হাসছিল ও পাশাপাশি বসে ছিল...অসময়ে এমন পাশাপাশি বসে হাসা ও গল্প করা...বউ সাজুগুজু করা...এর অর্থ কি? প্রথমে তার ঝোঁক চেপেছিল বউকে সে কোপাবে। সেই সাথে বউয়ের প্রেমিককেও। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিতে না নিতেই কে একটা লোক যেন তার ভেতরে হেঁকে হেঁকে বলে, 'তুমি হলে ঘর করতা কানীর সাথে? রাতে শোবার সময়...আদর করার সময়...তোমার যে একটা চোখ থাকে না...তোমার বউ তো তা' সহ্য করে...উল্টাটা হলে কি হতো?' সে লক্ষ্য করেছে বউ তার ইদানীং প্রায়ই শরীর খারাপের অজুহাত তোলে। আসলে আবুল কালামকে এড়ানোর চেষ্টা।

'বুঝলাম। কিন্তু একদিক থেকে দেখলে...কালাম ভাই...আপনি নিজেই ত' বুঝছেন যে উল্টাটা ঘটলে আপনি এমন কোন মেয়ের সাথে ঘরই করতেন না। কোন সুস্থ, সুন্দরী মেয়ে ফিরে বিয়ে করতেন।'

'ও কি আমাকে দয়া করে? কি মনে করছে ও? গোপনে এমন খেলা খেলার চেয়ে আলাদা হলেই পারে? আমার কাছে চাইলে ওকে তালাক দেই!'

'হয়তো আপনাদের ছেলেটার কথা ভাবছে?'

'হ্যাঁ- ছেলে- ছেলের কথা ভাবলেও ত' কানা স্বামীর অক্ষমতা ক্ষমা করা যায়, যায় না?'

'কি জানেন? মেয়েদের সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশি। আমরা, পুরুষ মানুষেরা, মেয়েদের কাছ থেকে অনেক কিছুই চাই...অথচ তার এক ফোঁটাও আমরা তাদের জন্য করতে পারি না!'

'থামো- থামো- তুমি একদম মাইগ্যা পুরুষ মানুষ...'

আবুল কালাম উঠে গেছিল। তার দু'দিন পরের সকালে আমাদের ঘুম ভেঙেছিল কেয়ার টেকার খোকনের তীব্র চিৎকারে। বাথরুমে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে মরেছিল আবুল কালাম। আবুল কালামের বউ আর ছেলেও এসেছিল খবর পেয়ে।

ছেলেটার বয়স বছর তিনেক। কালো ও রুগ্ন। গলায় একগাদা তাবিজ। নাকে সর্দি আর কপালের এক কোণে ধেবড়ানো কাজলের টিপ পরা বাচ্চাটা মা'র কোলে বসে ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদছিল। কালো বোরখা ঢাকা নিরীহ গোছের সেই মেয়েটা আসলেই তার দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাইয়ের সাথে জড়িয়েছিল কিনা অথবা সবটাই অসুস্থ ও হীনমন্যতা বোধে আক্রান্ত আবুল কালামের উত্তেজিত কল্পনা...আজ আর আমার ভাল মনে নেই! মনে করতেও পারি না। শুধু আবুল কালামের ফাঁসি নেওয়া চেহারাটা আমার চোখে ভাসে। জিহ্বা বেরিয়ে এসেছে। বেঁচে থাকার শেষ মূহূর্ত অবধি আমাদের সাথে গল্প করার সময় তার নকল চোখটা পরা থাকতো। কিন্তু মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেবার সময় সে বোধ করি আর নকল চোখটি চাপাতে চায় নি। যুদ্ধ তার চেহারার যে হাল করেছে, সেই হালেই হয়তো বিদায় নিতে চেয়েছিল।

...সেই ১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরে যাওয়া সৈয়দপুরের আবুল কালামের কথা আজ এত বছর পর কয়েকদিন ধরে থেকে থেকে কেন মনে পড়ছে বুঝতে পারছি না। আজ ভোররাতে তাকে স্বপ্ন দেখলাম। আবুল কালাম আমাকে কি যেন বলছে! আমি তার গলার স্বর শুনতে পারছি না। কিন্তু সে হেসে হেসে আমাকে কি যেন বলছে! আমরা দু'জন একটা বিস্তীর্ণ সরিষা ক্ষেতে দাঁড়ানো। সরিষা ক্ষেতে হাওয়া দুলে দুলে উজ্জ্বল হলুদের তরঙ্গ বইয়ে দিচ্ছে। কোথাও একটা লাল ঘুড়ি উড়ছে। উফ্...শীতে এই বিশ্রামাগারের স্যাঁতসেঁতে ঘরগুলো আরো স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। যাই, হুইল চেয়ারটা টেনে টেনে বারান্দায় একটু রোদে গিয়ে বসি। মধুর ডায়েরিটাও পড়া যাবে:

'শুশ্রী'র মত শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের সামনে ১/৬ ও ১/৩ গজনবী রোডের ২টি বাড়িতে ৪০/৫০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা (ফ্লোরিং) মেঝেতে শুয়ে অবস্থান করেন আর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা (ড্রেসিং) করান। ১/৬ ও ১/৩ গজনবী রোড, মোহাম্মদপুরে বিহারীদের ফেলে যাওয়া ২টি পরিত্যক্ত বাড়ি ছিল। যাহা পরবর্তীতে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। ১/৬ ও ১/৩ নং বাড়ির লাইনে আরও ১টি পরিত্যাক্ত বাড়ি ছিল। যেখানে বরিশালের তদানিন্তন এম, পি, এনায়েতুল্লাহ খান বসবাস করত। হাসপাতালে সাধারণ রোগীর পরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা করতে বিছানাসহ স্থান এর অভাব হয়ে পড়লে শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে অবস্থান রত ও ১/৬ ও ১/৩ বাড়িতে অবস্তানরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হয়ে এম, পি, এনায়েতুল্লাহ খানকে অনুরোধ করেন। বলেন, স্যার- আপনারতো ঢাকায় আরও বাড়ি আছে। তাই বিহারীদের ফেলে যাওয়া এই বাড়িটি আমাদের বসবাস এর জন্য দিয়ে দিলে আমাদের উপকার হত। সেই সাথে হাসপাতালে সাধারণ রোগীদেরও চিকিৎসার সুবিধা হতো।'...

*দয়াল বাবা কেবলা কাবা...*

*দয়াল বাবা কেবলা কাবা, আয়নার কারিগর*
*আয়না বসায়ে যেমন কলবের ভিতর...*

দু'জন মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফাকে চিনি আমি যারা দু'জনেই মুক্তিযোদ্ধা। একজন এই বিশ্রামাগারেই অষ্টপ্রহর থাকে। তার স্ত্রী, এক ছেলে, পুত্রবধূ ও নাতিকে এই বিশ্রামাগারেই সরকার দু'টো রুম বরাদ্দ করেছে। তার নাম মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা বীর বিক্রম বীর প্রতীক। যুদ্ধে খুব বড় রিস্ক নেওয়ায় তাঁর এই পদক প্রাপ্তি। আশপাশে বিহারীদের ফেলে যাওয়া আরো কয়েকটা ঘর-বাড়ি আরো কিছু হুইল চেয়ার বন্দি মুক্তিযোদ্ধাকে দেওয়া হয়েছে যারা পরিবারসহ থাকে। অন্য মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা অবশ্য স্বাভাবিক। যুদ্ধে হাত-পা কিছু যায় নি তার। তবে ইদানীং মনে হয় কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝেই এই বিশ্রামাগারে আসে। তার গল্প ইতোমধ্যেই করেছি। বীর বিক্রম বীর প্রতীক মোস্তফা হুইল চেয়ার বন্দি হবার পর থেকে মারফতি তরিকায় বিশ্বাস করে। তার ছেলে যেদিন থেকে ট্যাক্সি ক্যাব চালানো শুরু করেছে, সেদিন থেকেই রীতিমতো সাউন্ড সিস্টেমসহ একটি বড় ক্যাসেট প্লেয়ার কিনে দিনরাত মারফতি গান বাজায় সে, 'দমাদম মস্ত কলন্দর' কি 'দয়াল বাবা কেবলা কাবা, আয়নার কারিগর!' আয়নার কারিগর অর্থ কি? কলব বা আত্মায় আয়না বসানো? অপূর্ব উপমা! সুফি সাধনার কত যে পন্থা! লালন সাঁইয়ের গানেও 'আরশি নগর' কথাটা আছে। 'আরশি নগর' অর্থ আয়নার শহর। সিটি অফ মিরর। পারস্যের সুফিবাদ, ভারত ও বাংলার ভক্তিবাদ মিলে কত না শব্দ, কত না উপমা! সারাদিনই ক্যাসেটে জোর শব্দে চালানো মারফতি গান যার ছন্দ অনেক সময়ই আধুনিক র‍্যাপ বা পপের সাথে মিলে যায় আর হুঁকায় গাঁজা পুরে মোস্তফা যেন রক্তনেত্র শিব। তবু এই মোস্তফাই আবার আমাদের বিশ্রামাগারের লিডার। গতবার নানা কায়দা-কৌশল করে, উপরমহলকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আমাদের মতো একপাল বিকলাঙ্গকে নিয়ে সে গেছিল কক্সবাজার। সি বিচের বালুতে আমাদের হুইল চেয়ার টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। স্থানীয় কিছু ছাত্রও তখন আমাদের সাহায্য করেছে। খুব ভয় লাগছিল যে কখন সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত ফেনা এসে হুইল চেয়ারসুদ্ধ আমাদেরও টেনে না নিয়ে যায়! অবশ্য নিলে মন্দ নয়। তলিয়ে যাব সমুদ্রের গর্ভদেশে। যেখানে তারামাছ, সী হর্স আর প্রবাল প্রাচীর রয়েছে। চাইলে মিলে যেতে পারে মৎস্যকন্যা বা উভচর মানুষও। সমুদ্র আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল প্রায় আটত্রিশ/উনচল্লিশ বছরের নরকদাহ।...

'মোস্তফা! 'আয়নার কারিগর' মানে কি?'
বিশ্রামাগারের উঠানে শীতের রোদ আছড়ে পড়েছে। হুইল চেয়ারটা টেনে টেনে

কাঙালের মতো উঠানে যাই। হয়তো রৌদ্রভুক হতে চাই বলেই?
'কী জানি বন্ধু! গান যারা লিখছে তারা জানে...'
'না, তুমি ত' দিব্যি মারফতি তরিকার মানুষ।'
'কি করি? যুদ্ধের পর থেকে পঙ্গু। তোমার মতো বারো ক্লাস ইংরেজি বই পড়া নাই যে বই পড়ে সময় কাটাবো! তাই মাঝে মাঝে একটু সেবা করি আর আল্লা-রসুল-মুর্শিদের গান শুনি।'
'তোমার এই হুইল চেয়ার নিতে হলো যেন কোন্ অপারেশনের পর থেকে?'
'এই রে...মধুও তার একটা খাতা রেখে মারা গেল...আর তোমারও কি এক ভুত চাপলো মাথায় যে দিনরাত ঐ খাতাখানা পড়া আর সবার মুখ থেকে তাদের অপারেশনের গল্প শুনে খাতায় টোকা...পারব না বাবা!'
'তবু একটু বলো!'
'উফ্...বলার আর কি আছে? দেশ ছিল আমার কুমিল্লার বিবি বাজারে। যুদ্ধ করছি তিন নম্বর সেক্টরে। 'জেড' ফোর্স, 'কে' ফোর্স আর 'এস' ফোর্সের ভেতর আমি যুদ্ধ করছি 'এস' ফোর্সের আন্ডারে। যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানির সদস্য। ৬ই ডিসেম্বর ঢাকা-দোহার সম্মুখযুদ্ধেই এই হুইল চেয়ারের রোগী হইতে হইলো আমার।'
'আর একটু ডিটেইলে বলো না!'
'খাইছে খোদা! শোন, ডিসেম্বরের এক তারিখ হবিগঞ্জের মাধবপুর আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল থানার মাঝখানে চান্দুয়া ডাকবাংলো যাবার পথে খবর আসলো যে সরাইল থানার শাহবাজপুর ব্রিজের কাছে পাঞ্জাবিরা আছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু শাহ মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রম ছিলেন আমাদের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার। চান্দুয়া বা ভোপালপুর ব্রিজের কাছে এসে নাসিম সাহেব আর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন 'জয় বাংলা' বলে পাঞ্জাবিদের গাড়ির সামনে গিয়া ত' ব্রাশফায়ার শুরু করলো। নায়েক মূর্তজা অ্যাকশন নিয়ে ব্রিজের একপাশে আর নায়েক আবুল কালাম আজাদ অপর পাশে গিয়ে ব্রাশফায়ার শুরু করলো। কোম্পানি কমান্ডার টোয়াইসি সিপাহী আদম আলীও যুদ্ধে ছিলেন। হাবিলদার রফিক, সিপাহী মজিবরসহ অনেকেই এই যুদ্ধে ছিল আমার সাথী। ১৮/১৯ জন পাঞ্জাবি সৈন্য আমাদের কাছে হারলো। আমি এই যুদ্ধেই আহত হইলাম। যে সে আহত না! আহত হবার পর গৌহাটি, পুনা, লাখনৌয়ের কমাণ্ডো হাসপাতাল...তিন/তিনটা হাসপাতালে আমাকে নেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর বিদেশে চিকিৎসার জন্য ১৯৭৫-এর নভেম্বর মাসে পাঠানো হয়। আমি দেশে ফিরি আর ১৯৭৭ এর অক্টোবরে। এই তো আমার গল্প। এখন যে কয়টা দিন বাঁচি আল্লা-রসুল-পীর-মুর্শিদের নাম করে মরতে পারলেই হইলো! তাস খেলবা? নাকি ঐ ডায়েরি পড়বা আবার?'
'দেখি, একটু ডায়েরি দেখি আবার!'

'এনায়েতুল্লাহ খানকে বাড়ি ছাড়ার অনুরোধ জানালে এনায়েতুল্লাহ খান রাগান্বিত হয়ে উঠেন এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের গালি গালাজ দেওয়া শুরু করেন। এনায়েতুল্লাহ খান এর গালাগালি ও চিল্লাচিল্লিতে রাস্তার সাধারণ মানুষ থেকে হাসপাতালের ভিতর থেকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা এসে হাজির হন কলেজ গেইট এর ১/১ গজনবী রোড এর বাড়ির সম্মুখে। ততক্ষণে রাগান্বিত এম, পি, এনায়েতুল্লা খান ঘর থেকে তার ২ নালা বন্দুক বের করে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গুলি চালায়। এনায়েতুল্লাহ খান এর বন্দুকের গুলিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ওলি আহাদ ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। ওলি আহাদকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ব্যাতিব্যস্ত। হাসপাতালে নেবার মত অবস্থার অবসান ঘটিয়ে চির বিদায় নিয়েছেন সাথী ওলি আহাদ। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা বন্ধুকে নিয়ে ব্যাস্ত এই ফাঁকে এনায়েতুল্লা খান পরিবার পরিজন নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লে ঘটনা স্থলে এসে প্রথম এসে হাজির হন বঙ্গবীর আঃ কাদের সিদ্দিকী। কাদের সিদ্দিকী ঘটনা শুনে আর ওলি আহাদের লাশ দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। জিজ্ঞেস করেন কোথায় রাজাকারের বাচ্চা। বলে সদর ঘাটের দিকে তাঁর জীপ নিয়ে তড়িৎ গতিতে চলে যায়। যাবার পূর্বে বলে গেলেন, কোথাও পালাতে পারবেনা হারামীর বাচ্চা। আমি তাকে বের করে ছাড়ব। তোমরা ওর বাড়ির মাল পত্র বের করে সামনে এক স্থানে গাদা করো। আমি আসছি। বঙ্গবীরের নির্দেশ পেয়ে শতাধীক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মিলিতভাবে জন সাধারণকে অনুরোধ করে সরিয়ে দিয়ে কলেজ গেইটএ যেখানে আজ যাত্রী ছাউনি আর সোনালী ব্যাংক সেই স্থানে খাট, পালং চেয়ার, টেবিল, ওয়াড্রপ, আলমারীসহ বিভিন্ন জাতের দামী সুদৃশ্য সোফা ও শোকেসসহ বিছানা পত্র সব এক স্থানে স্তুপ করা হয়। ১৯৭৩ইং সালে এম, পি, এনায়েতুল্লাহ খানএর মেয়ের ড্রেসিং টিবিলে অন্তত তখনকার মূল্যমানের ২ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রশাধনী সেন্ট পাওয়া যায় যা আমলা পুঁজিপতিদের ছেলে মেয়েদের প্রয়োজন হয়। সব কিছু ক্ষুব্ধ যুদ্ধহত মুক্তিযোদ্ধারা বের করে একত্রিত করলে বঙ্গবীর ফিরে এসে নির্দেশ দেন, জ্বালিয়ে দাও রাজাকারের বাচ্চার বাড়ির মালপত্র। ঠিকই তড়িৎ গতিতে বিহারী কলোনী থেকে ৫ সের কেরোসিন তৈল এনে ঢেলে দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় সহশ্রাধীক মানুষ দাঁড়িয়ে ঘটনা অবলোকন করেন। সেদিন শুধু নয়, আজও বঙ্গবীর ঘাতক এনায়েতুল্লাহ খানকে খুজে পায়নি। বরিশাল এর অধিবাসী তদানিন্তন এম, পি, এনায়েতুল্লাহ খান সেই যে আত্ম গোপন করেছে, আজও সেই দিন এর উপস্থিত থাকা কোন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার নজরে পড়েনি। কেননা আজও সেই দিনের ওলি আহাদের নির্মম মৃত্যু দেখা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে আছেন, কারো নজরে কোন দিন সেই নরঘাতক এনায়েতুল্লা খান পড়লে প্রতিসোধের আগুন ধপ করে জ্বলে যেতে বাধ্য এবং জ্বলবে। ১/১ নম্বর গজনবী রোড এর বাড়িটি পরিস্কার করে সেই বাড়িতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা ঢুকে পড়েন। সিদ্ধান্ত হয় প্যারালইসেস যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের এই বাড়িতে চিকিৎসাধীন রাখা হবে।'

## কিম্পুরুষ, বাঙ্কার ও শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার কাঁকন

লাখনৌ সেন্ট্রাল মিলিটারি কমান্ড হাসপাতালে আমাকে যেদিন ডিসচার্জ সার্টিফিকেট দেওয়া হলো...আমাকে ও মধুকে একইদিনে...চিকিৎসকরা বিশেষত আমার দিকে কেমন অপরাধী চোখে তাকিয়েছিলেন। আমার ও মধুর একইরকম বয়স বৈকি। কিন্তু আমি যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ছেলে। অল্প স্বল্প ইংরেজি বলতে পারি! কাজেই আমি চিরদিনরে মতো হুইল চেয়ার বন্দি হয়ে গেলে এই হাসপাতালের বাঙালি চিকিৎসক মেজর অমরেন্দ্র নাথ পাল থেকে শুরু করে মারাঠি চিকিৎসক ড. কুলকার্নি পর্যন্ত সবারই একটু খারাপ লাগে। তবু, চিকিৎসকের ক্লিশে পেশাগত দায়িত্বের অংশ হিসেবেই তারা মিথ্যেই আমার পিঠ চাপড়ান, মিথ্যেই উৎসাহ বাক্য বলেন। আর কোন আশা নেই। আর কোন ভরসা নেই। দুই পা'ই অ্যাম্পুটেড। কর্তিত। পাশের বেডে মধু খুইয়েছে শরীরের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে অংশের জন্য 'পুরুষ'কে পুরুষ বলা হয়। কলেজ ফার্স্ট ইয়ার ফাইনালের সময়...যুদ্ধের কয়েক মাস আগে...পিকনিকে আমাদের কলেজ থেকে কুমিল্লার ময়নামতী যাদুঘরে যাওয়া হয়েছিল। শোকেসে নানা কিছু দেখতে দেখতে একটি পোড়ামাটির ফলক দেখে চমকে গেছিলাম। ফলকটির সামনে ডিসপ্লে নোটিশে লেখা: 'কিম্পুরুষ।' অর্থ না বুঝে ফিসফিস করে বাংলার স্যার চন্দ্রমোহন রায়কে শুধাই, 'স্যার- কিম্পুরুষ অর্থ কি?'

স্যার বিব্রত হয়ে একটু কাশেন। তাঁর ফর্সা মুখ লাল হয়ে যায়। তারপর বলেন, 'কিম্পুরুষ অর্থ...ইয়ে তুমি রাস্তা-ঘাটে হিজড়া দ্যাখো নি? যারা না নারী, না পুরুষ?'

মধু কি কিম্পুরুষ হয়ে গেল? অবশ্য না। কিম্পুরুষরা নারী হতে চায়। শরীরে নারী বা পুরুষ কোনটিই না হয়ে তারা নারী হবার ইচ্ছা মনে ধারণ করে। আর আমরা পুরুষ হিসেবেই জন্মেছিলাম বৈকি। কিন্তু আমাদের অনেকেই অন্ধ বা খঞ্জ হবার পাশাপাশি পুরুষত্বও হারালো। নপুংসক কি? মোগল আমলের খোজা প্রহরীরা কি? আমরা যেমন কথায় কথায় 'খাসি করার কথা' বলি? অথচ, বেদ কোরান ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ সকলই অপৌরুষেয়। যেহেতু সেসব গ্রন্থ কোন পুরুষ থেকে উদ্ভুত নয়। নপুংসক! নপুংসক! আমাদের মাঝে কেউ কেউ আজ আর পুরুষ নেই! আর, আমার জীবনে কি হুইল চেয়ারই ধ্রুব সত্য হয়ে গেল? সারাজীবন আমাকে কে টানবে? কে দেখবে? অচেতন আমাকে আগরতলার টেন্ট বা তাঁবু হাসপাতাল থেকে হেলিকপ্টারে উড়িয়ে এই লাখনৌ হাসপাতালে আনার পরপর সেই রাতেই দু'টো পা-ই হাঁটু থেকে নিচ অবধি কেটে ফেলা হয়েছিল। নয়তো সেপটিক হয়ে গোটা শরীর এমনকি ব্রেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারত।

ফলাফল নিশ্চিত মৃত্যু। কেন মারে নি ভারতের ডাক্তাররা আমাদের? এই আঠারো/ উনিশ বছরের ছেলেরা আজন্ম হুইল চেয়ারে কাটাবে জেনে তাদের একটা ইঞ্জেকশনে পয়জন পুশ করে দেওয়াটাই কি ঢের বেশি মানবিক ছিল না? হুঁ...চিকিৎসকের দায়িত্ব! যত বস্তাপচা আর সেকেলে নৈতিকতার ধারণা! আমার জ্ঞান নাকি ফিরেছিল সপ্তাহ খানেকের মাথায়। সারা শরীর ব্যথা ও ব্যথানাশক ওষুধ, কড়া যত সিডাকটিভের ঘোরে আচ্ছন্ন। ক্যাথিটার, বেডপ্যান, স্যালাইন ব্যাগ, বমি ফেলার কিডনি ট্রে, সাদা পোশাকের সিস্টার, মাথার কাছে ওষুধের চার্ট, দফায় দফায় থার্মোমিটারে জ্বর পরীক্ষা...আর অদ্ভুতুড়ে অবিশ্বাস্য এক বোধ...আমার পা নেই...আমার দু'টো পায়ের একটাও নেই...প্রথম একটা মাস অবশ শরীর...কান্নাকাটি, চিৎকার, আর্তনাদ...মা বাবার নাম ডেকে ডেকে হাহাকার যত আরতি...বালিশ থেকে মাথা তুলতেও পড়ে যাওয়া দশা, বিছানাতেই শৌচ কার্য...তারপর ধীরে ধীরে অভিযোজন...হুইল চেয়ার চালাতে শেখা, বাথরুম কি ওয়ার্ডের করিডোর অবধি নিজের হুইল চেয়ার নিজেই চালিয়ে নেওয়া...আর অদ্ভুত ব্যাপার...খুব ক্ষিদে বেড়ে যাচ্ছিল...যুদ্ধের মাসগুলো প্রায়ই খেয়ে না খেয়ে থাকা, অঙ্গহানি, অস্ত্রোপচারের ধকল সেরে আমার উনিশ বছরের সদ্য জায়মান পুরুষ শরীরে তখন খুব ক্ষুধা। যা দেখি সবই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। অথচ, আমার ওজন বাড়া উচিত নয়। যেহেতু বাকি জীবনটা কাটাতে হবে হুইল চেয়ারে। যাকে কিনা এখন থেকে বাথরুমে যেতে হলেও অন্যের মুখের দিকে চাইতে হবে, তার ত' খাওয়া দাওয়াই বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। অথচ, বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ক্ষিদে বাড়ছে। হাসপাতালে আমার দ্বিতীয় মাসের শেষে একদিন নিজেই নিজেকে অবাক করে গুনগুন করে গান গেয়ে উঠলাম। সেই রাতে আমার নিজের ভেতরে পুরুষের উত্থানশক্তি আমি আবার অনুভব করলাম। বুঝলাম বীর্যে ভরে যাচ্ছে অন্তরপ্রদেশ। হে বিকলাঙ্গ বীর্যবান! এই অপচয়ের কি অর্থ? এরই ভেতর টাংগাইলের ছেলে ইস্কান্দার এলো যার ব্যাগে তিন-চারটা শার্ট-প্যান্টের সাথে ঝটিতি একটা 'রূপসী বাংলা' গুঁজে দিয়েছিল তারই দলের একজন। ততদিনে দিনভর হাসপাতাল বেডে বিষণ্নতা, ডিসচার্জ লেটার নিয়ে দেশে ফেরার জন্য অস্থির অপেক্ষা, সুস্থ হতে থাকা সহযোদ্ধাদের জন্য আনন্দ ও তাদের প্রতি ঈর্ষা...এই দুয়ের মাঝামাঝি এক ধরনের অনুভূতি...এসবের মাঝেই...দুপুরের ক্লান্ত ও টানা ঘুমের মাঝেই কখনো কখনো এক দুই কলি গান গেয়ে উঠছি। ড. কুলকার্নি যখন বিকেল বেলা আমার আর মধুর ডিসচার্জ লেটার সই করে দিয়ে গেলেন...মা বাবার কাছে ফিরে যেতে পারার আনন্দ আর বিষাদ...দু'টোই সমান ভাবে আঘাত করলো! প্রবল এক ঝড়ের মতো এই দুই অনুভূতিই আমার দিকে ধেয়ে এলো। মা বাবা জানেন যে আমি এখানে। আমাদের দলের কেউ আমার খবর আর ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়ে থাকবে।

ইতোমধ্যেই দু'দফা পোস্ট কার্ড এসেছে দেশ থেকে। আমিও পোস্ট কার্ডেই উত্তর পাঠিয়েছি। মা বাবা কাকে দেখবে? তাদের যে সুস্থ সবল ছেলে স্বাধীনতা আনতে গেছিল না কি এই হুইল চেয়ারে দুই হাঁটু থেকে নিচটা কেটে ফেলা এক অচেনা মানুষকে? আমাকে ঠিক মতো চিনতে পারবে ত'? আমার ভাইবোনেরা কি আমাকে আর ভালবাসবে আগের মতো? নাবিলা? মাথাটা ধরে আছে। পাশের বেডে ইস্কান্দার সুস্থ হয়ে উঠেছে। কোন সাপোর্ট ছাড়াই দুই পায়ে হাঁটছে। ওর দিকে তাকালে কেমন হিংসা লাগে। আমাদের দু'জনার মাঝখানের টেবিলে 'রূপসী বাংলা'টা আড়াআড়ি হয়ে পড়ে আছে। ইস্কান্দার বোধ হয় বাথরুমে গেছে। আমি কবিতার বইটা আবার হাতে তুলে নেই। ঘাস, শালিক, ভাঁট ফুল, বেত ফল, বৈঁচি, আকন্দ, ধুন্দুল, জোনাকি, কার্তিকের নবান্ন, ধানসিঁড়ি, লক্ষ্মীপেঁচা, বাসমতী চাল ধোওয়া হাত, সাদা শাঁখা পরা নারীর অজস্র অনুষঙ্গের এই বইটি এল,এম,জি, বা এস,এল,আরে-র চেয়ে কম বিপজ্জনক কোন আগ্নেয়াস্ত্র কি? রূপসী বাংলা পড়তে পড়তে বাংলার অনেক অনেক কিশোর-তরুণ ছাত্রই যুদ্ধে গেছে।

*'যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প'রে কোনো এক সুন্দরীর শব*
*চন্দন চিতায় চড়ে- আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা;*
*যেইখানে সবচেয়ে বেশি রূপ- সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্নতা;*
*যেখানে শুকায় পদ্ম- বহু দিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব;*
*যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার*
*কাঁকন বাজিত, আহা, কোনদিন বাজিবে কি আর!'*

'এইটা কি পড়লা? শেষের লাইন দুইটা আর একবার পড়ো ত'?' ফরিদপুরের অলিলুর বালিশ থেকে আধ-শোওয়া ঠেস দিয়ে উঠেছিল।

*'যেখানে শুকায় পদ্ম- বহু দিন বিশালাক্ষী যেখানে নীরব;*
*যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা মানিকমালার*
*কাঁকন বাজিত, আহা, কোনদিন বাজিবে কি আর!'*

আমি পুনরায় পড়ি।

'বড় সুন্দর কবিতা। তোমাদের মতো শিক্ষিত মানুষ না হইলেও, সব কিছু না বুঝলেও ভাল লাগলো। হাতের কাঁকন মানে মেয়েমানুষের হাতের চুড়ি ত'? হায়রে আমার শেষ অপারেশনটায় একটা বাঙ্কার থেকে আঠারোটা বাঙালি মেয়ে বাইর হইল। পাঞ্জাবিরা ধইরা নিয়া গিছিল। কারো শরীরে একটা সূতা নাই। জটা ধরা চুল যেন পাগলী। বাঙ্কারের ভেতর এখানে সেখানে লণ্ডভণ্ড আর দলা-মোচরা করা শাড়ি, ওড়না, পেটিকোট, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার আর চুড়ি...ভাঙ্গা ভাঙ্গা সব কাচের টুকরা, নাকফুল ...আল্লাগো!'

অলিলুর ডান হাতে চোখ চাপা দেয় যেন তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে সেই দৃশ্য।

'এটা কোন্ অপারেশনের কথা বলছো?'

'ভাইটেপাড়ায় আঠারো ডিসেম্বরের যুদ্ধ। ভাইটেপাড়ায় দু/দু'টা যুদ্ধ হইছে। একটা হইলো নভেম্বরের সতেরো তারিখে। খুলনা থেকে আর্মি আসছে ভাইটেপাড়ায়। ফুকরা বাজারে পজিশন নিছি দুপুর বারোটায়। হাজার দেড় দুই অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, পুলিশ সব অবস্থান নিছে ফুকরা বাজার আর ফুকরা চরে। মধুমতী নদীর সামনে থেকে দুইটা লঞ্চ বোঝাই পাঞ্জাবি সৈন্য যাবে। ভাইটেমারার ওদিকে আমাদের সেন্ট্রি ছিল। পাঞ্জাবিরা দুইটা ঘানি নৌকায় সাইলেন্সার ফিট করছে। আমাদের সেন্ট্রিরা বুঝতে পারল। ফুকরার চরে এসে আর্মি ও রাজাকার গুলি শুরু করে। আমরা বাজার ছেড়ে চরে চলে আসি। গোলাগুলি শুরু হয়। দু'টা নৌকা ডুবায় দেই। দু'পক্ষেই প্রচুর মানুষ মরলো। বেলা তিনটার দিকে আমার চোখের নিচে, পাছা আর উরুতে গুলি লাগলো। বাম দিকে ধানক্ষেতের উপর পড়ে গেলাম। ভারতের বনগ্রাম সাব-ডিভিশনের একটা হাসপাতালে ১২-১৫ দিন কাটাইলাম। ১৮ ডিসেম্বর ভাইটেপাড়ায় আরো একটা যুদ্ধ হইলো। আমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এই যুদ্ধে অংশ নিছি। এই যুদ্ধে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোরের অনেক যোদ্ধা অংশ নিছে। এবার যুদ্ধ শুরু হলো রাত ১২টার পর। পাঞ্জাবিদের বাঙ্কার ছিল পাশেই। খুলনার গোয়ালপাড়া পাওয়ার হাউস থেকে গরম পানি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িতে করে এনে ফায়ার সার্ভিসের ফিতা ও বয়া দিয়ে গরম পানি ভাইটেপাড়ায় মাটির নিচে খানেদের বাঙ্কারে আমরা ছুঁড়ে মারলাম। তখন বেলা বারোটা বাজে। বেলুচ আর পাঞ্জাবি মিলিয়ে ২৫ জন আর ১০০ জন রাজাকার এতে মারা গেল। এই যুদ্ধে মেজর মঞ্জুর, মেজর জলিল ও মেজর জয়নাল আবেদীন সবাই একসাথে ছিল। একটা কথা। পাঞ্জাবিদের বাঙ্কারে কিন্তু আমরা গুলি করতে পারি নাই। বরং ওরা দূরবীণ দিয়ে দেখে দেখে আমাদের তিন জনকে গুলি করে। ক্যাপ্টেন বাবুলের দাড়ির ভেতর দিয়ে গুলি লেগে মাথার বাইরে দিয়ে বের হয়। ইপিআরের জাফর আহমেদের বাঁ পায়ে গুলি লেগে বাঁ পায়ের নিচটা ভেঙে গেল। একজন ছিল কাজি আনোয়ার হোসেন। তার তলপেটে গুলি লাগে। বাঙ্কারের ভেতর গরম পানি পাইপ দিয়া ফেললে ওরা সব আধা ঘণ্টার ভেতর সারেণ্ডার করে বের হইলো। ওদের কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। বাঙ্কারে পাওয়া গুলি আমরা দখল করি। আর বাঙ্কারে পাওয়া চাল, ডাল, লবণ, মরিচ এলাকার লোকদের দিয়ে দিই। আঠারোটা বাঙালি মেয়েকেও বাঙ্কার থেকে উদ্ধার করলাম আমরা। মেয়েগুলার মুখ ও বুকের দিকে তাকানো যাইতেছিল না। শেয়াল কুকুরে কামড়াইলেও য্যানো অত দাগ হয় না...'

## বনবিভাগ ও 'হেলিকপ্টার' (ইউক্যালিপটাস) গাছ

সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি কলেজ গেইটের বিশ্রামাগারে আমাদের রুমের বিছানার সামনে শামসুল হক বসে। দিনাজপুরের ছেলে। আংশিক প্রতিবন্ধকতা আছে। মাঝে মাঝে ঢাকায় এই বিশ্রামাগারে আসে। দু-তিন দিন থাকে। আমাদের সবার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে, চেক-আপ করিয়ে, প্রেসক্রিপশনে পুরনো ওষুধ বাতিল কি নতুন ওষুধ লিখিয়ে নিয়ে চলে যায়।

'শামসুল যে? কখন এলে?'

'রাতের বাসে আসলাম। তোমাকে দুয়েকবার খুঁজে গেছি। এত বেলা করে ঘুমাও?'

'হুইল চেয়ারের রোগী। জেগে থাকা মানেই কষ্ট। সারাদিনে কাজ ত' তেমন কিছু নাই। 'বলো, সবার আগে আমার বিছানার সামনে কেন?'

'তুমি যে লেখাপড়া জানা মানুষ। তাই তোমাকে দরকার হলো।'

'কি বা লেখাপড়া করেছি? ইন্টারমিডিয়েটটাও পাশ করা হয় নি। তা' কি করতে পারি বলো?'

'তুমি ত' জানো আমার বাড়ি দিনাজপুরে। নবাবগঞ্জ থানার রঘুনাথপুর গ্রাম। এখন আমার বয়স ৫৮ বছর। ১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ২২/২৩-এর মতো। '৭১-এ হিলি-নওয়াবগঞ্জ বর্ডারে যুদ্ধ করছি। বড় অপারেশনের ভেতর বিরামপুর আর ডাঙ্গাপাড়ায় ছিলাম। বিরামপড়ার যুদ্ধে জিতবার পর আমরা হাতিয়ার জমা দিতে গেলাম। তখন হিলি বর্ডারে ভারতীয়দের কাছ থেকে তিন ট্রাক মাইন নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আর একটা দল দিনাজপুর ফিরছিল। সন্ধ্যাবেলায় সেই মাইন আমরা মাটিতে পুঁতছিলাম। এসময় একটা মাইন ফেটে আমি অচেতন। জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমি রংপুর হাসপাতালে। মনে হলো আমার গোর আজাব হচ্ছে। এক মাস চিকিৎসা চললো। ইঞ্জেকশন আর ইঞ্জেকশন। শুরুতে কথা বলতে পারতাম না। ২/৩ মাস পর ঢাকা মেডিকেল কলেজে ডান উরু থেকে মাইন বের করলো। মাইন মানে মাইনের splinter. সরকার থেকে এরপর আমাকে জার্মানী পাঠালো। এক বছর চিকিৎসা চললো। বাহাত্তর সালের শেষে দেশে ফিরলাম বিদেশ থেকে। মাসে ৭৫ টাকা করে ভাতা।'

'সে বুঝলাম, তোমার এখন সমস্যাটা কি?'

'হ্যাঁ- সেই কথাতেই আসছি। দ্যাখো, বঙ্গবন্ধু আমাকে সাড়ে চার বিঘা জমি দিছিলেন যা বন বিভাগের লোকরা বর্তমানে জোর করে দখলে নিচ্ছে। আমার জমির দাগ নম্বর হলো দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ থানায় হরিপুর বিট জমি (২৬০০/২৯ দাগ)। খাজনা দিচ্ছি নিয়মিত। আমার কাছে জমির রেকর্ডও আছে। কিন্তু, বন বিভাগ...এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকরা গত ৬/৭ বছর

ধরে একটু একটু করে আমার জমিটা দখলে নিচ্ছে। হেলিকপ্টার আর আকাশমণি গাছ লাগিয়ে বন বিভাগ এই জমিগুলো দখল করছে।'
'হেলিকপ্টার? হেলিকপ্টার গাছ কি?'
'হেলিকপ্টার গাছ মানে হেলিকপ্টার গাছ...ঐ যে বিদেশি গাছ।'
'তুমি ইউক্যালিপটাস গাছের কথা বলছো না ত'?'
'হবে হয়তো। ঐ হলো- একই কথা। আমার দখলে এখন আছে মোটে আড়াই বিঘা জমি। এই আড়াই বিঘা জমিতেই যা ফসল হয়। তার উপর আমার সম্বৎসর খোরাকি চলে। দুই ছেলে দুই মেয়ে। তা' দুই মেয়ের ত' বিয়ে দিলাম। ছেলে দু'টো মেট্রিক পাশ। আমার ডিসঅ্যাবিলিটি আছে ৫০%। আগে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ভাতা পেতাম। কিন্তু এখন ত' সাড়ে ছয় হাজার করে পাই। কিন্তু খাওয়া খরচ ওষুধের খরচ মিলায় মাসে প্রায় দশ হাজার টাকার মতো খরচ হয়ে যায়। তুমি আমাকে একটা দরখাস্ত লিখা দাও...বনবিভাগকে দেবো য্যানো তারা আমার জমি আর হেলিকপ্টার গাছ লাগায় দখল না করে!'

ছলছল চোখে শামসুল হক আমার হাত চেপে ধরে।

## তবুও দিনপঞ্জি

উনিশ হতে উনষাট। চল্লিশটা বছর হুইল চেয়ারে। এখনো বেঁচে আছি এটাই ভাবতে অবাক লাগে। প্রতিবন্ধীদের আয়ু স্বভাবতই অন্যদের চেয়ে অনেক কম হয়। এই বিশ্রামাগারেই বাহাত্তর থেকে আমরা যারা আছি, আমাদের অধিকাংশই চোখের সামনে মারা গেল। আমি আর কতদিন বাঁচব? এই দীর্ঘ দীর্ঘ দিন আর রাত কবে শেষ হবে? আজকাল দিনের একটি বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মধুর ডায়েরি পড়া, '১৯৭১ইং সালের মুক্তিযুদ্ধে জাতীসংঘে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিচার পতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিত্ব কারী দলের সদস্য ডা. জোয়ারদার অতীব আগ্রহিত হয়ে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সার্জিক্যাল খাটসহ বিছানা পত্র চেয়ে ১টি আবেদন রাখেন জাতি সংঘ প্রেরিত (Bone Specialist) হাড় বিশেষজ্ঞ ড. রোনাল্ড জেমস্ গাষ্ট এম, ডি, কে। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের অধীবাসী ড. রোনাল্ড জেমস গাষ্ট এম, ডি, পেষায় একজন ডাক্তার হলেও বাঙ্গালীর ধারণার ডাক্তারের বাহিরে ছিল তাঁর চরিত্র। ড. গাষ্ট ১জন উদার মনের মানুষ। তিনি ১৯৭২ইং সালে শুধু যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতে তিনি ঢাকায় আসেন। প্রতিটি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে দেখতেন নিজ সন্তানের মত। আদর করতেন ব্যাবহার করতেন বন্ধুর মত। অগাধ মনের অধিকারী ড. গাষ্ট সাথে করে সহধর্মিনী মেরী গাষ্টকেও বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। মেরী গাষ্টও মাতা, বোন, বান্ধবী, থেকে নার্স এর দায়িত্ব পালন করেছেন প্রতিটি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সাথে। আজও দেখা হলে তেমনি ব্যাবহারে কথপকথন হয় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও ড. গাষ্ট দম্পতির সাথে। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ইং সাল চিকিৎসা করে ড. গাষ্ট বাংলাদেশ থেকে

চলে যান। তবে বাংলাদেশ সরকারসহ তাঁর ছাত্র বিভিন্ন হাসপাতালের পরিচালকদের অনুরোধে প্রতি বছর ১ বার করে আসার অঙ্গিকার করেন এবং আসতেন। তিনি এখনও নিজ খরচে বাংলাদেশে এসে অনেক কঠিন অপারেশন করেন বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের খোজ খবর নেন এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বিশ্রামাগারে সস্ত্রিক গিয়ে দেখা করেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে। ক্যামেরা এনে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ছবি তোলেন। ২ ছেলে ও ২ মেয়ের জনক, জননী, ড. রোনাল্ড জেমস, গাষ্ট এম ডি, ও মেরী গাষ্ট যত দিন বাংলাদেশে থেকেছেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পিতা, পুত্রের সম্পর্কে থেকেছেন। ড. রোনাল্ড জেমস্ গাষ্ট এম,ডি ও মেরী গাষ্ট এর যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুচিকিৎসাসহ অকৃতিম ভালবাসার নিদর্শন সরুপ প্রতিরক্ষা সচিব ও প্রধান মন্ত্রীর মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা আসাদুজ্জামান এম.পি. সাহেবের উপস্থিতিতে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের এক অনারম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোদাচ্ছার হোসেন মধু বীর প্রতীক তাঁর বক্তৃতার মাধ্যম ড. গাষ্টকে চিকিৎসা পিতা হিসাবে অবিহিত করেন। ড. গাষ্টকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ঔষুধ পিতা বা চিকিৎসা পিতা হিসাবে অভিহিত করলে জনাব আসাদুজ্জামান এম, পি, ড. গার্ষ্টকে সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন। ড. রোনাল্ড জেমস, গাষ্ট ও মেরী গাষ্ট যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসক পিতা হিসাবে অকৃতিম গর্ব বোধ করেন। আর বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেয়ে বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ড. গার্ষ্ট বলেন, "যত দিন বাঁচব, আমার ছেলেদের দেখা সুনা করতে পারব। উদার মনের এক মানব ডা. জোয়ার্দার এর অনুরোধে ২৩০টি সার্জিক্যাল খাটও বিছানা পত্রসহ অনেক কিছুই প্রদান করেন। একটি সারজিক্যাল খাটএর মূল্য প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। ১/১ গজনবী রোড এর বাড়িটিতে ক্লিনিক সিষ্টেমে খাট বসিয়ে প্রথমে ১। মোদাচ্ছার হোসেন "মধু" ২। মো. নুরুল আমিন, ৩। মো. আনোয়ার হোসেন, ৪। মো. নজরুল ইসলাম, ৫। মো. জাফর আলী, ৬। শ্রী মানিক গোপাল দাস, ৭। শুকুর মাহমুদ, ৮। মো. নূরুজ্জামান, ৯। গোলাম মোস্তফা ১০। মোজ্জামেল হোসেন, ১১। মো. আঃ রাজ্জাক, ১২। মো. ইউসুফ আলী, ১৩। মোসলেম উদ্দীন, ১৪। মো. আঃ সোবহান, ১৫। শ্রী মানিক চন্দ্র ভৌমিক, ১৬। আ. হান্নানসহ মোট ১৮ জন গুরুতর আহত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে স্থান করে দেওয়া হল। পরে আরও ৬জন কয়েকদিন পরে। মোট ২৪ জন প্যারালাইসেস যুদ্ধাহত মুক্তি যোদ্ধাকে চিকিৎসাধীন সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া হলো। ১/৩ ও ১/৬ নং ২টি বাড়িতেও গাদাগাদি করে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। কারো হাত নেই। কারো পা নেই। কেও একে বারে অক্ষম। কারো মূখ পোড়া। এই সব যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান সুরু করে ১/১, ১/৩ ও ১/৬ নম্বর বাড়িতে। ডা. জোয়ার্দার তার একনিষ্ঠ উদ্যগে তখনকার রাষ্ট্রপতি বিচারপতি মরহুম আবু সাঈদ চৌধুরী ও ড. গাষ্ট এর সাথে আলোচনা করে, রেডক্রশ, ইউনিসেফ, আই, আর, সি ইউ, এন, ডি, পি, ও সেন্ট্রাল মেলোনাইট এর মত সাহায্য সংস্থা গুলিকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ভবিষ্যৎ এর জন্য তাদের পূনর্বাসন কল্পে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা ও বিভিন্ন প্রকার ভকেশনাল প্রশিক্ষণ দেবার আহব্বান জানান। সাহায্য সংস্থা গুলি সরাসরি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পূনর্বাসন কল্পে এগিয়ে আসার ঘোষণা ব্যক্ত করেন। ড. গাষ্ট এর দেওয়া খাট, বিছানা, পত্র ওষুধ পত্র

দেওয়ার পরে ১/১ বাড়ির সম্মুখে ও নং বাড়ির ১টি হল ঘরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁশ, বেত, টাইপ, ঘড়ি, বিডিও, টেপ, টি,ভি, থেকে সেলাইয়ের কাজ পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া শুরু করলেন। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারাও আন্তরিকভাবে সকল শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। সেই সময় সকলে ১টা আলোচনায় বসে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের আবাস স্থলটির একটি নাম রাখা হয়। তখন নাম করন করা হয় ইংরেজিতে D.F.F. V.R.T.C Disided Freedom Fighter Vocational Rehabilitation Traning Centre. যার বাংলা পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র।'

হ্যাঁ, ড. গার্স্ট। এই বিদেশি চিকিৎসক না থাকলে আজ আমাদের এই বিশ্রামাগারে মাথা গোঁজার জায়গাটুকুও থাকতো না।

## চন্দ্রঘোনা পেপার মিলস

আজ বিশ্রামাগারের টিভি রুমে চট্টগ্রামের বদিউল ভাইকে দেখে চমকে উঠলাম।
'বদি ভাই যে! কবে এলেন?'
'আসছি দিন তিনেকের জন্য। আমার ডিসঅ্যাবিলিটির পার্সেন্টেজ মনে হয় বাড়তেছে। শরীরটা আর যেন বয় না!'
মুচকি হাসলাম। বদিউল ভাই ত' তা-ও হাঁটাচলা করতে পারেন। আমাদের শরীর যে কিভাবে চলে?
'তাস খেলবেন বদি ভাই?'
'তাস? খেলা যায়!'

...ছক্কা, পাঞ্জা, ইস্কাপন, হরতন, চিরেতন। সাহেব বিবি গোলাম। রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' কি? রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র-সওদাগরপুত্র-কোটালপুত্র মিলে এমন এক অজানা দ্বীপে যায় যেখানে সবাই নিয়ম মেনে হাঁটে-বসে, ওঠ-বস করে, হাঁচি ফ্যালে কি হাই তোলে! সাহেব, গোলাম, টেক্কা আর বিবিদের দেশের শুদ্র দূরি আর তিরি পর্যন্ত এই চার বিদেশি যুবককে দেখে অবাক মেনে যায়। এই চার যুবক যে তাদের চেয়েও ম্লেচ্ছ। কিন্তু, গল্পের শেষটায় কি যেন ঘটলো? তাসের দেশের পুরুষ 'সাহেবে'র গলায় মালা দিতে গিয়ে ভুল করে ভিন দেশী রাজপুত্রের গলায় মালা পরালো সে দেশের মানবী 'বিবি।' সাহেব যেই না ভর্ৎসনা করলো 'বিবি, তোমার ভুল হইয়াছে!' ...অম্নি রাজপুত্র জানালো যে কিছুমাত্র ভুল হয় নি। তাসের দেশের 'তাসত্ব' ঘুচলো। এখন থেকে সবাই নিজের ইচ্ছায় সুখী অথবা দুঃখী।

'কই? তাস কোথায় তোমার?'

'এই ত'- দাঁড়ান- দিচ্ছি! আপনি যেন যুদ্ধে ঠিক কোন্ মাসে জয়েন করেছিলেন বদি ভাই?'

'যুদ্ধের সময় আমি ত' চন্দ্রঘোনা পেপার মিলসের মেকানিক্যাল ফিটার

ছিলাম। আমি জয়েন করলাম...সে যে লম্বা গল্প! খেলতে খেলতে কি সেই গল্প করা যাবে?'

'করেন না!'

'শুরু থেকেই বলি। শেখ মুজিবকে ২৫ শে মার্চ রাতে পাঞ্জাবিরা ধরে নিয়ে যাবার পর ২৭ তারিখ মাঝরাতে চন্দ্রঘোনা পেপার মিলসের বোম্বাইয়া অফিসার আবু সোলেমান বাপ্পুর কাছে চা নিয়া গেছে আমাদের ফ্যাক্টরির এক বাঙালি বাবুর্চি। তার নাম ছিল নূর হোসেন। বরিশাল বাড়ি ছিল তার। তো নূর হোসেন যখন তার কাছে চা নিয়া গেল, তখন বাপ্পু সাহেব ঠাট্টা করে তাকে বললো, 'তুমহারা বাপকো তো অ্যারেস্ট করনে বাদ হাম লোগ পাকিস্থান লে যাউঙ্গি। আভি তুম লোগ কিসিকো বাপ বুলায়েগা?' নূর হোসেন চা দিয়া আইসা এই কথা জানাইলে আমাদের মাথায় আগুন চাপলো। একে ত' ফ্যাক্টরির মালিক হইলো তখন দাউদ কর্পোরেশন। ওরা বোম্বাইয়া। উর্দূ ভাষায় কথা কয়। ভোর সকালে যখন আজান হইছে, আমরা বাপ্পুরে গিয়া কইলাম যে 'আপনি একা বিহারী আর আমরা ১৮০ জন বাঙালি। আমাদের খেপাইয়েন না!' বাপ্পু কি বুঝলো কে জানে...সে গামবুট পইরা, কাঁধে সিঙ্গল ব্যারেল বন্দুক নিয়া একা একাই একটা স্পিডবোটে উইঠা জাম্বুছড়া খাল বাইয়া ওরাছড়ি রিজার্ভ ফরেস্ট পর্যন্ত চললো। এদিকে আমরা বাঙালি লেবারের একটা দল যে পাহাড়ি রাস্তায় ওরাছড়ি পর্যন্ত হাঁইটা যাচ্ছি তারে লক্ষ্য কইরাই, সে কিন্তু তা' বোঝে নাই। ওরাছড়ি পৌঁছাইয়া সে হাতে বন্দুক নিয়া হাঁটতেছে, তখন আমরা তারে ঘেরাও করলাম। তারে পাহাড় ডিঙ্গায় ঢালুতে নিয়া গিয়া বললাম, 'কলমা পড়ো। তুমিও মুসলমান। আমিও মুসলমান। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।' ড্রাইভার নূর মহম্মদ তারে গুলি করলো। পরের দিন আমরা চট্টগ্রাম শহরের দিকে গেলাম। ৩০শে মার্চ কাপ্তাই জেটি ঘাটে গিয়া ক্যাপ্টেন হারুনের সাথে দেখা করলাম। ৩১শে মার্চ কালুর ঘাট ব্রিজে গেলে কর্নেল অলির সাথে দেখা হইলো। এপ্রিলের ৪ আর ৫ তারিখে পাকিস্তানি জাহাজ 'বাবর' চট্টগ্রাম পোর্টে শেলিং করায় শহরে ঢোকা সম্ভব হইলো না। তখন পিছন দিকের রাস্তা ধইরা বান্দরবান, রুমা পার হইয়া 'দুমদুইম্যা' ই,পি,আর, ক্যাম্পে পৌঁছালাম। ১৫ তারিখ ভারতের জারাইছড়ি ক্যাম্পে পৌঁছালাম। বি,এস,এফ,-এর মেজর বাজুবল সিং আমাদের শরণার্থী ক্যাম্পে যেতে বললো। আমরা মোট ২৩ জন শ্রমিক ছিলাম। এদের ভেতর নয় জন ক্যাম্পে গেল। কিন্তু, আমরা আমাদের সাথের পোঁটলার চাদর দিয়া তাঁবু টাঙ্গাইয়া বললাম, 'আমরা যুদ্ধ করতে চাই। আমাদের ট্রেনিং দাও।' পরদিন আমাদের আসাম-ভারত দেমাকাগিরি বর্ডারের কাছে পাঠাইলো। সেখানে ছিলেন মেজর তারা সিং। আমরা দেমাকাগিরি টাউনের কলেজ মাঠেও তাঁবু খাড়া করলাম। ২৪ শে এপ্রিল মেজর তারা সিংয়ের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সেসময় আরো ছিলেন ই.পি.আর. সুবেদার আব্দুর রশিদ, হাবিলদার আব্দুল

খালেক, হাবিলদার বদিউল ও আরো এগারো জন গুর্খা সিপাহী। মেজর তারা সিং বললেন, 'তোমরা কি সত্যি সত্যি তোমাদের দেশ রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করো?' বললাম, 'পারবো। আমাদের ট্রেনিং দেন।' ২৮শে এপ্রিল থেকে আমাদের ট্রেনিং দেওয়া শুরু হইলো। ২৩ শে জুলাই পর্যন্ত চললো। ২৪ শে জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটির উপর ঠেকারমুখ নামক জায়গায় প্রথম অপারেশন করি। মেজর তারা সিং আমাদের সাথে ছিলেন। তিন জন পাকিস্তানি গুলিবিদ্ধ হয়। আমরা ১৪ জন শ্রমিক, ই,পি,আরে,-র ৬ জন সিপাহী, কমান্ডার আব্দুর রশিদ ও মেজর তারা সিং ও আরো ৬জন ইন্ডিয়ান সোলজার ছিল। সবাই মিলা আমরা ছিলাম প্রায় আঠাইশ জন। আজো পরিষ্কার মনে আছে ১১:৪০-এ প্রথম আমরা ফায়ারিং শুরু করি। তিন জন পাকিস্তানি সৈন্য মারা গেছিল এই অপারেশনে আর ছয় জন সারেণ্ডার করে। ঠেকারমুখের কাছে দুইটা রোড ব্লক কইরা আমরা অপারেশনটা শুরু করছিলাম। এই সময় কিছু চাকমা ছেলে আমাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। সঞ্জীব কুমার চাকমা নামে এক ছেলে পরের এক যুদ্ধে আমাদের পক্ষে ফাইট দিতে গিয়া মারা যায়।

...কত কথা মনে আসে। কত আর বলব? মোট পাঁচটা অপারেশনে অংশ নিছি। এই যুদ্ধের সময় ভারত মিত্রপক্ষ হইলেও একবার কিন্তু ইন্ডিয়ানদের সাথে আমাদের কিছু কথা কাটাকাটিও হয়।'

'তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং তো। কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো?'

'আমাদের কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আব্দুর রশিদকে মেজর তারা সিং ৩রা আগস্ট বলে কাণ্ডাই বাঁধ খুলে দিতে, যাতে চট্টগ্রামে পাকিস্তানিদের পালানোর কোন পথ না থাকে। কিন্তু, আব্দুর রশিদ বললেন চট্টগ্রামে তো বাঙালিরাও থাকে। কাণ্ডাই বাঁধের মুখ খুলে দিলে তারা তো মারা পড়বে। কথা কাটাকাটির পর আব্দুর রশিদকে আসাম-ভারত দেমাকাগিরি হতে এক কি.মি. দূরে এক ক্যাম্পে ১৭ ঘন্টা আটক করা হয়। ১৭ ঘণ্টা পর আর তাকে ছাড়া হয়। যাই হউক, ৬ই আগস্ট আমরা আবার অপারেশনে নামি। বান্দরবানের রুমায় ৬ই আগস্ট দিবাগত রাতে রুমা থানায় ৬জন পাঞ্জাবিসহ মোট ১৩/১৪ জন পুলিশ স্টাফকে হারিয়ে থানা দখল করি। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লড়াই হইছিল। ৮ই আগস্ট বান্দরবান থানা দখল করি। ১৫০ জন পাঞ্জাবি সৈন্যের পাল্টা আমরা ছিলাম মোট ১১৬ জন। আমাদের সাথে ছিল ৬ জন পুলিশ। মুজিব বাহিনীর সদস্যরা গ্রেনেড ক্যারি করছিল। আমাদের ১৪ জন শ্রমিকের কাছে ছিল এস,এল,আর,। আড়াই ঘণ্টা ফাইটিং দিয়ে যুদ্ধে জিতি। আট তারিখ রাত তিনটায় ফায়ারিং শুরু করি আর যুদ্ধ শেষ হয় সকাল সাড়ে পাঁচটায়। এবার ৭ই ডিসেম্বরের যুদ্ধের কথা বলি। এই যুদ্ধের কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। কাণ্ডাই বাঁধের ওপারে...ইন্ডিয়ান বর্ডারে থাকতেই খবর আসলো যে পাঞ্জাবি সৈন্য

কাপ্তাই বাঁধ থেকে চিটাগাং পোর্টের জেটি পর্যন্ত কন্ট্রোল করছে। আমরা তখন বর্ডার ক্রস শুরু করলাম। ইন্ডিয়ান বর্ডারের যে রুট থেকে আমরা ঢুকতাম, সেই রুটে প্রায় দুই দিন দুই রাত হেঁটে তবে পৌঁছানো যাইত। সাথে ক্ষুধা মিটানোর ট্যাবলেট থাকতো। তবে, এইবার আমরা এক পাহাড়ি পরিবারে খাবার চাইলাম। তারা বাঁশ কাইটা হাঁড়ি-পাতিল বানাইয়া আমাদের ডাল, আলু ভর্তা আর ভাত খেতে দিলো। পাঁচ তারিখ দিবাগত রাতে পাঞ্জাবি সৈন্যদের মুখোমুখি পজিশন নিয়ে আমরা ফায়ারিং শুরু করি। কাপ্তাই প্রজেক্টের ২০০ গজ দূর থেকে ফায়ারিং শুরু হয়। পাঁচ তারিখ সকাল ১১:৩০ টার দিকে ডিউটিতে থাকা ১৯জন পাঞ্জাবি সৈন্য ধরা পড়ে। তাদের কাপ্তাই হাসপাতালে রাখা হয়। পাঁচ থেকে সাত তারিখ আমরা কাপ্তাই বাজারের একটা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করছি। সাত তারিখ আর্মি ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাঞ্জাবিরা গুলি শুরু করলো। সকাল ৮:৩০ হতে ১২:৪৫ পর্যন্ত যুদ্ধ চললো। ঐ যুদ্ধেই সঞ্জীব কুমার চাকমা ও নূর হোসেন মারা যায়। আমার হাতে-পায়ে গুলি লাগে। আমাকে সাথে সাথে কাপ্তাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে ১৯শে ডিসেম্বর আমাকে চিটাগাং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে ১৯৭২-এর ৯ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছিলাম। চিটাগাং কলেজের মাঠে সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকের কাছে হাতিয়ার জমা দিলাম। ১৯ শে জুন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমাকে শতকরা ৪৫ ভাগ আহত হিসেবে ঘোষণা করা হলো। সরকার আমাকে এসময় রাশিয়া পাঠায়। মস্কোতে তিন মাস ২২ দিন থাকি। ১৯৭৫-এ দ্বিতীয় বারের মতো আমাকে রাশিয়া পাঠানো হয়। কম্যুনিস্ট দেশ। সাইবেরিয়ায় ১৪ দিন, লেনিনগ্রাদে ছয় দিন থাকি। '৭৫-এর ১৯ শে মে আমার পায়ে বোন গ্রাফটিং অপারেশন হয়। দেশে ফিরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলে যাই। ১৯৮৪ সালে অনেক বয়সে আমি বিয়া করি। এই ত' সারা জীবনের গল্প তুমি শুনলা। মামলা শেষ। চলো আবার তাস খেলি!'

... ৩টা বাড়িতে গাদাগাদি করে অনেক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বসবাস করে ভকেশনাল শিক্ষা নেন। ১/১ ও ১/৩ বাড়ির মধ্যখানে ১/২ নম্বর বাড়িটি একজন ভদ্র মহিলার। ভদ্র মহিলার ঢাকায় আর ৪/৫টা বাড়ি আছে। একদিন ভদ্র মহিলা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কষ্ট দেখে সাথে সাথে লীডার জাফর চাচাকে বললেন, "এই বাড়িটা আমার। তোমরা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা এখন থেকে এখানেও বসবাস করবে। যতদিন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের ছেলে মেয়েরা বসবাস করবেন, এই বাড়িতে আমার কোন দাবি নাই বা থাকিবে না। সেই দিন থেকে ১/১, ১/২, ১/৩, ও ১/৬... এই ৪টি বাড়ি নিয়ে যাত্রা শুরু করে আজকের যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বিশ্রামাগার। ভদ্র মহিলা বাড়িটি দান করে দেবার পর থেকেই ঈদ, পরব সবেরোতসহ বিভিন্ন দিনে ভাল খাবার পাক করে এনে হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ হাতে খাওয়াতেন। মায়ের মত আদর করতেন, কোরবানী ঈদে গরু ছাগল নিয়ে আসতেন। দিয়ে যেতেন বিশ্রামাগারে। ভদ্র

মহিলাকে আমরা এত শ্রদ্ধা করতাম যে, কোন দিন ভদ্র মহিলার নামটি জিজ্ঞেস করতেও সৎসাহস হয়নি। তবে শুনেছিলাম, তাঁর স্বামীর নাম জনাব আবুল কাশেম, গত ৭/৮ বৎসর মহিলাকে দেখিনা ঠিকই। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত স্মরণ হয় মনে হয় মাতৃপরায়ণা মাকে। জানিনা সেই মা আজ আর ইহজগতে আছেন কিনা। তবে তিনি ইহজগতে থাকলে আমাদের মাঝে, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে না এসে পারতেন না। তাঁকে দির্ঘ্য দিন না দেখলেও পরম করুনাময়ের কাছে প্রার্থনা সেই মহীয়সী মা যেখানেই থাকুকনা কেন। যে ভাবেই থাকুন না কেন। ভাল থাকুন। সুস্থ্য থাকুন। ১/১, ১/৩ ও ১/৬ বাড়িতে গাদা গাদি করে ২২৯ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বসবাস করতেন ও বিভিন্ন প্রকার ভকেশনাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকেন। ৪টি পরিত্যাক্ত বাড়ির ১/৬ নম্বর বাড়িটি শুধু দোতলা। হঠাৎ করে বাঙ্গালীর জীবনে নেমে আসে ১টি কালো রাত। জাতীর পিতাকে ১৫ই আগষ্ট ৭৫ হত্যা করা হলে ১৭ই আগষ্ট ৭৫ সাহায্য সংস্থাগুলি আমাদের (যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের) শিক্ষা ও সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগীতা বন্ধ করে চলে যান। সাহায্য সংস্থা গুলির মধ্যে আই, আর. সি, র পরিচালক (Director) মি. মার্শাল বিয়ার হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা মেসা করতেন। ইংরেজ ভদ্র লোক মি. মার্শাল বিয়ার, যাবার আগে হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছিলেন তোমাদের দেশের মানুষ ভাল না। সেখ মুজিবের মত লোককে হত্যা করতে পারে। এরা মানুষ না অমানুষ পশু। মি. মার্শাল বিয়ার অত্যাধিক মিশুক ব্যাক্তিত্ব ছিলেন। অল্প অল্প বাংলা তিনি বলতে পারতেন। এখনও মি. মার্শাল বিয়ার মাঝে মাঝে মুক্তিযোদ্ধা বিশ্রামাগারে আসেন। কিন্তু যাঁদের সাথে তাঁর দোস্তি ছিল বেশী সেই সব হুইলধারীদের মধ্যে সকলেই ইহজগত ত্যাগ করেছেন। মাত্র ১জন জিবিত আছেন। তাঁর সাথে গল্প করে কিছু সময় বিশ্রামাগারে কাটিয়ে ফিরে যান মি. মার্শাল বিয়ার তাঁর ভালবাসা এখনও আবেগজড়িত ভাবে তাঁকে বিশ্রামাগারে আসতে বাধ্য করে। সাহায্য সংস্থা গুলি চলে গেলে বঙ্গবন্ধুর গঠিত মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট হইতে মাসিক ৭৫.০০ পচাত্তর টাকা সম্মানী ভাতা ছাড়া আর কোন সুযোগ সুবিধা ছিলনা। ৭৩ ইং থেকে ৭৫ এর মাঝা মাঝি পর্যন্ত রেডক্রশ, আই, আর সি, ইউনিসেফ, ইউ, এন, ডি, পি, সেন্ট্রাল মেলোনাইট সাহায্য সংস্থা গুলি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কাপড় দুধসহ অনেক প্রকারে সাহায্য সহযোগিতা করতেন।'

**হিমঘরে সনদপত্র সকল**

ফাইলের পর ফাইল। এই বিশ্রামাগারে আমরা কিছু পূর্ণ বিকলাঙ্গ মানুষ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে কত কাগজই না জমিয়ে রেখেছি। আজকাল কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমরা যুদ্ধ করেছি! তাই জমিয়ে রাখি সব কাগজ। ভারতীয় হাসপাতালে চিকিৎসা হয়েছে এই মর্মে কাগজ, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের স্বাক্ষরিত কাগজ, সাব-সেক্টর কমান্ডার, কোম্পানি কমান্ডার... সবার চিঠি! অনেকের চিঠি আজকাল ঝাপসা হয়ে এসেছে। সর্বাধিনায়কের স্বাক্ষরিত চিঠিটি একবার দেখি? নাহ্, লেমিনেটিং করেও অক্ষরগুলো সব ঝাপসা

হয়ে এসেছে। লাখনৌ হাসপাতালে আমার নামে ইস্যু করা ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটাও এখন আর পড়াই যায় নাঃ

T R
DISCHARGE SLIP
COMMAND HOSPITAL CO. LUCKNOW
Serial No. A& D Book 19/11/71
1. Name: Shahriar Haque
2. Date of Admission: 07-11-71
3. Date of Discharge: 03-03-1972
4. International Code no.: 830 1291.

5. Diagnosis: .....

...ডায়াগোনেসিসের জায়গার লেখা বা ডায়াগোনেসিসকারী চিকিৎসকের নাম আর পড়া যায় না। এক একটা সরকার আসে বা সরকার বদলায় আর নতুন করে 'প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা' যাচাই শুরু হয়। শালা, দেশের জন্য আজ চল্লিশটা বছর আমি হুইল চেয়ারে! তবু এই আমাকেও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে 'প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা'র সার্টিফিকেট নিতে হয়েছেঃ

**বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ**
**রাজশাহী জেলা কমান্ডের কার্যালয়**
**তারিখঃ ৮/১০/৭৭**
মাননীয়
**চেয়ারম্যান,**
**কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল,**
***বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ***

**বিষয়ঃ প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা যাচাই**

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানাধীন বোলপুর গ্রামের আজগর হকের পুত্র শাহরিয়ার হক একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা।

তিনি সাত (৭) নং সেক্টরের অধীনে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এবং ঐ যুদ্ধে পঙ্গু হয়েছেন।

**৮/১০/৭৭**
---
**ইউনিট কমান্ডার**
**রাজশাহী ইউনিট কমান্ডার**

...গতকাল এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। ফরিদপুরের নিজামুদ্দিন তার মুক্তিযুদ্ধের সব সার্টিফিকেটসহ জরুরি সব কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলেছে। একদিক থেকে ঠিকই করেছে ও। কি অর্থ হয় এসব জমিয়ে? আমারগুলোও ছিঁড়ে ফেলব নাকি?

## চেনা চেনা লাগে তবু অচেনা

আমাদের এই বিশ্রামাগারে শুধুই যে মারফতি গান শোনা যায় তা' নয়। গত বছর ছয়েক হয় যশোরের শারশা থানার শামসুর মণ্ডল আর তার বউও এখানে একটা ঘরে থাকা শুরু করেছে। যুদ্ধের আগে ওদের একটাই ছেলে হয়েছিল। যুদ্ধের পর মণ্ডলের আর পিতৃত্ব শক্তি থাকে নি। যুদ্ধের আগেই জন্ম নেওয়া ছেলেটা বড় হয়ে বিয়ে করেছে। ছেলে আর বেটার বউয়ের ঘরে এত অসুস্থ রোগী রাখতে কষ্ট হয়। এখন এই বিশ্রামাগারের একটা ঘরেই স্বামী স্ত্রী থাকে। মণ্ডলের বউ লতা বেগম আজো ভারি হাসি-খুশি আর আমুদে প্রকৃতির। ১৯৮২ সালে ওর বউকে প্রথম দেখেছিলাম স্বামীর হুইল চেয়ার টানতে টানতে এই বিশ্রামাগারের অফিস কক্ষের সামনে এসে দাঁড়াতে। তারপর আবার দেশের বাড়ি চলে গেল ওরা। গত ছয় বছর হয় এখানেই থাকছে দু'জন। এই বিশ্রামাগার ক্যাম্পাসেই একটু তফাতে এক কামরার একটা ঘরে স্টোভ জ্বালিয়ে মণ্ডলের বউ মাঝে মাঝে শুঁটকি আর কাঁঠাল বিচির তরকারি রেঁধে রন্টুর হাত দিয়ে আমাদের সবাইকে পাঠায়। আজো সে কখনো লাল আবার কখনো হলুদ ছাপার শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। সত্যি বলতে শামসুর মণ্ডলের ছেলে আর ছেলের বউও একবার এসেছিল। আমাদের বিশ্রামাগারের আহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন জরিপে মণ্ডলের বউকে তার পুত্রবধূর চেয়ে হাজার গুনে তরুণীতর ও সুন্দরীতর মনে হয়েছে। 'তারুণ্য' বা 'সৌন্দর্য' বোধ করি কোন অপার্থিব আশীর্বাদ হয়ে থাকবে। নয়তো মণ্ডলের ছেলের বউ কেন পৃথুলা, কালো, গম্ভীর ও বোরখা পরা এক বুড়ি ধাঁচের মহিলা হবে? আর মণ্ডলের বউ কেন প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পৌরুষ হারানো, পঙ্গু স্বামীর হুইল চেয়ার টেনে, মল-মূত্র সাফ করেও সুন্দরী আর তন্বীটি থাকবে? কেন তার মাথার চুল একটিও পাকবে না, সোনালি চামড়ায় কুঞ্চন ধরবে না, শরীরটা বিরাশি সালের তুলনায় একটু ভারি হলেও বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি মনে হবে না, হতে চাইবে না? মুখে চপল নবোঢ়ার রাঙা, সলাজ হাসি লেগে থাকবে? কথার স্বরে আজো আহ্লাদিপনা লেগে থাকবে? দোষের ভেতর শুধু পান খেয়ে দাঁতগুলো একটু কালচে খয়েরি। অদ্ভুত ব্যাপার! প্রেম করে বিয়ে করেছিল যশোর জেলার শারশা থানার রাঘবপুর গ্রামের হাড্ডুডু কাবাডি চ্যাম্পিয়ন শামসুর আর সে গাঁয়েরই সেরা সুন্দরী লতা বেগম। সেই প্রেম কি তাদের আজো আছে? আছে বোধ করি। নয়তো মণ্ডলের ঘর থেকে প্রায়ই সকাল গড়িয়ে দুপুরের দিকে যেতে থাকলে ট্রানজিস্টারে পুরনো দিনের সিনেমার গান বাজবে কেন?

*'চেনা চেনা লাগে তবু অচেনা,*
*ভালবাস যদি কাছে এসো না!'*

...দূর থেকে গানটা শুনে আমিও গুনগুন করি। আমার স্ত্রী রুমা কি আমার অচেনাই রয়ে গেল? মনে পড়ছে বিয়ের দিন বাসরঘরে গোলাপি বর্ণ বেনারসি শাড়িতে ওকে দেখে আমার কান্না পেয়েছিল। হোক দু'বার বিয়ে হওয়া আর দু'বার তালাক পাওয়া মেয়ে। এমন রাজেন্দ্রানীর মতো যাকে লাগছে বিয়ের শাড়িতে, তাকে এই অক্ষম আর অচল পুরুষটি কি দিতে পারে? ও আশ্চর্য শান্ত থাকলো। অবশ্য ঢিলে পাজামায় হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অবধি আমার অঙ্গহীনতা একটু হলেও সহনীয় করে তোলা হয়েছিল। মাথায় পাগড়ি, অফ হোয়াইট শেরোয়ানি, গলায় ফুলের মালায় আমি এক চিরতরের লেংড়া বর!

'এই বিয়েতে তোমার নিশ্চয়ই মত ছিল না?'

'না, কেন?'

ও সরাসরি আমার দিকে তাকিয়েছিল। সে দৃষ্টিকে কোন জড়তা বা লজ্জা ছিল না। অনভিজ্ঞ মেয়ে ত' নয়। দু/দু'টো বিয়ে ও বিয়ে বিচ্ছেদের পোড় খাওয়া শক্ত ও শান্ত চাহনি।

'এই যে আমার দু'টো পা নেই। তোমার...তোমার ঘেন্না হচ্ছে না আমাকে? ঘেন্নায় আমাকে ঠেলে ফেলে দিতে, গলা টিপে খুন করতে ইচ্ছা হচ্ছে না?'

রুমা আমার হাত ধরেছিল। করুণায়...প্রেমে নয়...নিতান্ত করুণায়...আমি বুঝি....আমি আলাদা করতে পারি...স্রেফ করুণায় কুঁচকে উঠেছিল ওর চোখের কোণ, 'আপনি যুদ্ধ করে পা হারিয়েছেন! আমারো ত' কোন অ্যাক্সিডেন্টে এমন হতে পারতো! এছাড়া...'

'এছাড়াও?'

'আগে ত' দু/দু'টো পাঅলা মানুষের সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল। কই, তারা ত' আমাকে দেখল না? আমার বাবা গরিব বলে... যৌতুক দিতে পারে নি বলে... আমাকে কয়েক মাস ধরে ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে তাদের ত' একটুও লাগল না? আমি একা...গরিব বাবার দু/দু'বার তালাক পাওয়া মেয়ে...আমাকে আর বিয়ে করা যায় না, কিন্তু ব্যবহার করা যায়! কত মানুষের চোখে কত লোভ, কত ইশারা, কত ইঙ্গিত! তার চেয়ে এই আমার ভাল...'

ফুঁপিয়ে উঠেছিল রুমা। আর তখন ওকে আলিঙ্গন করতে, চুম্বনে চুম্বনে ওর কান্না মুছে নিতে আমার এতটুকু লজ্জা, গ্লানি বা অপরাধবোধ হয় নি। কিন্তু...যখন ধীরে ধীরে নগ্ন হলাম আমি...তার আগে রুমাও শক্ত হাতে আমার গলা বেষ্টন করেছিল...একটা অনবদ্য প্রেমের রাত্রি...সমবেদনা ও ভালবাসায় উজ্জ্বল...মাত্রই রচিত হতে যাচ্ছিল...কিন্তু নগ্ন আমাকে, কর্তিত দুই পা আমাকে দেখে ওর ভেতরের সমবেদনা আর পরস্পরের শোক ভাগাভাগি করে নেবার

দীপ্রতা যেন একটা ধাক্কা খেল...আর তখন অনাদি কালের তুষার প্রপাত...মন্দগতি হিমবাহের ধারা আমার উপর আছড়ে পড়েছিল...তবু, সামনেই উন্মোচিত নারী মাংসের উষ্ণতা সেই হিমবাহে পুরোপুরি ঢাকা পড়ে না! এতটুকু আগুন...বিষণ্ন গ্লেসিয়ার পতন থেকে নিজেকে রক্ষার আশায়...এতটুকু আগুনের লোভে রুমাকে তার বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও আমি আঁকড়ে ধরেছিলাম।

তারপর।

ফুলশয্যার দু'দিন পরেই আমি যখন ঢাকায় বিশ্রামাগারে ফিরে আসতে চাই, বড় আপা চিরতরে প্রবাসী হবার আগের প্রস্তুতি নিতে ও আমার বিয়ে দিতে আমাদের মফস্বল শহরের পৈতৃক বাড়িতেই তখন...আমার দিকে অবাক ও আহত চোখে চেয়েছিলেন। হয়তো তার মনে এই প্রবোধ ছিল যে দু'বার তালাক পাওয়া মেয়েকে সংসার দিলে সে দুই পা কর্তিত স্বামীর দেখভাল করতে দ্বিধা করবে না। কি পুরুষতান্ত্রিক প্রত্যাশা! আমি সুস্থ অবস্থায় চারবার কি আটবার বিয়ে করে ডিভোর্স হলেও কি আমার জন্য কেউ এমন মেয়ে দেখত? না, রুমা হয়তো দেখবেও আমাকে! বড় শান্ত মেয়ে সে। জীবনের নানা অপ্রাপ্তি ও আঘাত তাকে মৌন করেছে। কিন্তু, আমি কোন্ মুখে আমার এই নিরেট পাথরের মতো ভারি জীবনটা তার এম্নিতেই ক্লান্ত ও ন্যুব্জ ঘাড়ে চাপিয়ে দিই? বাসরঘরের শয্যাতেই... প্রথম রাতেই কি আমরা বুঝে যাই নি আমাদের সম্পর্কটা কি হবে? কতটুকু হবে? সেবার ফিরে এসে তিন/চার মাস পরেই আমি আমার স্ত্রীর প্রথম বারের মতো সন্তান সম্ভাবনার খবর চিঠিতে পাই। তবু, আমার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না। ছোট বোনের ক্রমাগত চিঠির তাড়ায় আমাদের প্রথম সন্তান ইশতিয়াক ওরফে রাজার জন্মের পর যাই। পরবর্তী পাঁচ বছরে আরো দু'টো সন্তান। ইকরাম ওরফে রাজু। শেষ সন্তান ইশিতা। কিন্তু ছেলে-মেয়েরাও কি একটু দূরে দূরেই থাকে? বেশ মনে আছে, রাজা যেবার স্কুলে প্রথম ফার্স্ট হয়...আমি সেই খবর চিঠিতে পেয়ে...শরীরটা তখন একটু খারাপ ছিল...বাড়ি যাই। রাজার স্কুলের আরো কিছু বন্ধুও এসেছিল। আমার খুব ইচ্ছা করছিল রাজা আর ওর বন্ধুদের সাথে গল্প করি। কিন্তু হুইল চেয়ারে বসা আমাকে দেখে...আমি স্পষ্টতই বুঝলাম...সাত বছরের রাজা তার বন্ধুদের সামনে লজ্জা পাচ্ছে। তার বাবা যে অন্যদের বাবার মতো নয়...তার বাবা যে পঙ্গু ও হুইল চেয়ার বন্দি...তখন রাজার বয়স মাত্র সাত...সাত বছরের শিশুর উপর রাগ বা অভিমান অর্থহীন...বড় হয়ে এই রাজাকেই পাশের ঘর থেকে নিজ কাণে বন্ধুদের আড্ডায় বাবার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও চূড়ান্ত ক্ষতি নিয়ে গর্ব করতে শুনেছি...তবু, পঙ্গু বাবাকে নিয়ে সাত বছরের রাজার মুখে জমা হওয়া লজ্জা ও গ্লানি বোধের ছবিটা আজো চোখের সামনে থেকে তাড়াতে পারি না...আমি কি খুব বেশি অভিমানী? বড় বেশি স্পর্শকাতর? রাজার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার চলছে। রাজু রাজশাহী মেডিকেলে থার্ড ইয়ার। আর ইশিতাও রাজশাহী

ভার্সিটিতেই ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলো। বড় হবার পর ওরা এখন মাঝে মাঝেই বলে, 'আব্বু- তুমি আর ঢাকা যেও না। আগে ত' আম্মু একা ছিল। আমরা সবাই ছোট ছোট। এখন আমরাও বড় হয়েছি। আমরা সবাই মিলে তোমাকে দেখবো। তুমি আমাদের সাথে থাকো। প্লিজ, আব্বু-'

মাঝে মাঝে খুব লোভ হয়। লোভ হয় ওদের সাথে থেকে যাই। নিজের বউ, নিজের ছেলে মেয়ে। ঝকঝকে বিছানা-পত্র, থালা-গ্লাস, ঘরের রান্না। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নিজের কাছেই কেমন সঙ্কুচিত লাগে! মুহূর্তের উচ্ছ্বাসে বাবাকে একসাথে থাকতে বলার অনুরোধ আর দিনের পর দিন, বছরের পর বছর হুইল চেয়ার বন্দি বাবার প্রতি মুহূর্তের তত্ত্বাবধানের ক্লান্তি এক নয়। এক হতেও পারে না। এছাড়া আমার তিন সন্তানই যৌবনে পা রেখেছে। কিছুদিন পরই যার যার যৌথ জীবন শুরু হয়ে যাবে। তখন সুস্থ সবল বাবা মা'র সঙ্গও বিরক্তিকর মনে হতে পারে। আর ত' আমি! রুমা...যৌবনের শুরুতেই দু/দু'টো বিয়ে বিচ্ছেদের ধাক্কা আর তৃতীয় বিয়েতে দুই পা কর্তিত স্বামীর আলিঙ্গন ও বিকলাঙ্গ স্বামীকে তিনটি সন্তান প্রদান করতে গিয়ে রুমা বোধ করি 'পুরুষ' শব্দটি নিয়েই ক্লান্ত। নয়তো তার অন্তত আর একটি প্রেমিক হতে পারতো। সেটাই ছিল স্বাভাবিক। আমার প্রতি বিশ্বস্ততা হয়তো রুমার পুরুষ প্রজাতির প্রতি ক্লান্তি ও ঘৃণা জনিত বিশ্বস্ততা। সে বোধ করি এখন তার শ্বশুর বাড়ি থেকে তাদের বিকলাঙ্গ ছেলেকে বিয়ে করার পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত বাড়িটিকে ঝকঝক করে গুছিয়ে, সেখানে তার তিন সন্তানকে নিয়ে নিজস্ব গুহায় একাকী থাকতে চায়। মা নেকড়ের মরণপণ বাৎসল্যে। জীবনে তার আর কোন চাহিদা নেই। আর যে বিকলাঙ্গ মানুষটির সাথে বিয়ে নামক সামাজিক চুক্তির মারফত সে দু'বার তালাকপ্রাপ্তা হয়েও, গরিবের ঘরের স্বল্প শিক্ষিত মেয়ে হয়েও ফিরে ঘর সংসার আর সন্তান পেয়েছে...নয়তো তার অরক্ষিত যৌবন তাকে রাস্তায় নামাতো হয়তো... সেই মানুষটি বছরে এক/দু'বার বাড়ি এলে কৃতজ্ঞতা হিসেবে ভাল-মন্দ রেঁধে খাওয়ানো আর তিনদিনে একবার শুতে আসা...যা বিকলাঙ্গ মানুষটি প্রায়ই ফিরিয়ে দেয়...এইটুকু প্রতিদান সে কিন্তু দেয়ই দেয়। আমি আর কি চাইতে পারি? আমার মতো চলৎশক্তিহীন মানুষের তিনটি সুশ্রী, সুস্থ ও শিক্ষিত সন্তান...আর কি চাওয়ার আছে? ম্যারেজ ইজ আ সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট। নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়ে ছোট বোনের মেয়ে নাতাশার সাথে যেন বরং আমি একটু বেশি সহজ হতে পারি। এর কারণও আছে। নাতাশা আমাকে আমার কৈশোর ও তারুণ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। কৈশোরের আমার মতোই বইয়ের পোকা হয়েছে সে।

*'তুমি আমি যেন নদী,*
*বয়ে চলা নিরবধি-*
*অজানা দেশে...*

*যেখানে এসে,*
*আঁধারে মেশে জ্যোৎস্না,*
*ভালবাসো যদি*
*কাছে এসো না!'*

...হলুদ আঁচল উড়িয়ে, মাথা ঘষে ভেজা চুল রোদে শুকাতে শুকাতে এককালের হাডুডু কাবাডি চ্যাম্পিয়ন শামসুর মণ্ডলের স্ত্রী লতা বেগম নবোঢ়ার সলাজ হাসিতে, ঢলো ঢলো আহ্লাদি মুখে স্বামীর হুইল চেয়ারটি টেনে বিশ্রামাগারের ফটকের সামনে রোদে পায়চারি করছে। হঠাৎই চমকে উঠি আমি। গড, দে আর নট ইন ম্যারেজ। দে আর স্টিল ইন লাভ। দে আর স্টিল ইন দেয়ার ফার্স্ট সাইট। অ্যান্ড দিস লাভ ইজ সাব্লাইম। 'নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে।' আমার ভাগ্নি নাতাশা যেমন রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়। ...এ-ও কি সম্ভব? এতখানি প্রেম? কোন সামাজিক চুক্তি নয়। দেনা-পাওনা নয়। শুধুই ভালবাসা। টিল ডেথ ডিপার্ট আস। এজন্যই কি যশোরের শারশা উপজেলার রাঘবপুর গ্রামের লতা বেগমের দেহে ও মুখে কোনদিন বয়সের কুঞ্চন ধরা পড়বে না? যে কুঞ্চন এড়াতে হলিউড বলিউডের নায়িকারা জিমে যায়, ডায়েট চার্ট করে, ব্রেস্ট ট্রান্সপ্লান্ট, ফেস লিফট, কসমেটিক সার্জারি করে? শামসুর মণ্ডল কি আজো তার চোখে এলাকার কাবাডি চ্যাম্পিয়ন? আর হুইল চেয়ারে বসা শামসুর মণ্ডলের হাতে দ্যাখো ট্রানজিস্টারে গান বাজছে। তার মুখে একুশ বছরের ছেলের সরল হাসি। লতা বেগমের মুখে ষোঢ়শীর ঢলো ঢলো আহ্লাদিপনা যা যুদ্ধ, স্বামীর অঙ্গহানি বা পৌরুষ হারানো...কোন কিছুতেই হারায় নি। সহসাই আমার চোখের সামনে ওরা দু'জন যেন সত্যই দু'টো নদী হয়ে গেল। গম্ভীর মুখো গ্লেসিয়ার নয়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের রৌদ্রমুখী দুই নদী। কি নাম রাখবো ওদের? মেঘনা আর ব্রহ্মপুত্র? দূর, ছাই! কি সব ভাবছি? মধুর ডায়েরিটা পড়ে শেষ করা দরকার।

'৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট থেকে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত দেশে কোন সরকার ছিল, কি ছিলনা, তা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কেও অবগতই ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্সের প্রধান মেজর জিয়াউর রহমান বীর উত্তম পরবর্তীতে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্র পরিচালনার ফাঁকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের খোজ খবরও নিতেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠন করে তার আয় থেকে আমাদের রাষ্টীয় সম্মানী ভাতা ও ভরণ পোষণ প্রদান এর নির্দেশ দেন। জিয়াউর রহমান একদিকে মন্ত্রী পরিষদে প্রখ্যাত ও কুখ্যাত রাজাকারদের মন্ত্রিত্ব দিয়ে যেমন পূনর্বাসিত করলেন ঠিক তদরুপভাবে হঠাৎ করে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারদের পূর্ণবাসনের কিছু পদক্ষেপ হাতে নিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর সুত্র ধরে গঠন করলেন একটি কমিটি। জাতীয় সংসদে ঘোষণা দিয়ে বিল উত্থাপন করেন যে, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হবে রাষ্টীয়

কোষাগার থেকে। মিরপুর চিড়িয়াখানার সম্মুখে ১৩ একর জমি কল্যাণ ট্রাষ্টকে লীজ প্রদান করেন এবং সেখানে শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান সমস্যা দুরিকরনে নির্মাণ করা হবে মুক্তিযোদ্ধা পল্লি। যার নাম করনও করেছিলেন তিনি (জিয়াউর রহমান) মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নাম করন করে ১টা ৪তলা ভবনও নির্মিত হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে ভবনে ১৬জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও ৫জন শহীদ পরিবারকে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাসের ব্যাবস্থা করে দেন। মোট ২১টি পরিবার "কমপ্লেক্স ভবন এর ভিতরে স্থান লাভ করে। কমপ্লেক্স ভবন এর পিছনে ১টি সুদৃশ্য পুকুরও নির্মাণ করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের নিজ হাতে গঠন করা কমপ্লেক্স ফান্ড কমিটির মাধ্যমে সকল প্রকার পূণর্বাসন কায্যক্রম বাস্তবায়িত সুরু হয়। কমপ্লেক্স ফান্ড কমিটি অনেক পরে গঠন করা হয়। জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হয়ে মাঝে মধ্যেই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বিশ্রামাগারে আসতেন এই নামটিও তাঁরই দেওয়া একদিনের ঘটনা: জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি কল্যাণ ট্রাষ্টের কর্মকর্তাকে অবহিত করে দেখতে এসেছেন বিশ্রামাগারে অবস্থান রত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের। রাষ্ট্রপতি হওয়ার ৭/৮ দিন পরের ঘটনা। বিশ্রামাগারে এসে সাইন বোর্ড দেখে বলে উঠেন, যেহেতু এরা সকলে মুক্তিযুদ্ধে আহত হুইল চেয়ারে বসে ক্র্যাচে ভর দিয়ে হেঁটেও কাজ কর্ম করতে পারে। সেহেতু সাইনবোর্ডটি চেঞ্জ (Change) করতে হবে। পূর্বে সাইন বোর্ড এ লিখা ছিল "পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ও পূণর্বাসন কেন্দ্র"। জিয়াউর রহমান ১/১ নম্বর বাড়িতে বসে বলতে লাগলেন, যেহেতু এরা কেও দুর্ঘটনায় পঙ্গু নয়। সকলে মুক্তিযুদ্ধ করে পঙ্গু; সেহেতু সাইন বোডটি চেঞ্জ করা দরকার। আর সাইন বোডে লিখতে হবে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা রোগ মুক্তি বিশ্রামাগার। অবশ্য যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কারো রোগের মুক্তি ঘটেনি। তবুও সেইদিন থেকে সাইন বোর্ড এর লিখা পরিবর্তন হয়ে "যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা রোগ মুক্তি বিশ্রামাগার," লিখা হয় এবং অদ্যবধি সেই নামেই চলছে মোহাম্মদ পুরে মুক্তিযোদ্ধা বিশ্রামাগার।

...১৯৭৯ সাল এর জুন মাস। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এসেছেন মুক্তিযোদ্ধা বিশ্রামাগার এর ১/১ গজনবী রোড এর বাড়িতে। এই বাড়িটিতে সুধু হুইল চেয়ারে চলাচলকারী অক্ষম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান করতেন। বরাবরই জিয়াউর রহমানের সাথে তার বিশ্বস্ত এ, ডি. সি, বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল মাহফুজুর রহমান (মাহফুজ ভাই) থাকতেন সেই দিন সাথে তাঁর প্রধান মন্ত্রী, বাংলাদেশের প্রখ্যাত রাজাকার শাহ আজিজুর রহমান, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী আতাউদ্দীন খান। পল্লিউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপটেন আ: হালিম চৌধুরী। এ্যনি ও পুনর্বাসন প্রতি মন্ত্রী কর্নেল জাফর ইমাম বীর বিক্রম। যুব ও ক্রীড়া প্রতি মন্ত্রী আবুল কাশেম হুইল চেয়ারে চলাচল কারী ৮/১০ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হুইল চেয়ারে বসা। পার্শ্বের বাড়ি থেকে অন্যান্য যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারাও ৫/১০ জন এসেছেন। হঠাৎ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলে উঠলেন, 'অ্যাটেনশন প্লিজ!' সকলের দৃষ্টি ও কান চলে যায় রাষ্ট্রপতির দিকে রাষ্ট্র পতি জিয়াউর রহমান বলেন, আপনারা মন দিয়ে সুনুন আমি শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা দুরিকরনের লক্ষ্যে ১টি কমিটি গঠন করব। কমিটিতে পুঁজির দরকার। পুঁজি সংগ্রহের সার্থে আমি আপনাদের কাছে প্রথমে

চাঁদা দাবী করিতেছি। আপনারা কে কত চাঁদা দিবেন বলেন, আমিও সেদিন হুইল চেয়ারে চলাচলকারী ১জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সেদিন আমিও উপস্থিত ছিলাম ১/১ গজনবী রোড এর বাড়িটিতে দেখলাম সেখানে ২/৩জন মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী থাকা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী রাজাকার শাহ আজিজুর রহমান সর্ব প্রথম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ফান্ড কমিটিতে ১মাসের বেতন দান করেন। রাজনীতির হারজিত সুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম। ক্ষোভে, দুঃখে তখন শুধু পার্শ্বে বসা বন্ধু নুরুল আমিনের হাতটা চেপে ধরে শরীরের রাগ মেটালাম। রাজাকার এর ১ম সাহায্যে গঠিত হল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ফান্ড কমিটি উপস্থিত সকল মন্ত্রী ১মাসের করে বেতন কমপ্লেক্স ফান্ড কমিটিতে দান করলেন। মিরপুরে ৪ তলা ১টি ভবন নির্মাণ ছাড়া কমপ্লেক্স ফান্ড কমিটি শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কোন সাফল্যজনক পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কমপ্লেক্স ফান্ড কমিটিতে সাহায্যের টাকা রক্ষিত ছিল ৮৬ কোটি টাকা। কোন কালো হাতের ছায়ায় পড়ে আর কোন উন্নয়ন হয়নি। এখনও ১৩ একর জমিতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারেরা বস্তি তৈরী করে বসবাস করছে। রাজনীতি আর বক্তৃতায় মুক্তিযোদ্ধা পল্লির ঘোষণা থাকলেও বাস্তবে তা রুপ দিচ্ছেনা। তবে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারেরা নিরাশ নয়।

**মোদ্দাস্বার হোসেন "মধু" বীরপ্রতীক।'**

...মধুর ডায়েরি এখানেই শেষ। নাতাশা ঠিকই বলেছে। যতই মধুর লেখার অকৃত্রিম স্বাদটা আমি সাধারণ পাঠককে দিতে চাই না কেন, কিছু বানান সংস্কার বা বাক্য রীতি সংশোধনের দরকার আছে। নাতাশা একটা লিটল ম্যাগাজিনে জড়িত। ওদের কিছু বন্ধুরা মিলে একটি প্রকাশনা সংস্থাও খুলেছে। মধুর এই ডায়েরি তারা ছাপবে। ভূমিকা লিখতে হবে আমাকে। কি নাম দেব এই বইয়ের? মাত্র উনিশ বছর বয়সে দুই পায়ের সাথে সারাজীবনের মতো পুরুষত্ব হারিয়ে মধুর পরিতাপের অন্ত ছিলো না। নারী সঙ্গ হয় নি আর তার। সন্তানের পিতা হতে পারে নি। তার এলোমেলো কাঁচা অক্ষরের হাতের লেখায় আর ভুল বানানের এই ডায়েরি আদ্যোপান্ত সংশোধন করে (নাতাশা কিছুটা অবশ্য ইতোমধ্যেই করেছে) প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু, কি নাম দেব এই ডায়েরির? নাতাশা ইদানীং বাড়ি গেলেই আমাকে খুব তাড়া দেয়। মধুর ডায়েরি ছাড়াও বিশ্রামাগারের জীবিত গুটিকয় সহযোদ্ধার রণাঙ্গনের গল্পগুলোও আমাকে গুছিয়ে লিখতে বলে। কিন্তু কিভাবে গুছিয়ে লিখব চাঁপাইনবাবগঞ্জের মধু, ফরিদপুরের নিজামুদ্দিন কি সিলেটের রহমানের কথা যারা যুদ্ধে তাদের পৌরুষ পর্যন্ত হারিয়েছে? যুদ্ধ যাদের আর পুরুষ রাখে নি? এমনকি এই যে আমি...দু'টো পা হারিয়েও সমাজে পুরুষ জন্মের সুবাদে বউ আর তিনটে বাচ্চাও পেয়েছি, আমিও কি সম্পূর্ণ পুরুষের জীবন পুরোপুরি যাপন করতে পেরেছি? মধু, নিজামুদ্দিন বা রহমান...যুদ্ধে যারা দু পা আর শিশ্ন হারিয়েছে...আমরা এক পাল বিকলাঙ্গ

মানুষ...পা নেই, হাত নেই, চোখ নেই, শিশ্ন নেই...আমরা কেউ কি পুরুষের জীবন পেয়েছি আদৌ? নাতাশাদের লিটল ম্যাগাজিন ও প্রকাশনা সংস্থার জন্য মধুর সংশোধিত ডায়েরি আর যোদ্ধাদের যুদ্ধকাহিনীর বয়ানের শিরোনাম ঠিক কি দেব বুঝতে পারছি না।

*রচনা : ২০০০-২০১০*

# লেওয়াটানা নাচ-গাহেন আরো হাতি খেদালা উপকথা [১]

সে প্রায় দেড়শো দুইশো বছর আগের কথা। সুসঙ-এ মাত্রই বাইশ পূজা শেষ হয়েছে। কামাখ্যা, লক্ষ্মী, বারদেও, হয়গ্রিব...কত না দেবতার পূজা এই বাইশ পূজা বা বাস্তুপূজায়! গারো পাহাড়ের প্রতিটা গ্রামের একদম শেষ মাথায় বাইশহালি-তে এই বাইশপূজার আয়োজন! মাঘের প্রথম শীতের দিনগুলোয় বাইশহালি পরিষ্কার করে প্রত্যেক দেব-দেবীর জন্য ছোট ছোট ঘর তৈরি করে, প্রতি ঘরে এক একজন ঠাকুরের নামে আলাদা বেদি তৈরি হয়। কামাখ্যা, লক্ষ্মী, বারদেও, হয়গ্রিব সহ কত না দেবতার পূজা! ফল, আতপচাল, দুধ, মিঠাই, বেলপাতা আর তুলসীপাতার ভোগ দান! নংটাং বা পুরোহিত পড়ায় মন্ত্র। এমন এক পূজায় প্রথম মনা হাজংয়ের সাথে সুখমণি হাজংয়ের প্রথম পরিচয় হয়েছিল। প্রথম দেখায় মনা হাজং ফিরে ফিরে শুধু দেখেছিল সুখমণি হাজংকে। কিন্তু কিছু বলে নি। আর সুখমণি? সে শুধু লজ্জায় মাথা নিচু করে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কোন মতে মনে মনে মন্ত্র পড়েই বাড়ির দিকে দিয়েছে দে ছুট!

তা' বাইশ পূজা ত' হয় মাঘ মাসে। মাঘ শেষে ফাল্গুন পার না হয়ে চৈত্র আসতেই মনা হাজংকে তার মা বললো, '*বাবা- আমলা ঘরা একবারে পুরান হইছে। চল্, আমলা দাহা উপুর বায়ি উঠিয়া, ঝাপ-জঙ্গল কাইত্তা ঘর বানাই* (বাবা- আমাদের এই বাড়িটা কেমন পুরণো হয়ে আসছে! চল্, টিলার আর একটু উপরে উঠে ঝোপ-ঝাড় কেটে, আর একটা নতুন ভিটা তৈরি করি)!'

মনা তার বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। মা'র কথায় সাথে সাথে সায় দিয়ে বললো সে, '*ঠিক আছে মা। কালকা ভিয়ানি ময় দাহা উপুর বায়ি উঠিয়া, ঝাপ-জঙ্গল কাইত্তা ঘর বানাবো। কিন্তু, যতদিন নয়া ঘর বাইন্না শেষ না হয়,*

[১] লতাটানা গান ও হাতি খেদার উপকথা

*ততদিনো তয় নামবায়পিন থাইক্যা বিশ্রাম নাও। তগে কষ্ট কইর‍্যা উপুর বায়ি উঠিয়া যাবা না লাগিবো* (ঠিক আছে মা। কাল সকালেই আমি একটু উপরে উঠে গিয়ে ঝোপ-জঙ্গল কেটে, তোমার জন্য একটা নতুন বাড়ি বানাবো। কিন্তু, যতক্ষণ নতুন বাড়ি বানানো শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ তুমি কিন্তু নিচেই বসে বিশ্রাম নেবে। তোমাকে কষ্ট করে উপরে উঠে আসতে হবে না) !'

মনার মা যতই বলে যে সে-ও সকালবেলা ছেলের সাথে টিলার উপরে উঠে লতা-পাতা কেটে, নতুন ভিটা টানতে সাহায্য করবে, ততই ছেলে বলে কি, *না- মা, তু লা বয়স হুছে। এছাড়া সংসারে আমরা দুইজন মানহুইয়ো লেপা-পোঁছা, কাপড় ধোওয়া...কত কষ্ট তোলা! ময় একলাই পাব* (না- মা, বয়স হয়েছে তোমার। এছাড়া সংসারে আমরা মাত্র দু'জন মানুষ হলেও রান্না-বান্না, কাপড় কাচা, ঘর লেপা-পোঁছা...কত কষ্ট তোমার! আমি একাই পারব)।'

মা তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ' *ঠিকই কইছে তয়। এত কয় তগে তবু ক্যানে তয় বিয়া না করে? কোন তিমত ছাওয়াকে তোলা পছন্দ না হয়। এতগুলা কণে দেখালে, তবু তোলা কাউকে পছন্দ না হয়! আশীর্ব্বাদ করে কালকো ভিয়ানি লেওয়া কাইত্ত ভিটা বানানোর সময় কাকোক তয় পাইয়া যাবি তোলা পছন্দ মতো। তোলা বাপরাও এংকাই...সেটা প্রায় তিরিশ বছরলা আগেলা কথা...আমলা গ্রাম বায় আহিয়া মসুন, লেওয়া কাইত্তা জমিন বানাবা সময় মলগোন ওলা পরিচয় হয়। ময় আইগ্যা যাইয়া সাহায্য করিছে। উদাসতরি পরিচয়। তারপরে বিয়ে। তারপরে তোলা জন্ম। সেটা কত দিনলা কথা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তয়োবা উংকোই একজনকে যেন পায়* (তা' ঠিকই বলেছিস! এত বলি, তবু ত' বিয়ে করছিস না! কোন মেয়েকে তোর পছন্দও হচ্ছে না। এতগুলো কণে দেখালাম, তবু কাউকে তোর পছন্দ হলো না। আশীর্ব্বাদ করি, কাল সকালে টিলার উপরে লতা কেটে জমি বানানোর সময় কাউকে পেয়ে যাবি তোর যোগ্য সাথি। তোর বাবাও ঠিক এমন ভাবেই...সে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা...আমাদের গ্রামে এসে লতা কেটে জমি বানানোর সময় আমার সাথে তার পরিচয় হয়। খাঁ খাঁ রোদের ভেতর মানুষটাকে একা একা ঝোপ-ঝাড় কাটতে দেখে আমার খুব মায়া হয়। আমি এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করতে গেলাম। সেই থেকে পরিচয়। তারপর ত' বিয়ে। তুই এলি। সে কত দিনের কথা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি কি তুইও অমন কাউকে পেয়ে যাস)!'

মা'র এ কথায় লজ্জা পেয়ে মনে মনে মনা হাজং ভাবে কি একটা মেয়েকে ত' গত মাঘ মাসে তার পছন্দই হয়েছে। সেই যে একবার মাঘ মাসে বাইশ পূজার সময় দেখা হলো, আর ত' চোখের দেখাটি দেখতে পেল না। মেয়েটা কি টিলার

উপরেই থাকে? হে ভগবান, কাল সকালে যদি মনা টিলার উপর গিয়ে জঙ্গল কেটে, ভিটা-বাড়ি বানানোর সময় সেই মেয়েটার দেখা পেত! আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ভগবান কিন্তু মনার কথা শুনলেন। পরদিন সাত সকালে উঠে, হাত মুখ ধুয়ে আর দু'টো খেয়েই মস্ত এক দা হাতে টিলার উপরে উঠে মনা কাজ শুরু করলো। দেখতে দেখতে মাথার উপরে সূর্য জ্বলে উঠতে লাগলো। বড় দায়ের এক/এক কোপে ঝোপ-জঙ্গল আর লতা-পাতা সাফ করতে করতে মনার শরীর থেকে দরদর করে ঘাম বইতে লাগলো। কাজ করতে করতে সে এমনকি একসময় ভুলেও গেল মেয়েটির কথা। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কাজ করার পর মনার ইচ্ছে হলো একটু জল খায়। হাতের দা আর নিড়ানী ফেলে, সাথে আনা মাটির সরায় যেই না সে একটু জলের চুমুক দিয়েছে, অম্নি হঠাৎই দ্যাখে কি সামনে কার যেন ছায়া। চারপাশ দুপুরের রোদে নিঝুম হয়ে আছে...এম্নি সময় চোখের সামনে একটি ছায়া দেখে অবাক হয়ে যেই না চোখ তুলে চেয়েছে মনা হাজং, দ্যাখে কি সেই বাইশ পূজার সময় দেখা অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি! পরনে তার বানায় বোনা চমৎকার পাথিন। টঙ্কের সময় বৃটিশ সৈন্যরা হাজং খুঁজতে গারো পাহাড়ের প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চলার সময় সেই যে হাজংরা তাদের ঘরের তাঁত বোনার কল 'বানা' সব ভেঙে ফেলেছিল যাতে করে বানা দেখেই বৃটিশ সৈন্য বুঝতে না পারে যে এই বাড়িটা একজন হাজংয়ের, তারপর থেকে ত' হাজংদের ঘরে আর কোন 'বানা' নেই। তারপর থেকে হাজং মেয়েরা আর তাঁত বুনতে পারে না। কিন্তু, এটা যে সময়ের গল্প তখনো হাজংদের ঘরে ঘরে বানা আছে। আর, সেই 'বানা'য় হাজং মেয়েরা নিজেরাই নানা রঙের পাথিন বুনে পরে। যাহোক, মনা দেখতে পেল যে বাইশ পূজায় দেখা সেই সুন্দরী মেয়েটি লালের উপর কমলা, কালো, হলুদ আর সবুজ রঙের বিচিত্র রেখা টানা একটি পাথিন পরে দাঁড়িয়ে। তার কাণে এক জোড়া ধিরি, পায়ে পাওপাতা (নূপুর) ও গলায় শিকিসারা। কোলে তার একটি কলস। টিলা বেয়ে নিচে হ্রদে জল আনতে যাবে বোধ করি। কিন্তু, জল আনতে যাবার আগেই রোদে দরদর করে ঘামতে থাকা মনার কষ্ট দেখে এগিয়ে এলো সুখমণি। লতা টানতে দেখা যে কোন হাজং ছেলেকে দেখে যেমন যুগে যুগে এগিয়ে এসেছে হাজং মেয়েরা। কাজেই, সুখমণিও লতাপাতা কাটতে সাহায্য করা শুরু করলো মনাকে। সুখমণির এই এগিয়ে আসায় মনা হাজংয়ের কষ্ট যেন চোখের নিমিষে চলে গেল। সে তখন মনের আনন্দে প্রথমে গুনগুন করে আর পরে জোর গলাতেই গাওয়া শুরু করলো,

*আয় বুইনি সকলে লেওয়াটানা রং এ*
*লেওয়া টানিয়ী-যাং নিজ ঘরে*

(এসো বোন সকলে লতাটানের রঙ্গে
লতা টেনে যাই নিজ ঘরে)।
উত্তরে সুহাসিনী গাইলো,

*লেওয়ারা টানিলে মাইধীতে ছিরিলে*
*দাদা মুগে জোড়া লাগ্‌গিয়ী দি*

(লতাখানি টানিলে মধ্যিখানে ছিঁড়িলে
দাদা আমায় জোড়া দিয়ে যাও)।

সুখমণির গান গাওয়ার সাথে সাথেই যেন টিলার উপর দিয়ে বয়ে গেল ঝিরিঝিরি বাতাস। স্ফূর্তি পেয়ে মনা উত্তরে গেয়ে উঠল,

*টকলে বারি ঘোপাতে, টকলে ফল পাকিছে*
*আয় বুইনি টকলে খাবা যাং।*

(টকলে বাগানের ঝোপেতে টকলে ফল পেকেছে
এসো টকলে খেতে যাই)।

সুশ্রী মনার মুখে এই গান শুনে সুখমণির মনপ্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। তবু, একটু দাম দেখাল সে। তাই উত্তরে গাইলো,

*টকলে বারি না যায় ময়, টকলে ফল না খায় ময়*
*টকলে খালে মুখ কালা হয়।*

(টকলে বাগানে যাব না, টকলে ফল খাব না
টকলে খেলে মুখ কালা হয়)।

এই বলে না সুখমণি দেমাক দেখিয়ে কোমরে কলসী নিয়ে হনহনিয়ে টিলার নিচে হ্রদের পাড়ে পৌঁছতেই দ্যাখে হ্রদের পাড়ে একটি প্রকাণ্ড লম্বা গাছে মৌমাছি বাসা বেঁধেছে। আর এদিকে সুখমণির দেখা দেখি মনা হাজংও ততক্ষণে নিচে নেমেছে। সুখমণি মনাকে দেখে এবার আবার তার মেয়েলি অহঙ্কার ভুলে গাইলো,

*লিংলিঙী গাছনি মৌও বাহা লাগিছে*
*দাদা মুগে পারি দি ময় খাং।*

(লম্বা উঁচু গাছেতে মৌমাছি বাসা বেঁধেছে
দাদা আমায় পেড়ে দাও আমি খাই)।
কিন্তু গাছটা এক বগ্গা শুধুই অনন্তে উঠেছে। এটার কোন ঝুরি বা লতা নেই দেখে মনা পাল্টা গাইলো,

*ধুরিবাগে ডালা নাই, উঠিবাকো লেওয়া নাই*
*লেওয়া ছাড়া পারিবাগে না পায়।*

(ধরিবার ডাল নেই উঠিবার লতা নেই
লতা ছাড়া উঠা সম্ভব নয়)।

...তা' এভাবেই গানে গানে আর কাজে কাজে ক'দিন কেটে গেল মনা আর সুখমণি। এক সপ্তাহ ধরে খাটুনির পর নতুন বাসা তৈরি হয়ে গেলে মা'কে নিয়ে টিলার উপরে নতুন বাসায় থাকতে উঠে এলো মনা হাজং। রাতের বেলায় ছেলের জন্য নতুন চালের ভাত রেঁধে মা বলছে, '*ইহরা ময় তোলা কোন কথা না শুনিব, মনা! এত কষ্ট কইর‍্যা ময় যখন নয়া ঘর বানালে, ইবার ময় এগরা সুন্দর দেখে বউ আনিব। তয় খালি ক তোলা কোন পছন্দ আছে কিনা* (এবার আমি তোর কোন কথা শুনব না, মনা! এত কষ্ট করে নতুন ঘর যখন তুললিই, তখন সেখানে আমি একটা লাল টুকটুক নতুন বউ আনবই। তুই শুধু বল্ যে তোর কোন পছন্দ আছে কিনা)?'
একটু লজ্জা পেয়ে পরে মায়ের কাছে স্বীকার করেই ফেললো মনা, ' *দাহা উপুর বায় লেওয়া টানিবা বোলা এগরা তিমত ছাওয়াকে মোলা পছন্দ হুছে। যদি বিয়া করবার লাগে তাহলে ওকেই করিব* (টিলার উপরে লতা টানার সময় একটা মেয়েকে ভাল লেগেছে মা। যদি বিয়ে করতেই হয়, তবে ওকেই করবো)।'
শুনে মনার মা ত' খুবই খুশি হলো। বললো, '*তোলা যাকে পছন্দ হবো অকেই আমি বউ বানিয়া আনিব। কালকই ময় উমাবাই প্রস্তাব নিয়ে যাব। শুধু এগরাই কষ্ট যে তোলা বাবা আজ বাঁইচ্যা নাই* (তোর যাকে পছন্দ হবে, আমি তাকেই ঘরের বউ করে আনবো। কালই আমি সেই মেয়ের বাড়ি প্রস্তাব নিয়ে যাব। শুধু একটাই দুঃখ যে তোর বাবা আজ বেঁচে নেই)।'
'*মা, বাবা আসলে কিংকা মরিছে? কেন এত অল্প বয়সে বাবা মুরিছে?* (মা, বাবা আসলে কিভাবে মরেছিল? কেন এত অল্প বয়সেই বাবা মারা গেছিল?'
'*উদা খুবই দুঃখের কথা, মনা। তোলা বাবা যখন মরি যায়, তখন ওলা কোন জ্বর-টর কিছু না থাকিবে। বয়সও খুবই কম থাকিবান। কিন্তু, অয় মুইরা যাছে হাতি খিদাবা যাইয়া। শরৎ হেমন্ত কালনী হাতিগিলী গারো পাহাড়লা গুহিন বন থকন দল বাইনধী আহে। গিরস্থীগুলী ধান তে তারাই ও কলাগাছ খাইয়ী যায়। যত্রতত্র ঘুরিয়ী বিড়ায় ও ক্ষুতি করে। ঐ গুহিন বননি হাজংগিলী হাতি খিদা*

*বানাবীন। খিদা বাইনী রাজাগিলীগে হাতি ধুরিয়ী দিবাগে বাধ্য থাকিবীন। হাতি বিচী রাজাগিলালী এগরা লাভজনক বিপস্যা থাকিব্যন। এছাড়াও নবাব, বাদশা ও ইংরাজ গিলীগে হাতি উপহার দিয়ে বাখার সুনাম কামাবীন। বাইধ্যগত হাতি ধরিবাগে যাইয়ী বাখার হাজং মুরিছে। তোলা বাবাও বাদ নি যায়। সারাক্ষণ এলা ময় দাড়ায় কুন্দা জানে? তোলা বাবা ত যাছেই। দেখতে দেখতে তয়ও বা ডাঙ্গর হইয়া উঠিবা লাগিছে। কুন দিনো বা তগেও জমিদারগিলী হাতি খেদাতে নিয়ে যায়?* (সে ভারি দুঃখের কথা মনা। তোর বাবা যখন মারা যায়, তখন তার অসুখ-বিসুখ কিছুই ছিল না। কিন্তু সে মারা গেল হাতি খেদাতে গিয়ে। প্রতি বছর শরৎ ও হেমন্তকালে গারো পাহাড়ের গভীর বন থেকে দল বেধে হাতি নেমে আসত। কৃষকদের কৃষিক্ষেত, তারাইবন ও কলাবাগান খেয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত হাতিগুলো। ঐ গভীর অরণ্যে খেদা তৈরি করে হাজংরা হাতি ধরে জমিদারকে দিতে বাধ্য থাকত। ঐ সব হাতি বিক্রি করা জমিদারদের একটা বড় লাভজনক ব্যবসা। জমিদাররা হাতিগুলোকে নবাব, বাদশা ও ইংরেজদেরকে উপঢৌকন দিত। এতে নিজেদের সুনাম, যশ ও বিশেষ খেতাব লাভ করার সুযোগ পেত। এই হাতি ধরতে গিয়ে বহু হাজংয়ের মৃত্যু ঘটেছে। তোর বাবাও বাদ যায় নি। সারাক্ষণ আজকাল আমার ভয় করে কি জানিস? তোর বাবা ত' গেল! দেখতে দেখতে তুইও জোয়ানটি হয়ে উঠেছিস! কবে না তোকেও জমিদাররা হাতি খেদাতে নিয়ে যায়?)'

*' না, মা- অয় না পাব। ময় কুনোদিনো জমিদার লা কথায় হাতি ধরিবা না যাব* (না, মা- সে পারবে না। আমি কখনোই জমিদারদের কথায় হাতি ধরতে যাব না)।'

*কাই জানে বাবা! যাক, ময় কালকেই তোলা পছন্দর তিমত ছাওয়া ঘরবায় যাব। আগে তোকে বিয়ে করাং* (কি জানি বাবা! যাক, কাল সকালেই আমি তোর পছন্দের মেয়ের বাড়ি যাব। আগে তোকে বিয়ে ত' দিই)।'

...ঠিক তার কথা মতোই পরের দিনই মনা হাজংয়ের মা চললো সুখমণিদের বাড়িতে। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। সুখমণির বাবা মা-ও প্রস্তাবের সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেল। অমত করলো না। বিয়ের সব কথাবার্তা পাকা হওয়ার এক মাসের ভেতরে সত্যিই *গেতালুগীত* গাইতে গাইতে বিয়ে হয়ে গেল মনা ও সুখমণির। দু'পক্ষই তাদের সাধ্য মতো খরপানি, লেবাহক, গাজা লেবাহক, লৌখরপানি, অংশভাত ও পাচুই সহ প্রচুর খাবার ও পানীয়ের বন্দোবস্ত করলো। তারপর বাবার বাড়ির সবাইকে কাঁদিয়ে সুখমণি চলে এলো মনা হাজংয়ের বাড়ি। অবশ্য শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি খুব দূরে নয়। চাইলে সকাল সন্ধ্যা দু'বেলাই আসা-যাওয়া করা যায়। তা' নতুন সংসারে এসেই ত' খুব খাটনি বেড়ে গেল সুখমণির। শাশুড়িকে সে কিছু করতেই দেয় না। সব কাজ সে একা হাতেই করে। এতে করে শাশুড়িও

সুখমনির উপর দেখতে দেখতে খুব খুশি হয়ে উঠলো। কিন্তু, বিয়ের বছর না পেরোতেই যখন মাত্রই সুখমনি প্রথম বারের মত সন্তান সম্ভবা, তখনি আবার শুরু হলো অঘটন। বৃটিশ সরকার গোটা গারো পাহাড়ে জারি করলো 'গারো হিলস্ এ্যাক্ট।' গারো পাহাড়ের সব জমির উপর সুসঙ্গের জমিদারদের এতদিনের অধিকার রদ হয়ে বৃটিশই নিল সেখানকার সব জমির সত্ত বা মালিকানা। সেই আইনে গারো পাহাড়ে জমিদারদের সত্ত মুছে দেবার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে আদালতে জমিদারদের তরফে মামলা ঠোকা নিষেধ করা হলো। কাজেই জমিদাররা ভাবলেন এ অবস্থায় হাতি খেদার সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে হবে। পাহাড় থেকে যত বেশি বুনো হাতি ধরে বাজারে বিক্রি করা যাবে, ততই লাভ। জমিদাররা গোটা সুসঙ্গ দূর্গাপুর এলাকা জুড়ে হাতি খেদার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন। গারো গ্রামগুলোয় ততদিনে ঢুকে পড়েছে বিদেশী মিশনারিরা। কাজেই গারো প্রজাদেরও আর আগের মত হুকুম করতে পারলো না জমিদার পরিবার। এবার বুনো হাতি ধরার কাজ করতে হবে শুধুই হাজংদের। গ্রামে গ্রামে হাজং ঘরে মা-বউরা কেঁদে উঠলো। কেঁদে উঠলো বোণ ও মেয়েরা। কিন্তু, উপায় কি? জমিদারের হুকুম। হাতি ধরতে যেতে ত' হবেই। যথারীতি মনা হাজংয়ের গ্রাম ও খোদ তার বাসাতেও জমিদারের পেয়াদা এলো। হুকুম হলো মনা ও তার গ্রামের অন্ততঃ দশজন জোয়ান পুরুষকে এই মূহুর্তে ছুটতে হবে গভীর অরণ্যে। হাতি ধরার কাজে। কিন্তু দুঃসাহসী মনা বেঁকে বসলো। সোজা জমিদারের সিপাইদের মুখের উপর না করলো সে।

জমিদারের পাইকেরা বিদ্রুপ করলো, '*তয় কি তিমতমনী বাবা যে হাতি খেদাবা এত ভয়* (তুই কি মেয়েমানুষ মনা যে হাতি খেদাতে ভয়)?'

মনা মুখের উপর উত্তর করলো, ' *তিমতমনী মরদমনী না জানে, তোলা ইচ্ছা হলে তয়বা যা। হাতি ধরে! ময় এ কাম নে নেই* (মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ বুঝি না, তোমার ইচ্ছা হলে তুমি যাও! হাতি ধরো! আমি নেই এই কাজে)।'

পাইকেরা আবার প্রশ্ন করলো, '*হুবাই যায়। তয় কেনে না যাব* (সবাই যাচ্ছে। তুই যাবি না কেন)?'

'*ময় না যাব ইদী বাদেন যে মোলা বাপরাও হাতি খেদাবা যাইয়া মুরিছে। মোলা মাওরা বিধবা থেকে সারা জীবন কত কষ্টে মোগে মানুষ করাছে! এলা ময় মোলা বুড়া মাওরাগে আরো গাবুর বউরাগে থুইয়া কেনে হাতি খেদাবা যাব? জমিদারলা টাকা আয় বাদেন ময় কেনে মোলা জীবন দিবা যাব* (আমি যাব না এজন্য যে আমার বাপও হাতি খেদাতে গিয়ে মরেছিল। মা আমার সারাজীবন বিধবা থেকে, কত কষ্টে আমাকে মানুষ করেছে! এখন আমার বুড়ো মা আর যুবতী বউকে ফেলে আমি কেন হাতি খেদাতে গিয়ে মরতে যাব? জমিদারের টাকা আয়ের জন্য আমি কেন জীবন দিতে যাব)?'

' *তাহলে তয় না যাব* (তাহলে তুই যাবি না?)'

'*ময় ত না যাবই। আরো অন্যগুলাকেও কুবো যেন হাতি খেদাবা না যায়* (আমি ত' যাব নাই। আরো অন্যদেরও মানা করে দেব যেন হাতি খেদাতে না যায়)।'
'*ইদাই কি তোলা শেষ কথা, মনা* (এই তবে তোর শেষ কথা, মনা)?'
'*হ্যাঁ- বাবা- ইদাই মোলা শেষ কথা। তোরা জমিদারগে কইয়া দে* (হ্যাঁ- বাবা- এই আমার শেষ কথা। বলে দিও তোমাদের জমিদারকে)!'
মনা হাজংয়ের এ কথার পর পাইকেরা রাগ করে চলে গেল ঠিকই। কিন্তু জমিদার বাড়ি পৌঁছেই তারা জমিদারের কাণে মনার সব অবাধ্যতার কথা তুলে দিল। মনা অবশ্য সেই রাতেই বাড়ি ছেড়ে পালাল। সুসঙ্গের প্রতিটা গ্রামে ঘুরে ঘুরে সব হাজং পুরুষকে সে বোঝাতে লাগল যেন তারা জমিদারের এ অন্যায় আদেশ মেনে না নেয়। যেন তারা বিদ্রোহ করে। সত্যিই মনার কথায় গারো পাহাড়ে জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন। আসলে হাতি খেদাতে গিয়ে প্রচুর হাজং মারাও পড়ছিল। তাই মনার কথা তারা মেনে নিল। কিন্তু, সুসঙ্গের জমিদার তাই বলে এত সহজে ছাড়লো না। মনার পেছনে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত লোক লাগিয়ে...একদিন এক অসতর্ক মূহুর্তে...জমিদারের পাইকেরা ঠিকই ধরে ফেললো মনাকে। বুনো হাতির পায়ের নিচে তারা পিষে মেরে ফেললো মনাকে। হাজংরা এ ঘটনার প্রতিবাদে ভয়ানক ক্ষেপে উঠলো। বিদ্রোহীরা ধ্বংস করে ফেলল প্রচুর হাতি খেদা। জমিদারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আরো মারা গেল বেতগড়ার রতি ও লেঙ্গুরা বিহারী হাজং আর বিজয়পুরের সোয়া হাজং। এছাড়াও ধেনকীর মঙ্গল হাজং, হদিপাড়ার বাঘা হাজং, ফান্দার জগ হাজংকে হাতির পায়ে পিষে মারা হয়। বাঘপাড়ার গয়া মণ্ডলকে জমিদারের বরকন্দাজ বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। সে আর কখনো ফিরে আসে নি। মংলা হাজং ও তংলু হাজংকেও গুম করে ফেলা হয়। তবে, এদের সবার ভেতর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করা হয়েছিল মনা হাজংকেই। হাতির পায়ে জীবন্ত পিষে মারার আগেও তাকে দীর্ঘ সময় প্রহারে প্রহারে অচেতন করে ফেলেছিল জমিদারের পেয়াদারা। আর সুখমণি? সে ত' বিধবা হয়ে গেল। যতদিন বেঁচে ছিল...এক মাত্র সন্তানকে বড় করে তোলা কি সংসারে কাজের নানা ফাঁকে...প্রায়ই সে গিয়ে দাঁড়াত টিলার সেই কোণটিতে যেখানে বহু বহু বসন্ত আগে লতা-পাতা, ঝোপ-ঝাড় কেটে ভিটে বানাতে আসা এক অচেনা ছেলে তাকে দেখে লতা টানার গান গেয়েছিল,

*আয় বুইনি সকলে লেওয়াটানা রং এ*
*লেওয়া টানিয়ী-যাং নিজ ঘরে*
*টকলে বারি ঘোপাতে, টকলে ফল পাকিছে*
*আয় বুইনি টকলে খাবা যাং।*

...মনা ও সুখমণি হাজংয়ের নাতি নাতনীরা এ ঘটনার প্রায় একশো বছর পরে টঙ্ক বিদ্রোহে আবার উত্তাল হয়ে উঠবে। তাদের সেই বিদ্রোহে সুসঙ্গের জমিদারবাড়ি বা রাজবাড়ি থেকে এক রাজপুত্র এসেও তাদের সাথে যোগ দেবে। কিন্তু সে উপকথা আর একদিন বলবার। অন্য কোথাও। অন্য কোনখানে।

*রচনা : ফেব্রুয়ারি ২০১১*

# বারগির, রেশম ও রসুন বোনার গল্প

১

'কি আর বলি ফৌজদার হুজুর! বীরভূমে, ভাগীরথীর পশ্চিম কিনারে, এই অধমের একখানা আদং[১] ছিল। বীরভূম, মালদা, বর্ধমান আর রাজশাহীর যত রেশম চাষীদের বানানো রেশমি শাড়ি আর ধূতি এই অধমের আদংয়ে চালান হয়ে এসেছে বৈকি। বীরভূম থেকে রাজশাহী ত' বেশি দূর নয়। রাজশাহী আর রংপুরেও চাষা বেটিরা এণ্ডির গুটি কাটে বেশ। এণ্ডির রেশমপোকা পালতে আর পরে গুটি থেকে সুতা কাটা চাষা মাগিদের যেন ছেলেকে মাই দেওয়ার মতো সহজ কাজ! কিন্তু এই বারগিররাও এলো আর গ্রামকে গ্রাম সব মানুষ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। আমার এত বড় আদংটা ফাঁকা হয়ে গেল? হরি হরি! না আসে রেশম চাষী, না আসে এণ্ডি কাপড় হাতে তাঁতী বেটিরা...মাইলের পর মাইল হাট নেই, বাজার নেই, খরিদ্দার নেই, তাঁতীও নেই, চাষাও নেই...সব যে উচ্ছন্নে গেল! বলি, নবাব আমাদের করছেটা কি? মা ভৈরবী কি তার কৃপা দৃষ্টি নবাবের মস্তক থেকে সরিয়ে নিয়েছেন?'

শ্রী জনার্দন দত্তের কপালে সকালের পূজার চন্দন তিলক এখনো মোছে নি। বরং শুকিয়ে চড়চড় করছে। চৈত্রের সকালে হাওয়া এই তেতে উঠছে ত' আবার পর মুহূর্তেই ঈষৎ শীতল। সেই বিচিত্রগামী বাতাসে ধূতির উপর একটি রেশমের শালও উড়ছে জনার্দনের শরীরে।

'ইয়ে...মানে বারগির বলতে কাদের কথা বলছেন? কিসিকো বাত শোচ মে আপ?' গলা সামান্য কেশে প্রশ্ন করেন জনার্দনের সামনে বসা শ্রোতা মোহাম্মদ রেজা। তিনি হুগলি জেলার ফৌজদার। আসলে লাখনৌয়ের শিয়া মুসলমান হলেও ত্রিশ বছরের উপর হয় বাংলায় আছেন। প্রবল মদ্যপায়ী হিসেবে সুনাম বা দুর্নাম যাই থাকুক, মানুষ মন্দ নন। জনার্দন দত্ত মুর্শিদাবাদের অভিজাত শ্রেণীর একজন। ঠিক জগৎ শেঠের মাপের বড়লোক না হলেও বিত্তবান ত' বটেই। আবার যৌবনে সেনাবাহিনীতে কাজের অভিজ্ঞতাও আছে। বীরভূমে তার

[১] নবাব আলীবর্দী খাঁয়ের সময় বাংলার নিজস্ব রেশম বস্ত্র উৎপাদন কারখানা ও বিক্রয়কেন্দ্র

রেশমের আদংয়ে খোদ আসাম থেকেও রেশম চাষী আর কারিগররা আসে। বীরভূম তার দেশের বাড়ি ও ব্যবসার কেন্দ্র হলেও মুর্শিদাবাদেও রেশমি বস্ত্র বিক্রির দোকান আছে তার। শোনা যায় খোদ নবাবের অন্দরমহলে জনার্দনের আদংয়ের রেশম বড় আদরের। জনার্দনের রেশম কুঠির কাপড় না এলে হারেমের খলিফারা বেগমদের কুর্তা সালোয়ারের জন্য কাপড় কাটার কাঁচি হতাশ হয়ে ছেড়ে দেন।

'এই যা! আমরা বাঙালিরা ত' আবার বারগিরদের বলি বর্গী! আমি মারহাট্টা দস্যুদের কথা বলছিলাম মহাশয়।'

'তাজ্জব কে বাত। অ্যায়সা কভি নেহি শুনা। এমন তো আগে শুনি নি! বর্গীরা আবার বারগির হলো কবে? '

'ওদের নাম বারগিরই। মারহাট্টা দেশের সেনাবাহিনীতে যারা সবচেয়ে নিচের সারির সৈন্য, তাদের মারাঠি ভাষায় বারগির ডাকে। আমি যৌবনে সে দেশে ছিলাম কিছুকাল। তাই জানি। আমাদের বাঙালি জিহ্বায় এখন বর্গী নামটিই বেশি চালু হয়ে গেছে।'

মোহাম্মদ রেজার অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা কক্ষে এক কায়স্থ পরিচারক এসে জনার্দন দত্তের সামনে পেতলের গড়গড়া রেখে যান। রেজা সাহেব ইতোমধ্যেই অতিথির অনুমতি সাপেক্ষে আলাবোলায় ঠোঁট রেখেছেন। সবার জাত-ধর্ম রক্ষার দিকেই কড়া নজর তার। মুসলিম অতিথি এলে সুবিধা এই যে যেকোন মুসলিম পরিচারক এসেই অতিথিকে ধোঁয়া বা পানীয় পরিবেশন করতে পারে। কিন্তু হিন্দুদের এত জাত! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, সদগোপ, গন্ধবণিক...সে এক মুশকিলের বিষয়! সাদা রঙের ডাচ, ওলন্দাজ আর ইংরেজরাও আসে মাঝে মাঝে তার কাছে। ধূম্রের চেয়ে বোতলই তাদের কাছে অধিকতর প্রেমাস্পদ।

'তাই? এমনটা এই প্রথম শুনলাম মহাশয়! ভারি আশ্চর্য লাগছে!' মোহাম্মদ রেজা একটি অলস হাই গোপন করে বলেন। কাল রাতে প্রায় ভোররাত অবধি পান হয়েছিল। প্রায় রাতেই এমনটা হয়ে যায়। সেই পানের খোঁয়ারি কাটতে কাটতে পরদিন মধ্যাহ্ন লেগে যায়। কাজে-কর্মে মন দিতে কষ্ট হয়। কিন্তু, এ নিয়ে কোন গ্লানিবোধ নেই তার। পান করেন বলেই তিনি নিষ্পাপ। এই যে শ্রী জনার্দন দত্ত নামক লোকটি তার সামনে বসে...সে হয়তো সারা জীবনেও কখনো পান করেছে কিনা ঠিক নেই। কিন্তু পান করে না বলেই ত' ঠাণ্ডা মাথায় রেশম চাষী আর তাঁতীদের রক্ত চুষে আর চন্দন নগরে ওলন্দাজদের সাথে রেশম ব্যবসার বড় বড় চুক্তি লাভ আর কোটি টাকার মুনাফা করা এই লোকটির চেয়ে মোহাম্মদ রেজা কি মানুষ হিসেবে খারাপ? কভি নেহি। হতে পারে এই জনার্দন দত্ত প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করে কপালে তিলক এঁকে তবে পথে বের হয়, তাতে কি? মোহাম্মদ রেজা নামাজ না পড়তে পারেন কি শরাবও একটু বেশি টানতে পারেন। তবু অন্য আর দশটা জেলার ফৌজদারদের মতো তিনি কখনো বিনা

দোষে কারো গর্দান নিতে যাননি। কোন গরিবের ঘরে আগুন দেওয়ার কাজও করেন নি। তবে, যুদ্ধ করতে আজকাল তার আর ভাল লাগে না। ভাল লাগে এক পেয়ালা শরাব সামনে নিয়ে বসে ফার্সিতে রুবাই লিখতে কি গুনগুন করে গজলের সুর ভাঁজতে। যুদ্ধে বড় সিপাহসালারের খেতাব পাওয়া কি এই জনার্দনের মতো ব্যবসা করে অনেক টাকা কামানোর কোন ধান্ধাই তার নেই।

'আশ্চর্যের আর কি হুজুর? শুনুন বলি। মারহাট্টার সেনাবাহিনীতে যারা উঁচুর দিকের সৈন্য তাদের অস্ত্র আর ঘোড়া তাদের নিজেদেরই। আর একদম নিচুর সৈন্য হলো এই বারগিররা। এদেরকে অস্ত্র আর ঘোড়া দিতে হয় খোদ সেদেশের রাজাকেই। নিচুর দিকের সৈন্য বলেই মায়া মমতা একেবারেই নেই এই বারগিরদের। একে ত' গোটা মারহাট্টা দেশ একটা কঠিন পাথরের পাহাড়ে ভরা এলাকা। গাছ কি ফসল কিছুই চোখে পড়বে না আপনার। সেই আবহাওয়ায় মানুষগুলোও নিতান্ত খটমটে। আরে মেয়েমানুষেরা পর্যন্ত সেখানে শাড়ি পরে আমাদের পুরুষদের ধূতি পরার মতো মালকোঁচা মেরে। কথা বলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে আর চড়া গলায়। কথা হলো এই বারগিররা এ কি শুরু করলো আমাদের দেশে এসে? নবাব আলীবর্দী খাঁ কি কোন প্রতিকারই করবেন না? চাষী, গেরস্থ, তাঁতী থেকে শুরু করে এই আমরা যারা একটু ব্যবসা করে দু'বেলা দু'টো অন্ন মুখে দিই...সবার ঘরই যে শ্মশান হতে চললো!'

'বর্গী বা বারগিরদের সম্পর্কে এত কিছুই আমি জানতাম না। কিন্তু, মহাশয়...আপনার দেশ ও রেশমের বড় আদৎটি বীরভূমে। সেখানে আপনার দুই পুত্রই যতদূর জানি আপনার ব্যবসার দেখভালের বেশিরভাগ দিক সামলায়। আপনি নিজে থাকেন মুর্শিদাবাদে। হুগলির এই সামান্য ফৌজদার আপনাকে কি সেবা করতে পারে?'

'কোন ফৌজদারই সামান্য নয় হুজুর!' মাথা নাড়েন জনার্দন, 'সে নবাব আলীবর্দী খাঁ সাহেবের রাজধানি মুর্শিদাবাদের ফৌজদার হোন আর যেখানেরই হোন না কেন? হুগলি কম কিসে হুজুর? কত বড় বন্দর! এখানে ডাচ, ওলন্দাজ আর ইংরেজ এক ঘাটে গড়াগড়ি খায়। এর ইজ্জতের সাথে কার তুলনা? আমরা ব্যবসা করি কিনা, বাংলার বড় বড় সব শহরেই আমাদের সাথে অনেক ক্ষুদে দোকানদার, রেশম চাষী, তাঁতী...সবার সাথেই আমাদের কারবার! সব শহরের ফৌজদারকেই আমাদের নজরানা দান কর্তব্য...'

এইটুকু বলে একটু বিনয়ে গদগদ হাসির ঝিলিকমাত্র উপহার দিয়ে গড়গড়া থেকে হাত সরিয়ে, গায়ের রেশমের চাদরের ভেতর থেকে একটি রেশমের থলে বের করে জোড় হাতে নমস্কার করে মোহাম্মদ রেজার দিকে এগিয়ে দিলেন। ভেতরে ঝনাৎ করে উঠলো কি প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা? অন্য অনেক নির্লজ্জ ফৌজদারের মতো উপহারদাতার সামনেই থলে খুলে দেখতে তাঁর রুচিতে লাগে।

'এর কোন প্রয়োজন ছিল না। তবু, এনেছেন যখন তখন আর কি বলি?

শুকরিয়া! আলহামদুলিল্লাহ!' জীবনের ত্রিশটা বছর বাংলায় বাস করা লাখনৌয়ের শিয়া মোহাম্মদ রেজা বিলক্ষণ ভাল বাংলা বলেন। এমনকি বাক্যের ভেতরে ফার্সি বা উর্দু শব্দ যত কম পারা যায় ব্যবহার করেন। একটা ভাষাকে তার মতো করেই, তার সমস্ত শব্দ সমেত বলা উচিত।

'আজ বরং আমি উঠি। আরো কয়েকটা কাজ আছে। আপনারও ত' দুপুরের বিশ্রাম নেবার সময় হয়ে এলো!'

'না, আর একটু বসেন।' ইঙ্গিতে হাত নাড়েন মোহাম্মদ রেজা, 'মনে হচ্ছে বারগিরদের সম্পর্কে ভালই জানেন আপনি। আমি ত' ফৌজদার হয়েও শরাব আর শায়েরির খবর যত রাখি ততটা জঙ্গের খবর রাখি না। তবে যতদূর মনে হয় নবাব আওরঙ্গজেব মারাঠা সেনাপতিদের মোঘল সম্রাটের মসনবদার বানানোর চেষ্টায় ভাল হতে গিয়ে বুরা হলো...আপনারা বাঙালিরা যাকে বলেন খারাপ হলো!'

'কেন? আওরঙ্গজেবের আর যে সমস্যাই থাক, কাউকে মসনব দিতে যাওয়াটা কি দোষের?'

'কিন্তু মারহাট্টার হিন্দু আর বাঙালার হিন্দুতে অনেক তফাৎ আছে মহাশয়! বাংলায় এসে দেখি এখানে ব্রাহ্মণও আরামসে মাছ খায়। কালি পূজায় পাঁঠার মাংস ভি খায়। মছলি আর গোশত খেয়েও ব্রাহ্মণ থাকা এক বাংলাতেই সম্ভব। ঔর বাংলার হিন্দু ত' বটেই, মুসলমানও পারলে যুদ্ধ করে না। কিন্তু রাজপুতানা আর মারহাট্টা দেশের হিন্দু যুদ্ধ না করতে পারলে শান্তি পায় না। সেখানের মুসলমানদের কথা না হয় বাদই দিলেন। আওরঙ্গজেব মসনব দিতে চাওয়ায় কোন কোন মারাঠা জমিদার বা সেনাপতি সেই টোপ গিলেছে ঠিকই, কিন্তু স্বাধীনচেতা অনেকেই এতে বিরক্ত হয়েছে। অপমান হয়েছে তাদের এই প্রস্তাবে। আর সেই বিরক্তি কার উপর আর ঝাড়বে? মোগল বাদশাহির সবচেয়ে শানদার এই সুবা বাংলাতেই তারা হামলা করে চলেছে। এত ফসল, এত কাপড়া, মশলা...আর কোথায় মিলবে?'

২

এই নিয়ে চারবার এদেশে আসা হলো সুরনাথ সালগাঁওকরের। প্রথম সে এসেছিল বিক্রম সংবর্ত ১১৪৭-এ। এই বাঙালা মুল্লুকের পাঁজি-পুঁথিতেও সেই বছরকে ১১৪৭ই নাকি বলা হয়। গোয়ায় তার মামাবাড়িতে যেখানে এখন ডাচ-পর্তুগিজ-ইংরেজ ফিরিঙ্গিতে ভরে গেছে...সেখানে অজকাল সাদা মানুষদের পাঁজির সন-তারিখও কেউ কেউ বলে। সাদা মানুষদের পাঁজি খুব অদ্ভুত। সেটা প্রায় পাঁচশ' নব্বই বছরেরও বেশি...পাঁচশ' একানব্বই, বিরানব্বই...হুম্, পাঁচশ'

তিরানব্বই বছর এগোনো। সেই পাঁজির হিসাব ধরলে সুরনাথ এদেশে এসেছিল প্রথম ১৭৪০ সালে। এগারো বছর পার হয়ে গেল। ফিরিঙ্গিদের পাঁজি অনুযায়ী এখন ১৭৫১ সাল আর বিক্রম সংবর্ত মানলে সালটা হবে ১১৫৮। এই এগারো বছরে দফায় দফায় এসেছে সে। মহারাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর এক তুচ্ছ বারগির সে। বারগির সেই সৈন্য যে কিনা এতই গরিব যে তার ঘোড়া আর বন্দুক খোদ রাজাকেই যোগাতে হয়। বড় সেনাপতি বা রাজপুত্র কি সাদা-সিধা কোন বণিক ঘরেও সে জন্মায় নি যে ঘরের জোয়ান ছেলে যুদ্ধে যাবার সময় নিদেনপক্ষে একটা ঘোড়া আর একটা তলোয়ার কেনার পয়সা অন্তত বাপ-কাকা বা মায়ের বংশে মামা দিতে পারবে। সে বারগির। মহারাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর সেই ক্ষুধার্ত অংশ যারা খরায় পুড়ে যাওয়া দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ পাহাড় ও মালভূমি পার হয়ে রক্তের নিদারুণ অংশুমান হাহাকারে ছায়া ও ফসল, সম্পদ ও নিদ্রা, গান ও পাখির ডাকের জনপদ বাংলার দিকে ছুটে চলে...যদি সেই ছায়া ও মেঘের দেশ থেকে তারা লুণ্ঠন করতে পারে একটুকরো ছায়া কিম্বা একমুঠো মেঘ...অন্তত কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি জল...যদি সেই দেশের তাঁতে বোনা নরম কাপড়...সুতি, রেশম আর মসলিনের মতো নরম যত কাপড় আর তাঁত চালাতে বসা কাপড়ের চেয়েও কোমল...সুতি, রেশম আর মসলিনের তন্তুর মত সূক্ষ্ম সে দেশের মেয়েদের তারা হরণ করতে পারে...যদি সেই শান্ত, নিদ্রাতুর আর সদা স্বপ্নের ভারে এলায়িত সেখানকার সুখী মানুষদের কাছ থেকে এতটুকু ঘুম আর এতটুকু স্বপ্ন তারা ডাকাতি করে তাদের রুক্ষ মালভূমি আর পাহাড়ের জীবনে নিয়ে যেতে পারে...সাধে কি বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ শেষ যুদ্ধে কলিঙ্গদেশ মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন? শাবাশ পেশোয়া বালাজি বাজি রাও! তার নির্দেশেই ১১৪৯ বিক্রম সংবর্তের বছরের একদম শুরুর মাহিনাতেই নাগপুর থেকে তারা সার সার ঘোড়া ছুটিয়ে বর্শা আর বল্লম হাতে ঢুকে পড়ে মোগলের সুবা বাংলার বর্দ্ধমান জেলায়। বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই বারগির। ঘরে যাদের রুটি নেই। তাই শত্রুর দেশে যে কোন লুটতরাজ চালাতে তাদের কলিজায় এতটুকু হোঁচট লাগে না! আর এই বারগিরদের চালনায় মহারাষ্ট্রের নামী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত। পণ্ডিত বংশে জন্ম হলেও তাঁর চরিত্রে ক্ষত্রিয় স্বভাব বেশি। নবাব আলীবর্দী খান তার বাহিনী নিয়ে উড়িষ্যার কটক হয়ে বর্দ্ধমানে ঢুকলেন ভাস্কর পণ্ডিতের বারগিরদের একহাত দেখে নিতে। কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত যেমন চতুর তেমনি নির্মম। বর্দ্ধমান শহরে বাংলার নবাবের ফৌজ পৌঁছানোর আগেই যেহেতু পৌঁছে গেছে তার বারগির বাহিনী, নবাবের ফৌজ পৌঁছতে পৌঁছতে ততদিনে গোটা শহরের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। বর্দ্ধমান শহর থেকে সামান্য দূরে সম্রাট তাঁর শিবির গাড়লেন। শহরের মুচি কি ভিস্তিঅলা থেকে শুরু করে বাজারের ক্ষুদে দোকানদার, চাল ডাল কি গমের আড়তদার, সব্জি ফিরিঅলা, কামার, রংমিস্ত্রি আর ঠেলাঅলা ত' বটেই, বড় বড় শেঠ, ব্যবসায়ী বা

আমির পরিবারের মানুষজনও ভাস্কর পণ্ডিতের নজরদারির ভেতর বন্দি হয়ে গেল। ফলে, বাংলার নবাব আলীবর্দী খানকে কে আর সাহস করে তার বাহিনীর জন্য একমুঠো চাল কি গমও একবেলা পাঠায়? ওদিকে তাদের বারগিরদের আর একটি দল বর্দ্ধমান শহর ছাড়িয়ে আরো চল্লিশ মাইল ভিতর অবধি লুঠ চালালো। মারহাট্টা বারগিরদের কর্ডন ভেঙে ভেতরে ঢুকবার এক মরীয়া ও শেষ প্রচেষ্টা নবাব আলীবর্দী চালালেন বৈকি, কিন্তু নবাবের দরবারের ইরানি আমির মীর হাবিব...ভয়ানক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার...বাংলার নবাবের সাথে মারহাট্টার বাহিনীর এই অবরোধ পাল্টা অবরোধের সময় হঠাৎই এক রাতে গোপনে দূত পাঠিয়ে ও পরে নিজেই ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রাচীরের এপারে এসে ভাস্কর পণ্ডিতের সাথে দেখা করে, আঁতাত করে গেলেন। মীর হাবিব ইরানি হলেও বাংলায় আছেন দুই পুরুষ ধরে। ফলে মীর হাবিবের কাছ থেকে বারগিররা পেল বাংলার পথে-প্রান্তরে যুদ্ধ চালানোর ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি প্রতিটি পরামর্শ। এই মুল্লুক সম্পর্কে মীর হাবিবের সমস্ত জানাশোনার সুফল তারা পেল। ভয়ানক মানুষ বটে এই মীর হাবিব। আরে, হাজার হোক দু'পুরুষ হলেও তো এই দেশে বাস করছিস! শোনা যায়, মীর হাবিবের পিতা ইরানি হলেও গর্ভধারিণী মা বাঙালি। তা' বাঙালি মায়ের সন্তান হয়ে এই দেশটাকে বিদেশিদের হাতে তুলে দিতে লোকটার এতটুকু সঙ্কোচ হলো না? লুট আর লুটের অভিযানে বারগিরদের নিমন্ত্রণ জানালো সে-ই। ভোলা কি যায় মুর্শিদাবাদের দাহিপাড়া অভিযানের কথা? তাদের বারগিরদের ঘোড়া একটার পর একটা ঢুকে পড়ছে বাজার আর জনপদগুলোর ভেতর দিয়ে...ডান হাতের জ্বলন্ত মশাল তারা ছুঁড়ে মারছে চারপাশের দোকানপাটে...হাটের বাঙালিরা প্রবল চিৎকার আর উদ্ভ্রান্ত কান্নায় যে যেদিকে পারে ছুটছে আর তাদের মুখে ক্রমাগতই একটি শব্দ শোনা যাচ্ছেঃ 'বর্গী! বর্গী!' বাঙালিরা বোধ করি 'বারগির' শব্দটি বলতে পারে না। ছুটতে ছুটতে বাঙালি পুরুষদের পরনের পোশাক খুলে যাচ্ছে কোমর থেকে, মেয়েদের শাড়ি আলুথালু, 'বর্গী এলো রে! হে ভগবান! পালাও পালাও! হায় আল্লাহ! ও মাগো! বাবাগো! বর্গী!' মুর্শিদাবাদের নামী হিন্দু রইস আদমি জগৎ শেঠের বাসা থেকেই তিন লাখ রুপি তারা লুটে নিল। নবাব আলীবর্দী বর্দ্ধমান থেকে আবার দ্রুতই ছুটে এলেন মুর্শিদাবাদে। রাজধানি বাঁচাতে। তারা বারগির সৈন্যরা, ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে, এবার ছুটলো কাটোয়া...দু'ধারে সারি সারি গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালাতে জ্বালাতে। সেই খাণ্ডব দাহন শেষ না হতেই প্রতি মাসে দেখতে না দেখতে কিভাবে কিভাবে যেমন নারীর শুকনো, খটখটে শরীরে রক্তের ঢল নামে, ঠিক সেই ভাবে বাংলার শুকনো, খটখটে আকাশে এলো বর্ষা। বাংলার বর্ষা এক অদ্ভুত বিষয়। মহারাষ্ট্রেও বৃষ্টি হয় বটে। কিন্তু বাংলার বৃষ্টির যেন কোন সীমানা নেই। আর এদেশের একটু পরপরই ছোট ছোট খাল আর নদীগুলো...পাহাড়ি নদী নয়...নদী তারা সমতলের...দেখতে দেখতে আকাশ

ছাপানো বৃষ্টিতে কেমন ভরে ওঠে! খালগুলো ভরে ওঠে সাদা আর লাল অজস্র ছোট ছোট পদ্মের মতো এক ধরনের ফুলে...বাঙালিরা কি একে 'শাপলা' বলে? সেবারের সেই বর্ষার সময় থেকেই তাদের মারহাট্টা সৈন্যদের মূল শিবির...সার সার তাম্বু... কাটোয়াতেই গাড়া হলো। মীর হাবিব ত' আছেই মারহাট্টা বাহিনীর সাথে। হুগলির মদ্যপ ও কবি ফৌজদার মোহাম্মদ রেজাকে জেলে পোরা হলো। ভাস্কর পণ্ডিত এবার দায়িত্ব তুলে দিলেন শেষ রাওয়ের হাতে। গঙ্গার পশ্চিমে রাজমহল থেকে মেদিনীপুর আর যশোর অবধি মারাঠা বারগির রাজ কায়েম হলো। শেষ রাও তাদের প্রধান নেতা। মীর হাবিব মারাঠা রাজের পক্ষে বাংলার দেওয়ান হলেন। বাংলার সমস্ত পরগণায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব জমিদারকে তিনি চিঠি দিলেন এই নয়া বারগির ও মারহাট্টা রাজকে 'চৌথ' খাজনা দিতে। ওদিকে গঙ্গার পশ্চিম তীর থেকে হাজারে হাজার বাঙালি তখন তাদের চোদ্দ পুরুষের বসতি ছেড়ে ছুটছে গঙ্গার পূর্বদিকে...বারগির সৈন্যদের হাত থেকে তাদের মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করতে। আহাহা, কতদিন হয় পাহাড় আর মালভূমি ছাওয়া মহারাষ্ট্রের গ্রামে কি শহরে মর্দানা ধাঁচের শাড়ি পরা, ঈষৎ পুরুষালি মেজাজের বউদের ফেলে তারা এসেছে। তারপর শুধু ঘোড়ার পিঠে ছুটে চলা, আগুন ধরানো, খুন আর লুঠ। রাতে পথের পাশে যেখানে যখন পিঠ পাততে পারা যাচ্ছে, সেখানেই ঘুম। তাদের শরীরের ক্ষুধা নেই নাকি? পুরুষের ভয়ানক ক্ষুধা? বারগিরদের ভেতর যারা বিবাহিত, অভ্যস্ত যারা নিয়মিত স্ত্রী আস্বাদনে, তারা লুট করা বাঙালি মেয়েদের মাধ্যমে ঘরের বউয়ের অভাব পূরণের চেষ্টা যতদূর সাধ্য করে নেয়। আর যে সদ্য তরুণেরা এদেশে এসেছে অবিবাহিত, তাদের এখানে এই লুট হওয়া মেয়েদের মাধ্যমেই প্রথম পুরুষ হতে পারার ছাড়পত্রের অনুমতি ভাস্কর পণ্ডিত আর শেষ রাও ত' দিয়েই দিয়েছেন। সুরনাথ নিজে অবশ্য বিবাহিত। বিয়ে হয়েছে তার বাল্যবয়সেই। স্ত্রী সাবিত্রী তেমন সুন্দরী নয়। ইতোমধ্যেই দুই সন্তানের মা। কিন্তু তার রূপ বা শরীর নিয়ে ইদানীং নতুন কোন বাসনা আর সুরনাথ নিজের ভেতর অনুভব করে না। এখানে এই বাংলায় অবশ্য প্রচুর লুণ্ঠিত নারী আছে। চাইলে বাসনার পরীরা এখানে শ'য়ে শ'য়ে ডানা মেলতে পারে! কিন্তু, তুমি এমন কেন সুরনাথ? ঘোড়া, তলোয়ার আর কামান চালানোর দ্রুততায় ইতোমধ্যেই খোদ শেষ রাওয়ের সুদৃষ্টি অর্জন করেছো! কিন্তু, গৃহস্থের ঘরে আগুন দিতে, বণিকের শেষ পণ্যটুকু কেড়ে নিতে তোমার হাত আজো কাঁপে কেন? তোমারই সহযোদ্ধারা যখন রাতের বেলা আগুন জ্বালিয়ে তাঁবুর ভেতর এদেশের মেয়েদের নিয়ে অনিঃশেষ হল্লায় মাতে, তুমি তাঁবুর বাইরে নাঙা তলোয়ার হাতে মারাঠা ঘাঁটি পাহারা দিতে দিতে শিউরে ওঠো কেন? পৌরুষের এই বীভৎস হল্লায় সতীর্থ সৈনিকেরা তোমাকে যখন ডাকে...এদেশের রেশম আর মসলিনের কোমল সুতার চেয়েও নরম মেয়েগুলোকে মাটিতে ফেলে, মারহাট্টার রুক্ষ পুরুষেরা যখন একের পর এক

এদেশের সবুজ মৃত্তিকাকে চিরে ফেলার মতোই তাদের বিদীর্ণ করতে উদ্যত হয়...আর ধর্ষণকারীরা যেহেতু প্রায়শই সাম্যবাদী...তাই তারা তোমাকেও আহ্বান জানায়...তুমি কিভাবে নানা কৌশলে এড়িয়ে যাও? হায় সুরনাথ! শরীর নাই তোমার? তোমার শরীর কি জাগে না? কিছুতেই জাগে না? কিন্তু এভাবেই বুঝি পাপকে তুমি এড়াতে পারবে মনে করো? সম্ভ্রমহারা নারীর কান্না, বহ্যুৎসবে আক্রান্ত গৃহস্থ, সর্বস্ব হারানো কৃষক, তাঁতী অথবা বণিক...এদের সকলের দীর্ঘশ্বাস এড়াতে নিঃশব্দ দেবতার মন্ত্রপাঠই কি তোমাকে বাঁচাতে পারবে মনে করো? কিন্তু, কি করব আমি? আমি সুরনাথ সালগাঁওকর...মহারাষ্ট্রের যে গ্রামে আমার জন্ম...সেখানে আজ দশ সন হয় বৃষ্টি হয় না...আজ দশ বছর সেখানে কোন ফসল নেই। খরা আর অজন্মায় আমার এক দিদি দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে দেবদাসী হিসেবে বিক্রি হয়েছে আর এক দিদি গোয়ায় পর্তুগিজদের রক্ষিতা। ...তখনো আমি কিশোর। আজ এই দস্যুবৃত্তি ছাড়া আমার আর কি-ইবা অবলম্বন? আমার দেশে বাংলার মতো না চাইতেই জমিতে ফসলের হিল্লোল নেই! এত নদী নেই। নেই এত মৎস্য ও পাখির আমিষ। আমি সুস্থ দেহের যুবক পুরুষ...ভিক্ষা ত' করতে পারি না! মনকে বোঝাও সুরনাথ। ঈশ্বরের কি অধিকার আছে হিন্দুস্থানের একের পর এক প্রদেশকে বঞ্চিত করে বাংলাকে এত রূপ দেবার? যে দেশের মাটিতে এত ফসল যে গৃহস্থ অকাতরে কি হেলা-ফেলায় ফেলে রাখে তার ধান, ফলের বাগান কি মশল্লা? আর পাখিরা এসে খুঁটে খায় যত ফলবীজ আর শস্যের দানা? হায়, পাখি এসে খুঁটে খায়। পাখির হাতে নষ্ট হবার থেকে মানুষের পেটে দানাপানি যাওয়া কি বেহতর নয়? তবে আর অন্য প্রদেশের মানুষদের দোষ কি যদি এখানে এসে কিছু খাবার নিয়ে যায়? চাই কি জোর করেই?

৩

রেশমের গায়ে যখন গুটি ধরে তখন বিভাবতীর অসম্ভব আনন্দ হয়। তাঁতীর ঘরের মেয়ে সে। বালবিধবা। এমন নয় যে সে ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা। তাদের জাতে মেয়েদের আবার বিয়ে হয় বা হতে পারে। কিন্তু আজকাল ব্রাহ্মণদের নকল কে না করছে? বামুনের মতো হতে পারাতেই যেন আনন্দ। বিভাবতীর বিয়ে হয়েছিল যখন তার পাঁচ বছর বয়স। স্বামী হারালো সে ন'য়ে। স্বামী নারায়ণ বসাক সাপে কাটা পড়ে মারা গেল যখন তখন সেই বালকের বয়স বারো। দু'জনা তারা প্রায়ই মারামারি করতো। না, তখনো বিভাবতীর ঋতু হয়নি। বিভাবতীর বাবা তল্লাটের নামী রেশমচাষী। রেশমপোকার চেহারা দেখেই সে বলে দিতে পারে কেমন পোক্ত হবে এই সুতা। তার রেশমের থান আশপাশের অনেক রেশম আদংয়ে চালান হয়। নয় বছরের বিধবা মেয়েকে বুকে

জড়িয়ে বাবা সত্যচরণ বললেন, 'এখন থেকে এই রেশমের কাজে হাত দে মা। মন দিতে পারলে ভাল সুতা কাটুনী হতে পারবি।' সেই শুরু। ধীরে ধীরে রেশমের সাথেই যেন বিয়ে হলো বিভাবতীর। তার সমস্ত মন জড়িয়ে গেল রেশমের বহুবর্ণ সুতায়। নীল, হলুদ, রক্তাভ, পীত, সবুজ কি সাদা যত রেশম কাপড়ের থানে। আর পাশাপাশি চলতে লাগলো দিনমান বাবার রেশমগুটি পালা আর সুতা কাটার পাশাপাশি বিধবার একাদশী, ব্রত, বারবেলা, নিরামিষ-হবিষ্যি, পাঁচালী পাঠ। সব মিলিয়ে কেমন আনন্দেই দিন কাটে তার! সংসারে তাদের শান্তি কম নয়। বাবা এখনো জীবিত। মা অবশ্য বিভার শৈশবেই দেহ রেখেছেন। এজন্যই বাবা আরো বেশি মমতাবান। তিন ভাই ও ভ্রাতৃবধূরা আপাতঃ স্বস্তিপরায়ণ। দুই দিদি পতিগৃহে। সে এ বাড়ির সবচেয়ে ছোটমেয়ে হয়ে যে বালবিধবা এই দুঃখেই বাড়ির কেউ তাকে কোন কুবাক্য বলে না। এমনকি ভ্রাতৃবধূরা অবধি নয়। বছর তিনেক আগে বাবা দেহ রাখলেন...দেহ রাখার আগে যখন তাঁর শ্বাস উঠেছে...বাড়ির তিন দাদা আর বৌদিদের ডেকে...সবার সামনে তিনি বললেন, 'বিভা মা আমার গত কয়েক বছর রেশমের কারবারে আমাকে যেমন গায়ে-গতরে খেটে সাহায্য করেছে, এমন কোন পুত্রসন্তানও করে না। আমার দুই মেয়ে স্বামী গৃহে সুখী। বিভা বালুবিধবা। আমি জানি যে তোমরা ভাই ও ভাইবউরা তাকে দেখবে। তবু, নারায়ণ করুন কোন অশান্তি না হয়... তাই জীমুতবাহনের দায়ভাগ নিয়ম মেনেই... আমার বিধবা ও নিঃসন্তান কন্যা বিভাবতীকে আমার রেশম বাগানটা তার মৃত্যু অবধি তাকে দিয়ে যেতে চাই। ন'তে বিধবা হওয়ার পর থেকে আজ বিভা ষোড়শী। এই সাত বছরে তার চরিত্র বিষয়ে একটি কলঙ্কের কথা তল্লাটের কোন শত্রুও বলতে পারে নি। তাই এই স্থাবর ভিটা বাড়ি আর আমার প্রায় পঞ্চাশ বিঘা ধানি জমি তোমাদের তিন পুত্রের হলেও আমার রেশম বাগানটা আমি সমাজের আর দশজন গণ্যমান্য গুরুজনের সামনে, ভট্টাচার্য মশায়দের ডেকে বিভাবতীর নামেই বন্দোবস্ত করতে মনোস্থির করেছি। বিভার মৃত্যুর পর যেহেতু সে বিধবা ও পুত্রহীনা, এই রেশম বাগান আবার তার ভাই বা ভাইদের অবর্তমানে ভ্রাতুষ্পুত্রদের হাতেই যাবে। তোমাদের কোন আপত্তি নেই তো?' নিরীহ বড় এবং ছোটদা আপত্তি না করলেও ঠ্যাটা মেজদা একটু আপত্তি তুললো, 'পুত্র বা পুত্রের পুত্র থাকা অবস্থায় কন্যা কিছু পায় কি? আরো যে কন্যার পুত্র নেই?'

বিভার বাবা একথায় অল্প দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনেক বড় বড় অবস্থার বামুন কায়েত ঘরের বালবিধবা মেয়েদের দেখেছি বাপের মৃত্যুর পর ভরার নৌকায় চালান হতে কি নবাবের কুঠিতে নাচনেওয়ালি হয়েছে অথবা কাশিতে কুকুর-বেড়ালের জীবন কাটাচ্ছে। বিভা তোমাদেরই মায়ের পেটের বোন। আমার রেশমের চাষে তার মতো কেউ খাটে নি। তার মতো কেউ শ্রম দ্যায় নি।

তবু, তোমাদের অমতে আমি কিছু করবো না!'
বড়ভাই-ই তখন সায় দিল, 'আপনি ওকে দিন বাবা। আমাদের অমত নেই।'
'জয় গুরু!' বাবা স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে চোখ মুঁদলেন।
...তা' বিভাবতীর বাবা মেয়েকে কিছু বাংলা আর অঙ্ক লিখতে-পড়তে শিখিয়েছিলেন তার বালিকা বয়সেই। শুধু গুটি পোকা পালতে আর সুতা কাটতে জানলেই হয় না। রাজশাহী থেকে নবাবের খাস শহর মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত জালের মতো ছড়িয়ে থাকা বাংলার অসংখ্য রেশমের আদং বা দোকানের কারবারিদের কাছে মাল পৌঁছানোর ব্যবস্থা, রেশমের চালান, চাষীদের দেখা-শোনা করতে এই পড়াশোনাটুকু জানা নিতান্ত জরুরি। পিতার মৃত্যুর পর আরো তিন বছর চলে গেছে। বিভাবতী ভাইদের সংসারেই থাকছে বটে। কিন্তু, তার নাম আড়াল করে ফেলেছে ভাইদের নাম। প্রয়াত সত্যচরণের কন্যা ঘরে বসেই তল্লাটের নাম করা রেশমের কারবারি হয়ে উঠেছে। বীরভূমের সবচেয়ে বড় রেশমের আদংয়ের মালিক...মুর্শিদাবাদের জনার্দন দত্তের দুই ছেলে হরিকিশোর আর প্রাণকিশোর দত্ত নাকি বিভাবতীর বাগানের রেশমের নামে পাগল! অদেখা বিভাবতীকে নিয়ে দুই দত্তভ্রাতার স্ত্রীরা নাকি প্রায় সন্ধ্যায়ই স্বামীদের সামনে অশ্রুপাত করে। নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়। কে জানে এসব কথার সত্য মিথ্যা? বাজারে হরেক গল্পও আছে বিভাবতীকে নিয়ে।
'আহা, ভারি সুন্দরী মেয়ে! চম্পক কলি গৌরবর্ণ। বৈধব্যের উপবাস সংস্কারাদি মেনে মেনে একটু শীর্ণকায়া। তবে কালো আর লম্বা চুল। বালবিধবা তবু আজো অকলঙ্ক!'
'আরে রাখো এসব বাজে কথা! যে মেয়ে কিনা একা হাতে তল্লাটের সব নামকরা রেশম কারবারিদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে, ঘরের তিন-তিনটা দাদাকে ভেড়া বানিয়ে নিজেই বাপের নাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সে মেয়ে কিনা পারে? কামরূপ-কামাখ্যা থেকে আসা ডাকিনী-যোগিনী কিনা তাই কে জানে? চাইলে ও আস্ত নবাবকে জলে গিলে খেতে পারে!'
'রাখো দেখি বাজে কথা। ঐ মেয়েকে তার জন্মের সময় থেকে চিনি। ভারি ভালো মেয়ে। এত শান্ত! আজ তার কারবার ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। তবু, আর দশটা কর্মচারী মেয়ের সাথে এক উঠোনে বসে সে আজো নিজের হাতে সুতা কাটে। আবার বিধবার আচার-বিচারে সে বামুনের মেয়ের সাথেও পাল্লা দেয়। সন্ধ্যার পর ফের বসে পাঁচালি-পুঁথি নিয়ে। নিজের হাতে ভাইয়ের ছেলেপিলেদের খাওয়ায়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি শুধু কাজ আর কাজ! তাইতে না স্বভাব-চরিত্তির ঠিক আছে!'
'একা মেয়েমানুষ—দেখব কতদিন ঠিক থাকে?'

'ঠাকুরঝি!'

বড় বৌদি বিভার ঘরে ঢুকলেন। বিভা তখন মাত্রই জলে ভেজানো সাবু দানা, কলা, নারকোলের টুকরো আর আখের গুড় মেখে একাদশী সন্ধ্যার খাবারের বন্দোবস্ত করছিল। বাবার মৃত্যুর পর প্রথম তিন বছর তা-ও একরকম চলছিল। সম্প্রতি মেজ আর ছোট দাদা আলাদা হয়েছেন। বিভাকে রেশম বাগান দেওয়ার পিতৃ সিদ্ধান্ত ও তাতে বড় দাদার অনুমোদনের বিরোধিতা করতেই তাদের আলাদা হওয়া। নবাবের দিওয়ানি বিভাগে মামলা ঠুকবে বলেও তারা হুমকি দিয়েছে। ছোটদাদা শুরুতে এমনটা ছিল না। মেজদাদাই তাকে উস্কেছে, 'বাড়ির মেয়ের গল্প হাটে-বাজারে শোনা যায় এমনটা কেউ কখনো শুনেছে? গেরস্থের মেয়ে ত' না যেন কাশিমবাজার কুঠির নাচনেওয়ালী বাঈজি!'

'শিবু, দেবু- তোরা বের হয়ে যা বলছি!' বড়দার গলার স্বর গমগম করে উঠেছিল।

মেজদার জিহ্বা কুৎসিততর হয়ে উঠেছিল, 'যাব বৈকি। তুমি না বললেও আলাদাই হয়ে যাব। বাবার শেষবয়সে ধরলো ভীমরতি...আর তুমি কি তার পুত্রসন্তান না হিজড়ে সন্তান-'

'চোপ্!'

'চোপ বললেই চোপ? আমাদের দু'ভায়ের ভাগের ধানিজমিগুলো আলাদা করে লিখে দিলেই হয়। তুমি থাকো তোমার পেয়ারের নাচনেওয়ালী বোনকে নিয়ে। তোমার আর কি? জন্ম ইস্তক হাঁপানির রোগী। কোন খাটনির কাজ করতে পারো না। তাই পাছে ছোট দুই ভাই মাথার ওপর ছড়ি ঘোরায় সেই ভয়ে ভাইদের ছেড়ে বোনকে ধরেছো এই আশায় যে অবলা মেয়েমানুষ শেষতক তোমার কথাই শুনবে! ছিঃ দাদা...আমাদের উপর আর একটু ভরসা করলে পারতে! ছেলে সন্তানকে ছেড়ে মেয়ে সন্তানকে সম্পত্তি লিখে দেবার কথা কে কবে শুনেছে?'

সেই থেকে আলাদা। আচ্ছা, মেজদার কথা কটু হলেও সত্যই হয়তো? বড়দা যদি বারোমাস হাঁপানির রোগী না হতো, তাহলে কি বাবার এই সিদ্ধান্ত এত অবলীলায় মেনে নিত? সুরা ও বাঈনাচ আসক্ত মেজো ও ছোট ছেলে আর হাঁপানিগ্রস্ত বড় ছেলেকে দেখেই কি পিতা সত্যচরণও বালবিধবা বিভাবতীর কাঁধেই চাপিয়ে দিয়েছিলেন পরিবারের সবলতম পুত্রসন্তানের দায়িত্ব? বিধবা কন্যার জীবনের নিরাপত্তার পাশাপাশি নিজ প্রাণের অধিক রেশম বাগান রক্ষার একটি গোপন উদ্বেগও কি ছিল না তাঁর? যেহেতু তিনি জানতেন যে কন্যা হলেও বিভাবতী পুত্রসন্তানের চেয়েও ধীর-স্থির, কর্তব্যনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী? তবু মানতেই হয় যে বিভা ভাগ্যবতী। তার মতো স্থৈর্য্য আর কর্তব্যবোধ নিয়ে অনেক ঘরেই

অনেক বালবিধবা থাকে। বাপ-ভাইয়ের অবহেলায় তাদের দিন শেষ হয় বাজারের কুঠিতে কোন পুরুষের রক্ষিতা হিসেবে কি আক্ষরিক অর্থেই গলায় দড়ি দিয়ে। এই চৈত্রে বিভাবতীর বয়স কুড়ি হবে। মেয়েমানুষের কুড়ি বছর কি যে সে কথা? স্বামী বেঁচে থাকলে এতদিনে সে তিন/চারটে ছেলে-মেয়ের মা হয়। তার বয়সী এ গ্রামের বহু সধবার এখনি মাই ঝুলে গেছে। কিন্তু বিভাবতী...মা হয় নি বলেই...ঠিকমতো নারী জীবন পেয়েও পায় নি বলে...সেই ন'বছর বয়স থেকে আজ এগারোটি বছর ধরে পুরুষের দায়িত্ব পালন করতে করতে...তার শরীর যেন বয়স পেরোনো কুমারীর মতো বা বন্ধ্যা রমণীর মতো দৃঢ় অথচ পেলব। ইসশ্...শুধু যদি মা ডাকটি শুনতে পেত বিভাবতী! মেজদা আর ছোটদা ত' আলাদা হয়েই গেল। ওদের ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে কে জানে? বড়দার প্রথম তিন মেয়ে হয়ে চার নম্বরে পুত্রসন্তান। তিনটি মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। এগারো, আট আর সাতে। ছেলে যদুনাথের বয়স দুই। তার দুষ্টুমি দ্যাখে কে? ফুটফুটে মুখের ছেলেটি হেসে হেসে শুধু বলে, 'পিছি- একতা গল্প বলো না!'

...তখন দিনমান রেশম সুতা কেটে, কর্মচারীদের দিয়ে জনার্দন দত্তের আদংয়ে চালান পাঠানো শেষে, টাকা-কড়ির হিসাব গোনা-গুনতির পর সন্ধ্যার ফলাহার সেরে বিভাবতী যদুনাথকে বুকে চেপে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী আর লালকমল ও নীলকমলের গল্প শোনায়। আর যেসব সন্ধ্যায় যদুনাথ দিনমান দুষ্টুমি করে ঘুমিয়ে পড়ে, সেসব সন্ধ্যায় মাটির প্রদীপে সলতেয় আলো উস্কে দিয়ে বিভাবতী রামায়ণ পড়ে। খুব বেশি পড়তে পারে না। কারণ বড় বৌদি এসে ঢোকে, 'ঠাকুর ঝি, এসো চুল বেঁধে দিই!'

বড় বৌদি তার চেয়ে অনেকটাই বড়। দশ বছরের বড় ত' হবেই। হাঁপানি রোগী স্বামীর বুকে অহোরাত্র তেল ঘষার পরও পরোক্ষভাবে এই ছোট ননদের কর্তৃত্বের সংসারে কথাবার্তায় সামান্য কূটাভাস সত্ত্বেও ননদিনীর সাথে তাঁর ব্যবহার একদম খারাপও নয়। এছাড়া বড় বৌদি ঈষৎ রঙ্গপরায়ণাও, 'আমার সন্ন্যাসিনী ননদিনী আজ কেমন আছে? সত্যি বলি আমি তোমার মতো অবস্থা হলে চরিত্র রক্ষা করতে পার্তুম না! কবে কোন্ কাঠকুড়ানীর ছেলের গলায় মালা দিয়ে ভিটে-মাটি ছেড়ে বহুদূর চলে যেতাম!'

বিভাবতী এসব কথায় সতর্ক থাকে। বৌদি কি তার মনের তলদেশের কোন খবর জানতে চায়? আবার কখনো কখনো বৌদির গলায় সত্যিকারের মমতাও জমে, 'এই চুল-এই রং-নাক-চোখ! এ জন্মে সব বিফলে গেল! হরি, আমার তিন মেয়েও ত' শ্বশুরবাড়ি। কার কপালে কি আছে কে জানে?'

কখনো কখনো বৌদি আবার সম্পূর্ণ উল্টা কথাও বলে, 'মেয়েমানুষের মুক্তি কিসে জানো? যখন সে হয় কুমারী নয় বিধবা! স্বামী থাকা মানেই রাজ্যির যন্ত্রণা! এই যে তুমি...কোন পুরুষ মানুষের ধারটি ধারতে হয় না...নিজেই নিজের

কর্তা...বলি, তুমি সধবা থাকলে বাবা কি তোমাকে এত কিছু দিয়ে যেতেন? আর সধবা মানে শুধু স্বামীর মন যোগাও! শুধু স্বামীর মন যোগাও!'
বিভাবতী নিজেও একথা বহুবার ভেবেছে। সধবা হলেই কি খুব ভাল থাকতো সে? সারাদিন চোদ্দটা মানুষের রান্না, বছর বছর বাচ্চা...তাতেই বা কি এমন হাতি-ঘোড়া আসত যেত বিভাবতীর? আর সবাই যে বলে শরীর! কই, তেমন কোন ডাকই যে সে নিজের ভেতর শুনতে পায় না!
'ঠাকুরঝি! খবর শুনেছো গো?'
পঞ্চমবারের মতো অন্তর্বর্ত্নী বড় বৌদি ঘরে ঢোকে।
'কি খবর না বললে বুঝি কি করে?'
'আর বোলো না- তোমার বড় দাদা সাম্বৎসরিক হাঁপানি রোগী হলে কি হয়...শরীর একটু ভাল ঠেকলেই ওনার চণ্ডীমণ্ডপের তাসের আসর ঠিক আছে। আজ সেখানে গিয়েই শুনতে পেয়েছেন যে কোথাকার কোন্ বর্গী সৈন্যরা নাকি এই গঙ্গার পশ্চিমের ধারের সব গ্রামগুলোতে আগুন দিতে দিতে ছুটে আসছে। বীরভূমের অনেক রেশমের আদং নাকি এর ভেতরেই ওরা লুট করেছে। তাঁতীরা সব এদিক ওদিক পালাচ্ছে। আমাদের গ্রামেও নাকি আসতে দেরি নেই?'

এমন কথা এর ভেতর বিভাবতীর কানেও এসেছে। ঘরে থেকেই দিনরাত বাইরের সাথে ম্যালা কারবার তার। তার কারখানার পুরুষ তাঁতী আর ফেরিঅলারা যারা তার কাছ থেকে কাপড় নিয়ে জনার্দন দত্তের ছেলেদের আদং অবধি যায়, তাদের কাছ থেকেই তাঁরা শুনেছে যে মারাঠা বর্গীরা ছুটে আসছে মশাল আর তলোয়ার হাতে। রেশম কুঠিগুলো লুট হয়ে যাচ্ছে মালদা, বর্দ্ধমান থেকে বীরভূম অবধি। এরপর তারা ঢুকে পড়বে রাজশাহী পর্যন্ত। তাঁতীরা নাকি এর মধ্যেই প্রাণ ভয়ে সব পালাচ্ছে। বড় শহরগুলোয় ধান-চালের গুদাম বা আড়তগুলোও লুট হয়ে যাচ্ছে। সেই আগুন কি বীরভূম আর মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী এই রাধানগর গ্রাম পর্যন্ত ধেয়ে আসবে?

৫

দাক্ষিণাত্যের ঘোড়াগুলো একটু হাল্কা গড়নের হয়ে থাকে। সামনের পা দু'টো তাদের ছুটে চলার সময় অধিকাংশ সময়েই শূন্যে ভেসে থাকে। শুকনার মৌসুমে তাই মারহাট্টা বাহিনীকে আর দেখতে হয় না! তাদের দক্ষিণী ঘোড়াগুলো শত্রুব্যূহ ভেদ করে, শত্রু সৈন্য ছিন্নভিন্ন করে বাতাসে সমানে ছুটতে থাকে। বাংলার নবাবও কম সমরকুশলী নন। তিনি জানেন ইতিহাসের আদি পর্ব থেকেই পাঞ্জাব, উত্তর ভারত, সিন্ধু, দাক্ষিণাত্য, আফগানিস্তান, পারস্য, আরব কি মধ্য এশিয়া থেকে বহিরাগত যে বাহিনীই এখানে এসেছে, বাংলার বৃষ্টি আর নদ-

নদীই তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া এই সমতলের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর উপর লুট-তরাজ, অগ্নিসংযোগ কি খুন-খারাবি চালানো কি আর এমন কষ্টের? কাটোয়ায় ভাস্কর পণ্ডিতের মারহাট্টা বাহিনী দু-তিন মাস হয় তাম্বু খাটিয়ে একটু যে শান্ত সে অন্য কোন কারণে নয়। বর্ষা এখনো শেষ হয় নি। পথঘাটে এখনো কাদা শুকায়নি। শুধু দক্ষিণী নয়, পৃথিবীর কোন দেশের ঘোড়াই এখন বাংলার পথে এসে সুবিধা করতে পারবে না। ওদের পাল্টা আঘাত হানার এখনি সময়। সুরনাথের মনে থেকে থেকেই ক'দিন কুডাক ডাকছিল। আলীবর্দী খানকে এক দফা হারানো, হুগলির মদ্যপ ফৌজদারকে আটক করা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান আর বীরভূমের কিছু রেশম কুঠি আর চালের আড়ত লুট করাই কি যুদ্ধে জেতা? কিন্তু সুরনাথ মারাঠা সেনাবাহিনীর এক বারগির মাত্র। যতই তার বন্দুকের নিশানা অব্যর্থ হোক, যতই আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে ঘোড়া তার চাবুকের নিচে ছুটে চলুক...সে কি সত্যিই ক্ষমতা রাখে স্বয়ং ভাস্কর পণ্ডিত কিম্বা শেষ রাওয়ের কাছে গিয়ে যুদ্ধ সাজানোর বুদ্ধি বাতলাতে? তাকে বেকুব বা বেয়াদব ভাববে না সেনাপতিরা? তখন হয়তো এই ছোট-খাট চাকরিটাই চলে যাবে।

...সুরনাথের অনুমান ফলেছিল। সেদিন মাঝরাতের দিকে বৃষ্টি হয়ে ভোর রাতে বৃষ্টির ছাঁট কমে এসেছিল। হঠাৎই বাংলার নবাবের বাহিনী বজ্র বৃষ্টির মতো আচমকা আছড়ে পড়লো তাদের শিবিরের উপর। তাঁবু আর লুটের মাল ফেলে বারগিরদের ছুটতে হলো এদিক ওদিক। অবশ্য বাংলার সীমান্তের প্রতিটি জায়গাতেই ভাস্কর পণ্ডিত ইতোমধ্যেই কিছু বাড়তি সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছিলেন। ক্ষুব্ধ ভাস্কর দূত পাঠিয়ে তাদের সবাইকে জড়ো করে কাটোয়া থেকে পলায়নপর বারগিরদের নিয়ে ছুটলেন মেদিনীপুরের দিকে। ওদিকটায় বাংলার নবাবের সৈন্য তেমন মোতায়েন নেই বলেই আগেই খবর পেয়েছেন তিনি।

৬

*খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে,*
*বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?*

...নিচু স্বরে আর ভীরু গলায় এদিক ওদিক চেয়ে, খোকার পিঠে মৃদু চাপড়ে গান গাইতে থাকে বিভাবতী। দস্যি খোকা খুকুদের কিছুতেই যখন আর ঘুম পাড়ানো যায় না, তখন এই বর্গীর নয়া গান গাইলে নাকি ছেলে মেয়ে শান্ত হয়ে যায়। বিভাবতী নিজে মা না হলেও গেল ক'দিন ধরে পাড়ায় আশপাশের মা-মাসি-পিসি-খুড়ি-জ্যাঠি-দিদিমা-ঠাকুমাদের দুষ্টু বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে এই গানই

গাইতে দেখছে। বলতে গেলে বীরভূম আর মেদিনীপুরের সীমান্তের গ্রাম রাধানগরের অধিকাংশ মানুষ গঙ্গার পূর্ব দিকে চলে গেছে। গোটা গ্রামই শূন্য। হাঁপানি রোগী বড় দাদা আর পঞ্চম বারের মত অন্তঃসত্ত্বা বৌদি যিনি এখন গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে, বড় দাদার দুই বছরের পুত্রসন্তানকে নিয়ে একা বিভাবতী কোথায় পালাবে? তবু পালাতে হবে বৈকি। রাধানগর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরেই তাদের মামাবাড়ি নয়নগড়ে আজ সন্ধ্যার ভেতরেই গা ঢাকা দিতে হবে। ঘরের কাজের লোক সব পালিয়েছে। বাবার সময় থেকে বিভাবতীদের রেশম কুঠির বিশ্বস্ত পাহারাদার জয়নাল সর্দার অবশ্য এই বিপদে বিভাবতীদের ছেড়ে পালায় নি। হয়তো মুসলমান বলেই জয়নাল চাচার ভয়-ডর কম। কিছুটা ডাকা বুকা আর দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। জয়নাল চাচাই আজ সন্ধ্যায় একটি গরুর গাড়ি এনে বিভাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে মামাবাড়ি নয়নগড়ে। নয়তো হাঁপানি রোগী বড় দাদা আর আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা বৌদি ও দু'বছরের খোকার সাধ্য কি পায়ে হেঁটে কোথাও যায়?

'উমম্‌ম্...মা...' খোকা তারস্বরে চেঁচায়। ক'দিন হয় রেশমের কাজ সবই পড়ে আছে। বড় বউদির হাতে-পায়ে জল আসায় বেচারা একটু শুয়েছে। খোকাকে তাই বিভারই দেখতে হয়। বিকালের আগেই তারা সবাই যদি গরুর গাড়ি চাপে, তাহলে অসুস্থ দাদা বউদির একটু বিশ্রাম নিয়ে নেওয়াই ভাল।

'পিছি, খেলা কব্বো। আমাকে একটু উঠানে নিয়ে চলো!'

'না- উঠানে রোদ। লক্ষ্মী খোকন, গান শোন বাবা।'

বিভা আবার গান ধরে, *ধান ফুরালো পান ফুরালো, খাজনার উপায় কি? আর ক'টা দিন সবুর করো, রসুন বুনেছি।*

'উঠানে যাবো।'

খোকা বিভার কোলে হাত-পা ছুঁড়ে তারস্বরে চেঁচায়।

'ওরে বাবারে! যাচ্ছি- চল্, তোকে বর্গীর হাতেই দিতে হয়!'

সাদা শাড়ি কালো পাড় এক হাতে গোড়ালি থেকে সামান্য তুলে, আর এক হাতে খোকাকে কোলে চেপে ধরে উঠানে বের হয় বিভাবতী। সত্যি সত্যিই কি দশা ঘর-বাড়ির! ঘরে কাজের লোক না থাকায় উঠান লেপা হচ্ছে না বেশ কিছুদিন। ধান সেদ্ধ করে উঠানে রোদে দেবারও কেউ নেই। বর্গী আসার আতঙ্কে এই দিন পনেরোতেই গ্রামটা দেখতে দেখতে ভুতুড়ে বাড়ি হয়ে উঠলো। অবস্থা এমন যে সারা দিন-রাত দরজা-জানালা আটকে থেকে, নিজের বাড়ির উঠানে দিনে-দুপুরে পা রাখতেই ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছে বিভাবতী। অন্য সময় সে ভিটের পেছনে কারখানা, আরো খানিকটা দূরে রেশম বাগান, পুকুর, গ্রামের বাঁশবাগান, মন্দির, তাদের ভিটের সাথে লাগোয়া সব্জি ক্ষেতে ঘুরে বেড়ায়। হাজার হোক সে এ গ্রামের মেয়ে। বউ ত' নয়। তার ঘুরে বেড়াতে খুব সমস্যা নেই। খোকার

দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠানে নামতেই বিভার খেয়াল হয় কিছুক্ষণ আগে খিড়কি দুয়ারের পেছনের ঠাণ্ডা কুয়োর জলে স্নান করে অবধি চুল তার এখনো শুকায় নি বলেই বাঁধাও হয় নি। দুপুর বেলায় অন্য সময় মেয়ে-বউরা ভেজা চুল উঠানে শুকায়। এটাই নিয়ম। কিন্তু এই পোড়ো গ্রামে দুপুর বেলা সে এই বয়সের মেয়ে খোলা চুল ছেড়ে নেমেছে...

'ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি।

রাম-লক্ষণ বুকে আছেন, ভয়টা আবার কি?'

...নিজে নিজেই বিড়বিড় করতে করতে বিভা খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে উঠানে দাঁড় করাতে গেলে খোকা আবার কেঁদে ওঠে, 'নামবো না!'

এবার বিভা সত্যিই বিরক্ত হয়। এক হাতে ভেজা চুলগুলো এলো খোঁপা করতে করতেই খোকার পিঠে মৃদু একটা চাপড় মারে সে, 'যা পাজি ছেলে! এক মূহূর্ত শান্তি নেই!'

খোকা এবার দ্বিগুণ রোষে হাত-পা ছোঁড়ে, 'মা- পিছি আমাকে মেরেছে-'

'বজ্জাত ছেলে! আবার নালিশ!' বলতে না বলতেই বিভার হঠাৎই মনে হয়...কি আর মনে হবে...চোখের সামনে স্পষ্টতই কয়েকটা লম্বা আর কালো রঙের মানুষ এসে খাড়া হলো। তাদের দিকে চোখ তুলে না চাইলেও উঠানে দুপুরের রোদে তাদের ছায়া ত' পড়েছে। মানুষগুলোর কপালে রক্ত চন্দনের তিলক। মাটির ওপর দাঁড়ানো হলেও দশ/বারো জনের এই দলের সাথে তিন/চারটা ঘোড়াও আছে। নিজেদের ভেতর ভিন্ন এক ভাষায় কথা বলছে তারা। ছোরা, ত্রিশূল আর বন্দুকও আছে দেখি একজনের সাথে। ...কি করবে? দৌড়ে কি পালাবে এখন বিভা? কোনদিকেই বা পালাবে? শেষপর্যন্ত তার অদৃষ্টে এই ছিল? এই গ্রাম কিম্বা পাশের গ্রাম কিম্বা পাশের গ্রামের পাশের গ্রামের কোন্ নারী কয় পুরুষ আগে কখনো মোগল, কখনো পাঠান, কখনো ফিরিঙ্গি কি কখনো মগের ছোঁয়া লেগে জাতে ভ্রষ্ট হয়েছে, হয়েছে কুলের কলঙ্ক, লুণ্ঠিতা হয়ে চিরতরে ভ্রষ্ট হয়েছে আর সেই সাথে ভ্রষ্ট হয়েছে, শাপগ্রস্ত হয়েছে তাদের চোদ্দ পুরুষ...সেই সব মেয়েরা যারা কেউ পাঠান বা মোগল সৈন্যের বউ হয়েছে, হয়েছে মগ বা ফিরিঙ্গির বউ...চিরতরে জন্মভূমি যাদের ছাড়তে হয়েছে এবং যাদের আর কখনোই দেখা যায় নি...সেই সব নারীদের বিদেশি পুরুষের হাতে লুণ্ঠনের খবর বা গল্প বা রূপকথা শীতের রোদে উঠানে বসে পাড়ার মা-দিদিমা-জ্যেঠিমা-খুড়িমাদের কাছ থেকে শুনতে শুনতে কখনো সেই মেয়েদের প্রতি দুঃখ, কখনো বিজাতীয় পুরুষের হাতে নিগৃহীত হওয়ায় তাদের প্রতি ঘৃণা আবার কখনো বুঝি গা ছমছম করেছে অজানা আনন্দেই...চারপাশের তামাক খাওয়া, বউ পেটানো গৃহস্থ পুরুষেরা নয়...কোন্ অচেনা পুরুষের ঘোড়ায় চেপে বহু পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যে মেয়েরা বিদেশ বিভুঁইয়ে চলে গেছে বা যেতে হয়েছে যাদের তারা বুঝি রূপকথার রাজকুমারীদেরই মতো হবে...বিভাবতীরও

যদি অমনটি হতো...ছিঃ কি অলক্ষুণে ভাবনা! একে ত' বিধবা মেয়ে, তাতে যত রাজ্যের মন্দ চিন্তা! ছিঃ বিভাবতী! তোর মরণ নেই? মরণ মরণ করতে করতেই কি মরণ এভাবে সাক্ষাৎ সামনে এসে খাড়া হয়? আরো দ্যাখো মাত্রই না চুল বাঁধতে দু'হাত তুলেছে সে। তার আঁচল কি বুকের উপর থেকে একটু সরেছে? আর যমদূতের মতো এতগুলো বিদেশি পুরুষ? বাবা সত্যচরণ বসাক, ঠাকুরদা লক্ষ্মীরঞ্জন বসাক, ঠাকুরদার বাবা কৃপাসিন্ধু বসাক, তারও উপরে স্বর্গত কমলপ্রসাদ বসাক...সাত পুরুষের নাম জানে বিভাবতী...বাবা শিখিয়েছিলেন...সবাই কি আজ বিভারই দেহটির দোষে নরকবাসী হবে? তবে কেন এতদিন আচারে সংস্কারে নিজেকে এত শক্ত করে বেঁধে রেখেছিল সে? যদি এই তার অন্তিম পরিণতি হয়? যদি এমন মৃত্যুদূতের মতো...এরাই নিশ্চয়ই বর্গী...দশ/বারো জনা বর্গী সৈন্য তলোয়ার আর ঘোড়া নিয়ে ঠিক তারই বিরান উঠানের রোদে, তারই সামনে এসে দাঁড়ায়? যখন সাদা থান পরনে হলেও তার লম্বা আর কালো, রিঠা ঘষা চুলগুলো সমানে দুপুরের বাতাসে উড়ছে? আর যখন খোঁপা বাঁধার জন্য হাত উঁচু করতে গিয়ে স্পষ্টতই বুকের আঁচল হয়তো একটু সরে গেছে? দুপুরের রোদে ঝলসে উঠেছে তার কাঁচা হলুদ রং?

'বাবা- মা-' বিভা চোখ বুজে উঠানের মাটি দুই পায়ে চেপে ধরার শেষ চেষ্টা করে। মা ত' কোন্ শৈশবেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে! মা যদি সেদিন বিভাকেও তার সাথে করে স্বর্গে নিয়ে যেতেন, তবে আজ চোদ্দ পুরুষকে নরকবাসী করার দায় একা তার ঘাড়ে বর্তায় না!

৭

মানুষের জীবন সত্যিই বড় অদ্ভুত। এই যে বিদেশি মানুষটা যার ভাষা জানে না বিভা...যার কথা বোঝে না বা বলতে পারে না...লোকটিরও বাংলা নিয়ে প্রায় একই অবস্থা...তার সাথে আজো বিভার কি সম্পর্ক তা-ও নিশ্চিত নয়...তবু, দ্যাখো হয়ত সেই বিভার জীবনের প্রথম পুরুষ...এই ভাবনা ভাবতে গিয়ে পুনরায় গোটা শরীর ত্রাসে কেঁপে উঠল কি তার? না, আনন্দের কাঁপুনি এটা বিভা। মনকে মিথ্যা বলে কি লাভ? বিভার স্বামী ত' নাবালক অবস্থায়ই মরেছে। তখন বিভাও নাবালিকা। গ্রামে বাবার বাসায় যখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে সে, যৌবন ঝলসে উঠেছে শরীরে...আশপাশের অনেক প্রতিবেশী এমনকি আত্মীয় পুরুষের চোখেও লোভ ছিল...ইশারায় আমন্ত্রণ ছিল...তাদের কাউকেই পুরুষ হিসেবে চোখেই লাগে নি তার। শরীর যেন বেড়ে উঠেছিল শরীরের মতই স্রেফ আপনমনে। কিন্তু সেই শরীরে বিভাবতীর নিজস্ব নারী মন বা মনটির বেদনা তখনো জড়িত হয় নি। জড়িত হয় নি কোন আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা প্রসূত

হাহাকার। যুবতীর শরীরে পরিশ্রমী কিশোরী কি হাসিখুশি এক শিশুই ছিল বোধ করি। বয়স্কদের অর্থ-কড়ি, রেশম-ধানের কারবারের অঙ্ক নিয়ে ভাবনা বা উদ্বেগ শিখে উঠলেও তখনো শরীর নিয়ে কোন উদ্বেগ হয় নি তার। তবু, এহেন উদ্বেগহীন আর শরীর থেকেও শরীরহীন বিভার শরীরের উঠানেই বছরখানেক আগের দুপুরে আছড়ে পড়েছিল দশ বারোজন সশস্ত্র বর্গী।

...পরপর কিসব বীভৎস ঘটনাই ঘটে গেল এক দুপুরে! সেই জনা দশ বারো বর্গী প্রথমে তাদের নিজস্ব ভাষায় খুব ধমকে কি কি জানি বলেছিল বিভাকে। তারপর বিভার চোখের সামনেই 'পিছি!' 'পিছি!' বলে জড়িয়ে ধরতে আসা খোকন এবং ঘরের ভিতর ঢুকে হাঁপানি রোগী দাদা আর গর্ভবতী বৌদিকে টেনে-হিঁচড়ে উঠানে বের করে এনে পিছমোড়া বেঁধে ফেলল। রূপার লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিমা লুট হলো। লুট হলো বাড়ির মেয়েদের সোনার গহনার বাক্স। তাদের ভিটে লাগোয়া ছোট্ট রেশম কুটিরের রেশমি যত থানকাপড়। এই করতে করতে বিকেলের ছায়া গড়িয়ে আসা অবধি উঠানের উপর বিভা ক্ষণে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ক্ষণেই সংজ্ঞা হারাচ্ছিল। না, তলোয়ার হাতে এক বর্গী তাকে ক্রমাগত পাহারা দিয়ে চললেও তখনো সৈনিকেরা তার গায়ে হাতটি রাখে নি। কিন্তু এ বাড়ির সব সম্পদ লুট হলে পর...সন্ধ্যা প্রসারিত হবার আগেই...বিভার ব্যাপারে তারা সচেতন হলো...তিন/চারজন মিলে তাকে টানতে যাবার সময়ই এই দু-তিন ঘণ্টা একটা ঘোড়ায় বসে যে লোকটি সবকিছু দেখছিল...যে এই বাড়ির একটি সুতাও স্পর্শ করে নি কিন্তু হয়তো সে-ই এই জনা দশ-বারো মানুষের নেতা...সে হঠাৎই প্রবল হুঙ্কার দিয়ে উঠলো! যারা বিভাকে টানছিল, তারা সর্দারের ধমকেও আকর্ণবিস্তৃত হাসলো। কি জানি বললো তারা তাদের সর্দারকে। সর্দার পাল্টা কি বলায় লোকগুলো একদম নরম হয়ে, সর্দারকে পাল্টা কুর্নিশ করে...পারলে বিভাকেও কুর্নিশ করে...এমন যত্নের সাথে তাকে উঠিয়ে দিল আর একটি ঘোড়ায়। পুনরায় বিভাকে তারা ঘোড়ায় তুলে দিয়েছিল আর সেই ঘোড়া ছুট লাগায় জনশূন্য রাধানগর গ্রামের পরিত্যক্ত যত বাগান, ফসলি জমি আর জলাজমি ছাড়িয়ে দূরে...

সেই সন্ধ্যাতেই তার বিশ বছরের জীবনে প্রথম তন্দ্রা ও জাগরণ, চেতন-অচেতন, মৃত্যু ও জীবনের ভেতরকার ভারি সঙ্কীর্ণ ও অপরিসর সাঁকোর ভেতর দিয়ে, ঘোড়ার পিঠে ও একদল অচেনা আর সশস্ত্র পুরুষের প্রহরায় অজানা পথে ছুটে যেতে যেতে বিভা উপলব্ধি করেছিল...তার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায় রক্তের উল্লাসে অনুভব করেছিল...সামনের ঘোড়ায় এই দলের সর্দার যে যুবকটি...তলোয়ার-মশাল-বন্দুকে আপাত ভয়ঙ্কর এই মানুষটি যতক্ষণ বেঁচে আছে...এই লম্বা, ঈষৎ শ্যামলা আর কাটা কাটা চোখ-মুখের ছেলেটি তাকে ঘিরে

থাকবে প্রবল মমতায়...মেয়ে হয়েও রেশম বাগানে দিনরাত গুটিপোকা বাছা, সুতা কাটা, তাঁতী আর ফিরিঅলাদের সাথে টাকা নিয়ে ঝগড়া, হাঁপানি রোগী দাদার ধানি জমির বর্গাদারদেরও দেখভাল করে দিনকে দিন পুরুষ হয়ে ওঠার কাল চলে গিয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে এ তাবৎকাল তার অজানা ও অদেখা কোন সুর...যা তাকে নুইয়ে দিচ্ছে কষ্টে, ভয়ে ও উল্লাসে...ঘোড়ার পিঠের প্রবল দুলুনিতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

'মাইজি!'

উড়িয়া মাঝি কিছু বলে যার অধিকাংশই বিভাবতী বোঝে না। সুরনাথই কি বোঝে? চারপাশে বিস্তীর্ণ হ্রদ। চিল্কার হ্রদ কি? সকাল পার হয়ে দুপুর আসছে। সুরনাথ বিভাবতীর দিকে চেয়ে একটু হাসে। এবার বিভাবতীরও হাসি এলো। দেড় বছর আগের সেই জীবন মৃত্যুর হিসেবের বাইরের দুপুর গড়ানো সন্ধ্যায় ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতুষ্পুত্রর চোখের সামনে যে বিভাবতীকে বর্গীরা তুলে দিয়েছিল একটি ঘোড়ায়, আরো কতক্ষণ পর কে জানে সেই ঘোড়সওয়াররা পৌঁছে গিয়েছিল এক খোলা মাঠে! সেখানে সার সার কাপড়ের তাঁবু যার চারপাশে আগুন জ্বলছিল। সর্দার যুবকটি বিভাবতীকে নিয়ে গেল এক মাঝবয়সী লোকের সামনে। মাথা নুইয়ে কিছু বলার সময়েও অন্ধকারে তাঁবুর পাশে জ্বালানো আগুনে যুবকের মুখের বিষাদ স্পষ্ট পড়তে পারছিল বিভা। কি চাইছে এই ছেলে? এই মাঝবয়সী লোকটির হাতে বিভাকে সে তুলে দিতে চাইছে? কিন্তু মাঝবয়সী লোকটি হাসল। হাত নেড়ে কি যেন সে বললো যুবককে। যুবকের সঙ্গীরা সে কথায় হা-হা- করে হেসে উঠেছিল। আর যাকে উদ্দেশ্য করে হাসা হলো, সে তার লম্বা মাথাটি নুইয়ে ফেললো লজ্জায়। সঙ্গীরা কনুই দিয়ে খোঁচা দিয়ে যুবককে তাদের ভাষায় কি যেন বলেই চললো, বিভার দিকে আঙুল তুলে দেখাতে লাগলো...বিভা কিছু বুঝলো আবার বুঝলো না...রাতে তাকে ঘুমাতে দেওয়া হলো সর্দার যুবকটির সাথে একই তাঁবুতে। তার আগে তাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল। বিভা ততক্ষণে বুঝেছে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন আর গ্রন্থিহীন জীবনের পাকে সে জড়িয়ে যাচ্ছে যেখানে ফেলে আসা জীবনের কোন রীতি-নীতিই খাটবে না। এখানে এই তাঁবুগুলোয় প্রচুর বাঙালি মেয়েকে দেখতে পেল সে। তাদের কেউ কেউ তারই মতো সম্পূর্ণ নতুন। কান্না হাসির ভেদাভেদ ভুলে তারই মতো স্তব্ধ হয়ে আছে সেই নতুন মেয়েরা। কোন কোন মেয়ে আবার এরই ভেতর মানিয়ে নিয়েছে। তারা হাসি-ঠাট্টা করছে; সাথের বিদেশি ও বিভাষী পুরুষের জন্য রান্নাও চাপাচ্ছে। একটু সুশ্রী চেহারার মেয়েরা হয়তো একটি তাঁবুতে একজনের সাথে থাকছে। সাধারণ চেহারার মেয়েরা একাই থাকছে তিন/চারজনের তাঁবুতে। যে মাঝবয়সী লোকটির সামনে যুবক সর্দার তাকে প্রথমে নিয়ে গেছিল, তার পাশে এক অসম্ভব সুন্দরী নারী। আদ্যোপান্ত সে

মখমলের ঘাগড়া আর জড়োয়া গয়নায় ঝলমল করছে। তাঁতী ঘরের বালবিধবা বিভাবতী এমন পোশাকের মেয়েমানুষ জন্ম ইস্তক দ্যাখেই নি! অনেক পরে সে জেনেছিল ঐ মেয়ে এক নামকরা নাচনেওয়ালী ও এবারের বাংলায় যুদ্ধ অভিযানে শেষ রাওয়ের সঙ্গিনী। যুবক সর্দার...তার নাম বুঝি সুরনাথ...এ নামেই সবাই ডাকছে তাকে আর এ নামেই সে সাড়াও দিচ্ছে...ইতস্তত ভঙ্গিতে নিজেই একটা শালপাতার ঠোঙায় কিছু খাবার এনে রাখলো বিভাবতীর সামনে। হাত দিয়ে ইশারা করে সে, 'খাও!'

...বিভাবতী তার ভেজা দু'টো চোখ তুলে পুনরায় সুরনাথের দিকে তাকায়।

'আরে খাও!' সুরনাথ এমন কোন ইশারা পুনরায় করতে গিয়েই থমকে যায়। বুঝি বা তার মনে পড়ে যায় ঘন্টা কয়েক আগেই সে ও তার সঙ্গীরা এই তরুণী বিধবার বাড়িতে হামলা চালিয়ে...কি সম্পর্ক এই মেয়ের সাথে সেই গর্ভবতী নারী, এক শ্বাসকষ্ট রোগী পুরুষ ও একটি ছোট বাচ্চার সাথে সে জানে না...তিন/তিনটি প্রাণীকে হাত-পা বেঁধে, রূপার দেবমূর্তি থেকে শুরু করে কয়েক মণ রেশম আর সোনা-দানা লুট করে এই মেয়েকে নিয়ে এসে তাকে খেতে বলাটা হয়তো ঠিক নয়। মেয়েটি বিধবা কেন? বাংলায় বালবিধবার সংখ্যা বেশি। যদিও এখানকার পুরুষরা যুদ্ধ করে না। এখানকার ধানি জমি আর বৃষ্টির দিনে ছোট ছোট সাদা লাল পদ্মের মতো এক ধরনের ফুলে ছেয়ে যাওয়া জলের মতোই মেয়েরাও এখানে অকৃপণ রূপসী। এই রূপসীকে বিধবা বানিয়ে ভগবানের কোন্ উদ্দেশ্য সফল হয়? কুমারীকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া গেলেও বিধবাকে কি বিয়ে করা যায়? বিধবার জীবনে স্বামীর পরেও অন্য কোন পুরুষের সংসর্গ ঘটলে তার জায়গা আর সংসারের বাইরেই! সুরনাথ এই বাঙালি বিধবার জীবনে কোন্ অনিষ্ট করতে এই বাংলায় এসেছে?

'সুরনাথ!' কেউ সজোরে হাঁক পাড়লে সে সেদিকে চলে যায়। অন্য এক ফৌজি এসে বিভাবতীকে একটি তাঁবুর ভেতর আঙুল নির্দেশ করে বসতে বলে। গুটিসুটি সেখানেই বসেছিল বিভাবতী। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে জানে না। যখন ঘুম ভাঙ্গে, নিজেকে সে তখন আবিষ্কার করে তার দিকে ধ্যানস্থ মুগ্ধতায় তাকিয়ে রয়েছে সুরনাথ। বিভাবতী বুঝলো এতক্ষণ তার ঘুমন্ত মুখের দিকে প্রবল মোহ আর বিস্ময়ে চেয়ে দেখছিল সুরনাথ। এভাবেই শুরু। শুরুতে দাদা, বৌদি আর ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা মনে পড়ে প্রবল কষ্ট হতো বিভাবতীর। ইচ্ছা হতো না সুরনাথদের কাউকেই সে ক্ষমা করে। পরে ধীরে ধীরে মনে হলো বা তার মনে হতে থাকলো যে বাবা মা'র মৃত্যুর সাথে সাথে সংসারে তাকে ভালবাসার কেউই তেমন ছিল না। হাঁপানি রোগী দাদা তার ঘাড়ে সব পরিশ্রম চাপিয়ে নিশ্চিত ছিলেন। বৌদি বিধবা ননদিনীর কোন দোষ না পেয়েও তার চরিত্র নিয়ে সদা কটাক্ষ মুখরা ছিল। বরং এই দস্যু সুরনাথ তাকে ভালবাসে। যদি সে ভালবাসা খুব ক্ষণস্থায়ীও হয়...তবু...

৮

শ্রাবণের শেষ থেকে মাঘের শুরু। এই চার/পাঁচ মাসেই আমূল বদলে গেছে বৈকি বিভাবতীর জীবন। আর জীবন সম্পর্কে যেসব কথা সে এতদিন ধরে শিখেছে সেসবও। শিবিরে শিবিরে কিছু বর্গী পুরুষের সাথে তারা কিছু বাঙালি মেয়েও চলেছে। কেউ ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আবার কারো কারো...শুনতে ঘৃণা লাগতে পারে...প্রেম হয়েছে। বিভাবতীর যেমন হয়েছে সুরনাথের সঙ্গে। সত্যি বলতে এমন সুখী কখনো সে ছিল না। যদিও সুরনাথ তার স্বামী নয়। নিজেদের ভেতর পরস্পর যেটুকু ভাঙা মারাঠি আর ভাঙা বাংলা তারা বলতে শিখেছে, তাতে বিভাবতী জেনে গেছে যে দূর মহারাষ্ট্রের পুনার এক গ্রামে সুরনাথের বিয়ে করা বউ সাবিত্রী আর দু'টো ছেলেও আছে। বিধবা বিভাবতী যদি কুমারীও হতো, তবু সুরনাথ তাকে বিয়ে করে অন্তত দ্বিতীয় স্ত্রী করতে পারতো। কিন্তু বিধবাকে কি করে বিয়ে করে? যতদিন এই যুদ্ধ আছে, ততদিন সুরনাথ তার পাশে আছে। যুদ্ধের শেষে সুরনাথ যদি তার দেশে ফিরে যায়...এখানটায় এসে তাঁবুর ভেতর বসে মাথা একদম ধরে যায় বিভাবতীর...কি হবে তখন? সে জানে সে সুরনাথের বিবাহিতা স্ত্রী নয়, কিন্তু কিকরেই বা ভাবে যে সে নিছকই রক্ষিতা? আর যদি সুরনাথের সাথে যৌথতার...বিভাবতীর জীবনে পুরুষের সাথে প্রথম যৌথতার এই যাপনকে সমাজ যদি 'রক্ষিতা'র জীবনই বলে...বিভাবতীর কঠোর তপস্যার বৈধব্য কি এমন ভাল ছিল? এখানে সুরনাথের সাথে থাকতে শুরু করার ক'দিনের ভেতরেই তার সাদা থান ঘুচে গেছে। সারা বাংলার লুট করা বিবিধ বর্ণের রেশম শাড়ি উঠেছে তার গায়ে, বিবিধ গহনা ও আভরণ। এই শিবিরে গত পাঁচ/ছ'মাসে তার চোখের সামনেই এক একজন বর্গী পুরুষ...নাকি বারগির...বারগিররা তিন-চার বার করে তাদের সঙ্গিনী বদলালো...সুরনাথ ত' তাকে এখনো ছেড়ে দেয় নি...কিন্তু ছাড়তে কতক্ষণ? আচ্ছা যখন ছাড়বে তখন না হয় কাঁদবে বিভাবতী। আপাতত সে হাসবেই বরং। কখনো এত ভাল কেউ বাসেনি তাকে যেমন সুরনাথ বেসেছে। যদি সেই ভালবাসা অভিনয়ও হয়। সুরনাথ মাঝে মাঝে কি কি যেন বলে তাকে। নিজের ভাষায় পাগলের মতো আদর করতে করতে। পূজার জন্য তোলা সকালের প্রথম ফুলের মতো নরম সেই সব স্পর্শে সুরনাথেরও কি কোন আর্তি, কোন প্রেম নেই? হতেই পারে না। আর যে এত কোমল, এতটাই নিবেদিত ভালবাসার মূহূর্তগুলোয়...সে কি সত্যিই ভালবাসে দেশে ফেলে আসা তার স্ত্রীকে? ওহ্, সুরনাথের শরীরে পৈতা দেখেছে বিভাবতী। সুরনাথ কি জানে সে তাঁতীর মেয়ে? জানলেই বা। বিয়ে করার দায় যেহেতু নেই, কাজেই সে রাজকন্যা হোক আর চণ্ডালকন্যাই হোক...কি যায় আসে?

'বিভাবতী!'

সুরনাথ অস্ফুটে শ্বাস ফ্যালে। ঘুমন্ত বিভাবতীর অজস্র চুলে ঠোঁট রেখে সে সারারাত ফিসফিস করে চলে, 'আমি কি করব তোমাকে নিয়ে? স্বয়ং শেষ রাও তোমার কারণে আমার উপর বিরক্ত। ওদের কথা হলো যুদ্ধের সময় যোদ্ধারা এমন হাজার হাজার মেয়ে পায়। কয়েকদিন আনন্দ করে ছেড়ে দ্যায়। তোমাকে আমার ভালবাসা, তোমাকে আমার ছাড়তে না পারায় তারা আমাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু আমি কি করি বলো? সতেরো বছর বয়সে যে মেয়েটির সাথে দেশে আমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল...তখনো আমি পুরোপুরি পুরুষ হয়ে উঠি নি...কিছু বুঝতে পারার আগেই তার সাথে আমার থাকা শুরু হয়...সন্তানের জন্ম দিতে হয়...তার ভেতর কোন আনন্দ ছিল না! কিন্তু তোমাকে যে মুহূর্তে আমি প্রথম দেখি...সাদা শাড়ি আর এলো চুলে...আমি আমার সমস্ত শরীরে সেদিন প্রথম আনন্দ পাই...তোমাকে শিবিরে আনার এক মাসের মাথায় ভোররাতে মশালের আলোয় তোমাকে যখন প্রথম আলিঙ্গন করি...ঘ্রাণ নিই তোমার দীর্ঘ কালো চুলের...বাংলার লাল রেশমের শাড়িতে তোমাকে প্রথম যেদিন সাজাই...আমার আর পুনায় ফিরে যেতে ইচ্ছাই করে না...ভয় লাগে, ঘৃণা লাগে সেকথা ভাবলে...যদিও দুই ছেলে আছে আমার...কিন্তু বাংলার কোন গ্রাম কি এই 'বারগির'কে আপন করে নিয়ে জায়গা দেবে যদি এমনকি তোমার মতো এক বাঙালি মেয়েকে আমি সন্তানও দিই? আমাকে নিয়ে তোমার ভয় আর উদ্বেগ আমি বুঝি। হায়, আইন আর ধর্মের দোহাই মানলে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্কই নেই। হতেও পারে না। যুদ্ধ শেষ হলে আমার দেশে ফিরে যাবারই কথা। তবু, কোন অনুযোগ নেই তোমার। তবু, তুমি তোমাদের এই ছায়া ঢাকা দেশের মতোই শান্ত। এত শান্ত দেশ তোমাদের আর তোমরা মানুষগুলো এত ঠাণ্ডা যে আমরা বারগিররা তোমাদের সব ফসল লুট করে নিয়ে গেলেও তোমরা আমাদের দোষ না দিয়ে মিছিমিছি কোন্ ছাই বুলবুলি পাখির ঘাড়ে দোষ চাপাও! আর আছে আশা তোমাদের। অবিনশ্বর আশা! এই দ্যাখো না মহারাষ্ট্রের নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোঁসলের নির্দেশে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় তাঁর প্রতিনিধি রাজা সাহু নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমাদের বাঙালিদের এখন আমাদের 'চৌথ' খাজনা দিতে হবে। আলীবর্দী খাঁ চৌথ দিতে সম্মতও হয়েছেন। এদিকে তোমাদের সব ফসল শেষ! তবু বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানোর গান বানাচ্ছো তোমরা আমাদের নিয়ে। ভেবে ভেবে সারা হচ্ছ কিভাবে খাজনা শোধ করবে? বাংলা কি তোমার মতোই শ্রান্ত ও ঘুমন্ত বিভাবতী? যেদিন থেকে তুমি আমাকে দেখেছ, তোমার দু'চোখের পাতায় স্বপ্ন। এই বারগিরকেও বিশ্বাস করো? এই হত্যা ও লুণ্ঠনকারীকেও? তোমার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছি আমি আর আমার সৈন্যরা, তোমার স্বজনদের হত্যা করেছি...তবু আমাকে আলিঙ্গন দিতে তোমার দ্বিধা হয় নি! নাকি এই বাংলার ফাঁদ? বাঙালি মেয়েদের ফাঁদ? হাজার অত্যাচারেও রা

কাড়েনা? ঘুমপাড়ানি গানে তোমরা আমাদেরও ঘুম পাড়িয়ে দাও? বহিরাগত বারগিরদেরও? বিজিত অলক্ষ্যে জয় করে বিজয়ীকে? বহিরাগতের আর স্বদেশে ফিরে যাবার পথ থাকে না? এই দেশের মৃত্তিকা আর নারীর প্রেমে জড়িয়ে যায় সে! বিভাবতী! তুমি সেদিন ভাঙা মারাঠিতে যে রূপকথা শুনিয়েছো আমাকে...সোনার কাঠি আর রূপার কাঠি আর ঘুমন্ত রাজকন্যার গল্প? একবার জাগো! বিভা!'

...নৌকার ভেতর আবার ঘুম ভাঙে বিভাবতীর। সুরনাথের কাঁধে তার মাথা।

'আমরা কোথায় চলেছি?'

'আমার নিজের দেশে আমি আর ফিরব না বিভাবতী! সেখানে আমি তোমাকে সম্মান দিতে পারব না! বারগিরের জীবনও আমি আর চাই না। এই দস্যুতা, এই লুণ্ঠন, এই ক্রমাগত ঘোড়ার পিঠে বন্দুক বাগিয়ে ছুটে চলা! এজন্যই তো ভোর রাতে শিবির থেকে তোমাকে তুলে এনে নৌকায় উঠলাম! আলীবর্দী নবাবের সৈন্যরা এই মুহূর্তে যুদ্ধে এগিয়ে। আমরা চলে এসেছি উড়িষ্যার চিল্কার পার অবধি। কিন্তু মহারাষ্ট্র থেকে আরো সৈন্য আসছে। আমি প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছি না। সামনে বাংলা আর মহারাষ্ট্রের আরো লম্বা লম্বা যুদ্ধ চলবে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা শ্মশান হয়ে যাবে। কিন্তু, আমি এই যুদ্ধে আর দস্যুবৃত্তি করতে চাই না! আমার আর বীর হবার শখ নেই।'

'যদি কেউ আমাদের ধরে ফ্যালে?'

'পারবে না। এই চিল্কার হ্রদ ধরে ভাটিতে গেলে আরো কিছুদূর গিয়েই আবার গঙ্গার মুখ মিলবে। সেখান থেকে আবার পিছু বাইলে আমরা...তোমার দেশ...বাংলায় ফিরে যাব। তুমি ত' রেশম বুনতে পার। আমাকে রেশম বোনা শেখাবে?'

'সে যে সব পুড়ে গেছে!'

মুচকি হাসে সুরনাথ। বিভাবতীর ঈষৎ স্ফীত গর্ভে হাত রাখে, 'কি যে একটা গান গুনগুনিয়ে করো তুমি সবসময়! কি জানি তুমি বুনবে?'

বিভাবতীর সাদা দাঁতগুলো নীল আকাশের নিচে ও ততোধিক নীল চিল্কা হ্রদের জলে হাসিতে বিচ্ছুরিত হয় অজস্র টোপা টোপা সাদা রসুনের মতো...গুনগুন করে ওঠে সে আহ্লাদে...গত দু'মাস ধরে গর্ভে এক নতুন প্রাণ স্পন্দন টের পাবার পর থেকে যে গানে সে থেকে থেকেই তার অনাগত শিশুকে প্রায়ই শোনায়, 'ধান ফুরলো পান ফুরলো - খাজনার উপায় কি- আর ক'টা দিন সবুর করো...'

'আমাকে তাঁত বোনা শেখাও...ধান আর পানের আবাদ, রেশম আর রসুন বোনা, বিভাবতী!'

'আমাদের একসাথে থাকা যদি কেউ মেনে না নেয়?'

'তবে মুসলমান হয়ে যাব। কিম্বা, ফিরিঙ্গিরা সাগরপাড় থেকে তাদের যে নতুন ধর্ম নিয়ে আসছে, তার ছাতার নিচে ঢুকে পড়ব। ভয়ের কিচ্ছু নেই!'

...সুরনাথ পুনর্বার শক্ত করে চেপে ধরে বিভাবতীর ডান হাত।

*ঢাকা*
*৩০ শে ডিসেম্বর ২০১০- ৪ঠা জানুয়ারি ২০১১।*

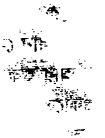

# পন্ডস ভ্যানিশিং ক্রিম ও সরলা কিস্কুর বিকেল

সকালে এক দফা ধানের চাতালে কাজ সেরে তাড়াতাড়ি মিঠাপুকুরের বড় সড়কের মোড়ে যেখানে বাস এসে থামে, সেখানটা দাঁড়িয়ে পড়লো সরলা কিস্কু। তার কালো হাত, যুবতী মহিষের মতো পুরুষ্টু কালো গতরখানা আর গতরখানা পেঁচিয়ে ধরা শাড়িতে ধানের গন্ধ। সারাদিন ধান সেদ্ধ আর ধান শুকানোর কাজ। বিয়ের পর বা বিয়ের আগেও ধান সেদ্ধ আর শুকানোর কাজ সে করেছে নিজের শ্বশুর বা বাপের বাড়িতে। এখন ধান শুকাতে হয় 'আসিফ ব্রাদার্স'-এর হুই লম্বা চাতালে। আজ মজুরি মিলেছে। আগে আগে হাঁটো বঠে সরলা! এই চৈত্র মাসে ভোর না হতেই সূর্যের তাত ফুটে যায়। মাঘ মাস অবধি রাইস মিলে সকালের কাজ শুরু হয় আটটায়। চৈত্র আসতেই সময় বদলে ভোর সাতটায় কাজ শুরু হয়। আর একটায় এসে দুপুরের খাবারের ছুটি মিলে। সরলা আজ দুপুরের খাবার না খাইবেক। খাইলে বাস ধরিতে পারিবে না বঠে। মিঠাপুকুর থেকে রংপুর নিউমার্কেটের সামনে যেতে পৌনে এক ঘণ্টা। আর ফিরিতেও তেমন সময়। আজ সপ্তাহের মজুরি মিলিলো। সরলা আজ জিলা শহরের সেই বাজারে যাইবে যেখানে দোকানের গায়ে গায়ে দোকান। আর কত সাবান, কত শ্যাম্পু, কত স্নো আর ক্রিম যাহার আখর লাইকো। দোকানের সামনে কি গোটা রংপুর টাউন জুড়িয়াই বিশাল বিশাল বিলবোর্ডে কত না সাদা সাদা বেটি ছেল্যার ছবি! উয়াদের হাত সাদা, পা আর উরত সাদা, মুখ ত' সাদাই! সরলার পারা কালা কুষ্টি লয়। আর রংপুর টাউনের নিউমার্কেটের সামনের বড় রাস্তায় ঐ যে বিশাল সাইনবোর্ড খানা টাঙ্গানো :

**'পন্ডস্ ভ্যানিশিং ক্রিম জানায় আপনাকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা!**

**মাত্র তিন সপ্তাহ ব্যবহারে আপনিও হবেন ফর্সা, উজ্জ্বল ত্বকের অধিকারী...**

**দিনে দিনে হয়ে উঠুন আরো ফর্সা!'**

কথা ব্যুলছে একখানা! হাঁ, সরলা ক্রিশ্চান মিছনের ইসকুলে সাত ক্লাস লিখাপড়া করিছে লয়? তাই না বাংলায় সব আখর সে পড়িতে পারে! সত্যই কি তিন সপ্তাহে ফরছা হবে কালা মেয়্যা? শুধুই কি লিখা? সাথের ছবিখানাও দেখিস না কেনে? এক গোলাপি জামা পরা কালা মেয়্যা পন্ডসের ডিব্বা খুল্যে মুখে পন্ডস্ মাখা ধরিলো। তারপর ঐ কালা মেয়্যার মুখ ফরছা হওয়া ধরিল্যো বঠে...ফরছা হতে হতে কেমুন মেম ছাহেবদের পারা! ক্রিশ্চান মিছনের নরওয়ের মেম ছাহেবদের পারা ফরছা! সরলাও অমন হবে বঠে? তাইতে না সরলার আজ দুপুরে ভাত না খাওয়া হইলো! বাসায় মা কি শাশুড়ি জানল্যে রাগ করিবেক বঠে! সরলার আজ চার মাস গর্ভ। কিন্তু, সরলার যে বড় ফরছা হইতে মন চায়। তাইতে না সে এই শরীরেও রাইস মিলে দুই বেলা কাম করছ্যে। কি করে সরলা? তাহার মরদখানা আজ তিন মাস 'রংপুর সুগার মিল' লে-অফ হয়্যে ঘরে বস্যা। বেটা ছেলের কাম না থাকল্যে তাড়ি ধরে। সারাদিন ঘরে বস্যে শুধু হাড়িয়া টানে- শুধু হাড়িয়া টানে- তা' বাদে সরলার আরো দুই বেটা বেটি আছে। একটার বয়স চার আর একটার দুই। বুড়া শ্বশুর আর শাশুড়ি। কাম না কর্যে ছয়টা মুখে ভাত দিয়্যে সরলা ক্রিম কিনিবে কখন? আর ফরছাই বা হব্যে কখন? আজ চার মাস ধর্যে বেতনের পয়সা জমায়্যে তবে না সরলা রংপুরের বাস ধরিছ্যে! ফিরতি বাসে মিঠাপুকুর আস্যে আবার 'আসিফ ব্রাদার্স'-এ ধান সেদ্ধর কাজে লেগে যাবে সরলা। তিনটা থেকে নয়টা। মিঠাপুকুরের পায়রাবন্দের জয়রামপুর গ্রামে সরলার বাড়ি। ভ্যান রিক্সায় চাপিলে আধা ঘণ্টায় বাড়ি পৌঁছে যাহিবেক সরলা। আজ সরলা বিজ্ঞাপনের মেয়্যালোকদের মত, সাইনবোর্ডের মেয়্যাদের মত মুখে আর হাতে ক্রিম খুব জোরে জোরে ঘষিবেক বঠে। তারপর ঘুমাইয়া পড়িবে...

**'এই রংপুর- রংপুর নিউমার্কেট- নিউমার্কেট।'**

কণ্ডাকটর লোকটা বাসের দরজায় জোর হাতে থাপ্পড় মারে। বাবা, এত তাড়াতাড়ি আস্যে গেল? সরলা তার চার মাসের পেট আর ডান-বাম-সামনে-পেছনের নানা বয়সের, নানা পোশাকের, নানা চেহারার মরদ মানুষ ঠেলে ঠেলে নিচে নামে। মাথাটা একটু ঘুর্যে উঠল্যো, লয়? বছর বারো আগে খ্রিছটান হবারও আগে ছোটবেলায় চড়ক দেখল্যে যেমন মাথা ঘুর্যে উঠত সেই পারা! মাথার কি দোষ? পেটে নতুন মানুষ নিয়া সরলা আজ দুপুরে ভাত খায় লাই। লাই খাইলো। আগে ত' পন্ডস কেনা। একঠা বড় দোকানের সামনে...যে দোকানের কাচের আয়নায় একের পর এক শুধু বাহারি লিপস্টিক, নখপালিশ, রং ফরছা করার ক্রিম আর পাউডার, চোখ আঁকার কাজল...তেমন দোকানের

সামনে দাঁড়ালো সরলা। কিন্তুক, উ দোকানের লোকঠো হাসিছ্যে যে বড়? সরলাকে দেখে হাসিল্যো কেনে? বাহ্, সরলা যে তার কামাইয়ের টাকা হতে গুনতি করে তিন/তিনটা পঞ্চাশ টাকার নোট বাড়ায়ে দিল্যে! নাকি উ দোকানের লোক ভাবিলো কি যে সরলার মতো কালো মেয়্যা হাজার ক্রিম ঘষিলেও ফরছা হব্যার লয়? ইসশ্... এতটুকুনি ডিব্বার দাম দেড়শো? বড় ডিব্বাটার দিকে আঁখ দিতেও ভয় করে। পাঁচশো টাকা দাম। ইসকুলে সরলা বাংলা আখর পড়া শিখেছিল। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, নামতা আর সপ্তাহ-মাসের হিসাব। তিন সাতা একুছ দিনে ফরছা হব্যে সরলা? মিছনের নরওয়ের মেম সাহেবদের মতো? যিছুর মা মেরির মতো? লেংটাকালে সরলারা কালির থানে পূজা দিত। মা কালি কি পন্ডস ক্রিমে ফরছা হতে পারে মা দুর্গার মতো? মা মেরির মতো? খ্রিছটান হবার আগে যখন তারা হড় ধর্ম পালন করত্যো আর দিকু (হিন্দু)-দের পূজা পরবেও যাইতো, যখন তারা মারাং বুরু, পিলচু হড় আর পিলচু বুড়হির থানে মানত মেনে দুর্গা পূজার মণ্ডপেও যাইতো, সাঁওতাল বলে কিনা পুরুত তাদের মন্দিরের চাতালে উঠিতে না দিত...তবু দূর থেকেই তারা নমস্কার সারিতো...সরলা দেখিতো কি যি কিমুন সাদা দুর্গা মায়ের বেটাবিটিরাও সব সাদা, লয়? উ তোমার গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী আর সরস্বতী! তারপর যেইবার খুব শুখা হইলো...সেইবার ধানি জমি সব পুড়ল্যো আর আখ ক্ষেতেও আখ না হইলো...দিকু আর মুসলমানদের সাথে...ঐ বাঙালিদের সাথে জমি লিয়াও কিছু ঝামেলা হইলো...কিছু জমি বেহাত হইলো...আর মা'র বিহার রূপার বৈছা বাপায় সদর হাটে বেচে আসল্যো, সেবার তার বাপ যোগেন কিস্কু অনেক ভাবনা-চিন্তা কর‍্যে এক সকালে কেমুন লম্বা একটা শ্বাস ফেলে সরলা, তার মা আর দুই দাদাকে লইয়া মিছনে গেল। সরলাদের সবার কেমুন সোন্দর পারা একটা ইংরাজি নামও হইলো! বাপা যোগেন কিস্কুর নাম হইলো যোগেন যোশেফ কিস্কু। মা'র নাম হইলো অমলা মার্গারেট কিস্কু। দুই দাদা সুনীল রিচার্ড আর অনিল ডেভিড কিস্কু...তা' মিছনে সরলা চিনিলো মাতা মেরি আর তার বেটা যিছুকে! উরাও দেখি দুর্গা আর দুর্গার বেটা কার্তিকের মতো সাদা আর সোন্দর। হায়, সরলার এই মা কালি রং...দোহাই বাবা মারাং বুরু...থুক্কু, দোহাই যিছুর... সরলাকে এট্টু ফরছা করে দাও হে! উ সাইনবোর্ড খানায় কি যেন লিখিছ্যে আরো? দিনে তিনবার ক্রিম মাখ্যতে হবে ফরছা হতে হলে! ওঠে না, ওঠে না...কালো রং ওঠে না হে! *কয়লা ধুলেও না যায় ময়লা*! সরলার ছোটদা অনিল ডেভিড কিস্কু মরেছিল বড় পুকুরিয়ার খনির পাতালে। কয়লা রং সাঁওতাল মরেছ্যে কয়লার খোঁজে পাতালে নাম্যে। ও কি, সরলা কান্দিছ কেনে? অনিল ভাল আছে সরলা, লয়? ভগবান তাহাকে কোলে লিয়্যাছে?

**'হেই পায়রাবন্দ-মিঠাপুকুর-রংপুর! পায়রাবন্দ-মিঠাপুকুর-রংপুর!'**

কন্ডাকটর তীব্র গলায় হাঁকে।

...বাসের ভিড়ে হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মাথা ঘোরায় সরলার। পরপর দু'টা বেটির পর এবার কি বেটা হবে সরলার? না বেটি? সেই বেটা মা মেরির ছেল্যা যিছুর মতো ফরছা হবার লয়। মা দুর্গার বেটা কার্তিকের পারাও ছাদা হবার লয়। ডিব্বা ডিব্বা ক্রিম মাখ্যলেও সরলা কালা-কুষ্ঠি থাকিব্যেক বঠে! আর কামেরই বা কি হব্যেক? এখন সবে চার মাস। ছয় মাস কি আট মাস হব্যার পর সরলা আর কাজ না করিতে পারিব্যেক। কাম ছাড়িতে হব্যেক। সরলার স্বামীর রোজ দিনমজুরি না মিল্যে। এরই ভেতর সে কিনা ফরছা হইবার ক্রিম কিনিতে এতগুলা টাকা খরচ করিলো! তু নাচনেওয়ালির বাড়া হে সরলা!

**'পায়রাবন্দ-মিঠাপুকুর-রংপুর!'**

লোকাল বাস থেমে থেমে হাঁকে। সরলার ব্লাউজের ফাঁকে ভরাট দুই স্তনের ভেতর পন্ডস ভ্যানিশিং ক্রিমের কৌটাটা ভিজে উঠতে থাকে ঘামে।

*রচনা : ফেব্রুয়ারি ২০০৮*

# বলো আমার নাম লাল!

১

শাদা হাওয়ার উপর দিয়ে আমি হাঁটছিলাম নিকোলাস...বাতাসে বাতাসে যখন ঝুলছে অবার্চীনতা...প্রজ্ঞারা বাক্সবন্দী...আসলে শাদা হাওয়ার উপর দিয়ে আমি হেঁটেছিলাম কি? আমার জুতো মৃত্তিকার আধা ইঞ্চি ওপরে...তখনো চরাচরের সবুজ ঘাস শিশিরে আচ্ছন্ন...কিন্তু, আমি সহসাই পৌঁছে গেলাম তোমাদের কাঁচ ঘরে... তুমি আমার ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়ালে, যেমন আগেও দাঁড়াতে...আমার হাতে তুলে দিলে তুমি কয়েকটি কাগজ।

'কি এগুলো?'

'আমি তো তোমার ভাষা পড়তে পারি না। আমার টেবিলে এই কাগজগুলো তুমি রেখে গেছিলে। তোমাদের ভাষায় লেখা...এক বছর আগে তুমি রেখে গেছিলে আর আমি সেই থেকে এই কাগজগুলো পাহারা দিয়ে রাখছি।'

তুমি বললে নিকোলাস...তোমার ঐ আশ্চর্য দু'টো নীল চোখ মেলে। তুমি কি তবে আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ আমাদের যৌথতার দিনগুলো...আমাদের প্রেম ও প্রজ্ঞা... যা কখনোই বাক্সবন্দী ছিলো না? কিন্তু, আমি ত' তোমাকে কখনো বাংলায় কোন চিঠি লিখি নি...চিঠিই লিখি নি...লিখেছি কিছু ই-মেইল আর তাও সবই তোমার ভাষায়...যে ভাষায় তোমরা আমাদের শাসন করো...প্রায় দুই/তিন শতাব্দী আগে তোমাদেরই পূর্বপুরুষেরা দ্রুতগামী জাহাজ, অশ্ব, বন্দুক ও চাবুকের সাথে যে ভাষাও বহন করে নিয়ে এসেছিল আমাদের এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রাষ্ট্রে...প্রায় দু'শো বছর পর জাহাজ, অশ্ব, বন্দুক ও চাবুক নিয়ে তারা ফিরে গেলেও থেকে যায় তোমাদের এই ভাষা...আমাদের বাবা ও মায়েরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন আমাদের এই ভাষা শেখাতে। সাদা প্রভুদের ভাষা। যে ভাষা শিখলে কখনো রুটির অভাব হয় না। যে ভাষা নূণ্যতম জানলে একটি কাজ ছেড়ে দিলেও আবার আর একটি কাজ পাওয়া যায়। আমি আমার নেটিভ উচ্চারণে প্রথম যেদিন তোমার সাথে কথা বলি...তোমারই ভাষায়... তুমি মুচকি হাসছিলে...তারপর তোমাদের সংস্কৃতির সাথে কিছুটা হলেও যায় এমন একটি

লং স্কার্ট ...যদিও সাথে ওড়নাও পরা ছিল আমার...পায়ে আধা ইঞ্চি হিল আর কাণে কালো রংয়ের দুল পরা আমাকে...তুমি বললে, 'ইউ লুক লাইক জিপশি ওমেন অফ রোমানিয়া!'

আমি ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জিপসি?'

'জিপশি!' তুমি আমার উচ্চারণ সংশোধন করতে চাইলে...আর মেলে দিলে তোমার শুভ্র, সবল হাত আমার হাতে...আমি লজ্জায় কুঁকড়ে গেলাম...যত্র তত্র সকল পুরুষের করস্পর্শ অভ্যাস নেই আমাদের, তাই।

*আজ যে শুধু একান্তে আসীন/ চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন...*

না, কাগজটার দিকে আবার তাকাই আমি। এই বাংলা কবিতা লেখা...আরো স্পষ্ট করে বললে গীতবিতানের গান লেখা কাগজ তোমার টেবিলে কবে রেখে এলাম আমি? তুমি কেন ফিরিয়েই বা দিচ্ছ সেই কাগজ আমাকে? উহ্...একবার একটা ই-মেইলে চেষ্টা করেছিলাম বৈকি রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদ করতে। *কিছু বা সে মিলন মালায় যুগল গলায় রইবে গাঁথা...কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনীর চোখের পাতা...কিছু বা কোন্ চৈত্র মাসের বকুল ঢাকা বনের ঘাসে...মনের কথার টুকরো আমার...কুড়িয়ে পাবে কোন্ উদাসীন*...বাপ্ রে, অনুবাদ করতে আমার সাতশো অভিধান হাতড়ানো...

'তুমি এতবার টেগোরের নাম করো...তোমাদের দেশের সব মানুষ এত টেগোরের নাম করে...ইভেন গডের নামও এত বার তোমরা বলো না!'

'তাই ত।'

কিন্তু, এভাবেই কি শুরু হয়েছিল? না...শুরু হয় নি, আমাদের এ আখ্যান কখনোই শুরু হয় নি... শেষও হয় নি...এ আখ্যান একই সাথে অনন্ত বিরহ ও অনন্ত মিলনের অভিরূপ...যার কোন সূচনা বা সমাপ্তি বিন্দু নেই, তাই এ আখ্যান অসমাপ্ত...ঘুম ভেঙ্গে গেলে যেমন স্বপ্নও ভেঙ্গে যায়...

২

*তোমায় আজ প্রায়ই পড়ে না মনে,*
*তুমি আজ নিরুদ্দেশের মেঘ-*
*স্বপ্নে যদি ভুলেও তুমি আসো,*
*হৃদয় হারায় প্রার্থিত সংবেগ।*

...তাঁর চোখে কি ছিল শিকারীর সেই সহজ, অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে হরিণীর অভ্যন্তরীণ আর্তি পরিমাপের তির্যকতা? পর্যবেক্ষক চাহনীতে যাচাই করে নেওয়া যে ভ্রমাত্মক জালে কতটা পা জড়িয়ে ফেলেছে রক্তাক্ত মেয়ে? ও শ্বেতবর্ণ পুরুষ, তোমার চোখে কত সাত সমুদ্রের নীল? কত কত লোনাজল পেরিয়ে তুমি আমার

দেশে এসেছ? উপনিবেশ আর জলদস্যু জীবন পার হয়ে আজ তুমি আইএমএফ আর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক পরিচালক। আমি সেই তাম্রবর্ণ কন্যা যাকে দেড়শো বছর আগে নীলকর গোরা সাহেবের কুঠুরিতে যেতে হয়েছিল। বৃটিশের আমলে দু'পাতা লেখাপড়া শিখে (যবে আমাদের প্রপিতামহগণ গোরাদের দেখাদেখি শিক্ষিত বউয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন) এক দু' প্রজন্ম হাঁটি হাঁটি পেরিয়ে...হ্যাঁ, আমার দিদিমা কখনো স্কুলে যায় নি আর আমার মা স্কুলে পড়তে পড়তে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন...আমার বড়বোণ সরকারী চাকরি করে আর আমি অনেক পরীক্ষা দিয়ে, বিস্তর কাগজে সই করে তোমার সংস্থায় আজ তোমারি অধঃস্তন কর্মকর্তা (এ চাকরি পেতে ঝরে গেছে আমার যৌবনের টগবগে দশ/পনেরোটি বছর...বললে বিশ্বাস করবে না...একটা বিয়ে এমনকি ঠিকঠাক একটা প্রেম অবধি করা হয়ে ওঠে নি.. সেসব যেমন আমার বাঙালি বন্ধুদের বলি...শুধুই কি সাহিত্যের জন্য? ভালো আয়-রোজগার নেই তেমন স্বামী দিয়ে করবোটা কি আর চারদিকের ছেলেরা শতকরা নিরানব্বই ভাগই তেমন...আর নিজে যদি চাকরি করতেই হয় তবে আরেকটু ভাল চাকরি...এই করতে করতে দেখি আমার মধ্য তিরিশের চুলেও একটা দু'টা পাক)। আর নীলকর সাহেবের সাথেও রায়ত চাষীর মেয়ের যেমন প্রেম হয়েছিল...আজ তেমন সংকল্প নিয়ে আমার দিকে অগ্রসর হয়ো না শ্বেতদস্যু! মেয়েরা তো এমন বেহদ্দ বোকা যে কখনো কখনো ভালবেসে ফ্যালে দর্পিত দস্যুকেই! ভালবাসে তারা শাসক ও শোষককেই! তুমি আমাকে দেখছো! দেখছো পুরুষের কৌতুক ও বিস্তর আগ্রাসী মনোযোগে! তোমার চোখে কত সাত সমুদ্রের নীল? কত কত লোনাজল পেরিয়ে তুমি আমার দেশে এসেছো! উপনিবেশ আর জলদস্যু জীবন পার হয়ে আজ তুমি আইএমএফ আর ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক পরিচালক। আমি সেই তাম্রবর্ণ রায়ত চাষীর মেয়ে, দেড়শো বছর আগে নীলকর গোরা সাহেবের হাতে অত্যাচারিত হতে হতে যে অত্যাচারীকেই ভালবেসে ফেলেছিল...

*দাপ্তরিক প্রেম, বলো আমার নাম লাল!*

আছি আশ্চর্য প্রভায়,

আমাদের দু'জনার ভেতর একচিলতে করিডোর আর দু'টো আধখোলা কাঁচের দরোজা। গত পরশু দু'বার আমার দরোজার সামনে এসে আমার কক্ষের অন্য মেয়েটির সাথে কথা শুরু করে যেন বা কথা বলতে বলতেই আমার চেয়ারের হাতলে রাখলে হাত। আমি লজ্জায় কুঁকড়ে যেতেই তুমিও লজ্জা পেলে...আমাদের অন্য সহকর্মী মেয়েটি বুঝলো সবই...তুমি কথাচ্ছলে আমার

পিঠে রাখলে হাত...বিকেল ফুরোবার আগে তুমি আরো একবার আমাদের কক্ষে এসে অন্য মেয়েটির সাথে কথা বলতে বলতেই আমার কোমরে দিলে আলতো ঘুষি যা সুড়সুড়ি ছিল হয়তো...আমি ঈষৎ বিব্রত...তুমি এবার অন্য মেয়েটির কোমরেও দিলে আলতো ঘুষি...যা স্পষ্টতঃই বানানো মনে হচ্ছিলো...ওহো, ভিনদেশী দস্যু...বিশ্বায়িত সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে এমন করতে নেই! জানো নাকি আমরা প্রাচ্যের মেয়ে? যেখানে খাজুরাহো কোণার্কের মন্দিরের অসূর্য্যস্পর্শা রমণীরা হঠাৎই আসবমত্তা হয়ে পড়ে...গতকাল তুমি সারাদিনে আমার দিকে একবারও চোখ তুলে তাকাও নি (ইশশ্...এত কি কাজ তোমার?)! আর, আজ তুমি দু'বার আমার দরোজার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে। তবু, সাহস হলো না তোমার আমার ঘরে ঢুকতে। আমি কি অস্থির হলাম? আমি জল খেতে চেয়ার ছেড়ে তোমার কক্ষের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলাম? আমি কতটুকু পিপাসার্ত ছিলাম? আমার কক্ষের মেয়েটি অন্য কাজে গেছে। আমি আমার টেবিল ছেড়ে সহকর্মী মেয়েটির টেবিলে রাখা টেলিফোন থেকে ফোন করতে গেলাম। আমার ফোন করা কতটা জরুরি ছিল? আধা খোলা দুটো কাঁচের দরোজা হতে দেখা যাবে না তো আমাকে! তুমি না দেখেও দেখতে পেলে! তোমার সতর্ক কাশির শব্দ সেকথাই জানিয়ে দিল...বুঝলাম হরিণীর প্রতিটি পদবিক্ষেপ বনপথে লক্ষ্য করে গোপন শিকারী! *নিষাদ কি কখনো পক্ষিণীর গোত্র ভুল করে?* স্মরণে রাখা যাক আল মাহমুদের সেই অবিনশ্বর পংক্তি! আহা, আমরা মেয়েরাই শুধু জানি নিষ্ঠুর নিষাদের ভুল না করা আর আমাদের ক্রমাগত জখমি হওয়ার কাহিনী...*ফিরে নজর দেখো, জখমি জিগর দেখো*....যেমতো ঘুঙুরের বোলে পবিত্রা মীনাকুমারীর আশ্চর্য নাচ...প্রিয়তম, ফিরে দ্যাখো এই আহত হৃদয়ের ক্ষত! একবার ফিরে দ্যাখো! আই,টি,র ছেলেটি আমার কম্পিউটারের অসুখ সারাতে আমার কক্ষে ঢোকা মাত্রই তুমিও তোমার হার্ড-ডিস্কের বালাই-মুসিবত জানাতে আমার কক্ষে ঢুকলে...আমি তোমার দিকে তাকাতেই তোমার অভিনব নীলপদ্ম চোখ বিব্রত হয়ে উঠলো লজ্জায়। দ্যাখো, এই রক্তবর্ণ টিপ আর রক্তমৃত্তিকা কর্ণাভরণ, এই লাল ওড়না আর দু'হাত ভর্তি সাদা লাল চুড়ি আমি তোমার জন্যই পরেছি আজ...*মাই নেম ইজ রেড...বলো আমার নাম লাল...লোহিত আমার নাম*... মনে পড়ছে প্রথম দিন আমার চাকরির পরীক্ষা দিতে আসা... পরীক্ষার ঘর খুঁজতে তোমার কক্ষের সামনে এসেই প্রশ্ন করেছিলাম, 'হোয়্যার ইজ দ্য এক্সাম রুম?' তুমি আমার নীল সাদা কামিজ ও কপালের নীল টিপ খুঁটিয়ে দেখছিলে...মৌখিক পরীক্ষাতেও তুমিই ছিলে বোর্ডে, আরো অনেকের সাথে...প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে অন্য সবার চেয়ে ব্যতিক্রমী তুমিই উঠে দাঁড়িয়ে দরোজা খুলে আমাকে বিদায় দিয়েছিলে...মধ্যাহ্ন হতে তুমি খুব কাজে ব্যস্ত...আমিও...কম্পিউটারে তোমার ঝড় তোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে...আর, এখন যখন বিকেল গড়িয়ে আসছে-

তুমি এসে আমার দরোজার পাশে আবার দাঁড়ালে...লম্বা আড়মোড়া ভাঙ্গলে...ছাড়লে সশব্দ দীর্ঘ হাই...যেমন সিংহ কেশর ফোলায় সিংহীর কাছে এসে, যেমন ময়ূর পেখম তোলে ময়ূরীর কাছে...বললে কাঁধ ও হাত ব্যথা করছে খুব...আর, আজ দ্যাখো এই রক্তবর্ণ টিপ আমার কপালে!

...তুমি লজ্জায় চোখই তুলতে পারছো না...*দাঁড়াও আমার আঁখির আগে, তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে*...যদি গেয়ে উঠি রবীন্দ্র সঙ্গীত? তুমি ত' একটি অক্ষরও বুঝবে না! বুদ্ধু কোথাকার! *সমুখ আকাশে চরাচর লোকে, এই অপরূপ আকুল আলোকে*...' অপরূপ আকুল আলোকে' তোমাকে বোঝাতে আমাকে উল্টাতে হবে সাতশত অভিধান...*দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে* অথবা *আমার পরাণ পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরশ মাগে* বোঝাতে ভেঙ্গে যাবে আমার সমস্ত দাঁত... আর, যদি এই আগারগাঁও আইডিবি ভবনের চারপাশ হঠাৎই আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে প্রবল বৃষ্টিতে...অফিস শেষের গাড়িতে ওঠার প্রাক্-মুহূর্তে কোন ছিন্ন টোকাই স্বর্ণাভ কদম আনলেও কি তরজমা করতে পারব 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল?' এই রক্তবর্ণ টিপ আর রক্তমৃত্তিকা কর্ণাভরণ, এই লাল ওড়না আর দু'হাত ভর্তি সাদা লাল চুড়ি আমি তোমার জন্যই পরেছি আজ...*মাই নেম ইজ রেড...বলো আমার নাম লাল...লোহিত আমার নাম!* তোমার সাথে দূর্ঘটনার ক্রম পরম্পরা!

৩

'কেন? কেন তুমি রিজাইন করলে অবন্তিকা? আফটার অল ইটস ইউ,এন, জব। মাথা ঠাণ্ডা করো! এখনো সময় আছে।'

'কিন্তু...এখানে যে আমি কিছুই করতে পারছি না নিকোলাস! অষ্ট প্রহর হাত-পা বাঁধা। যে দরিদ্র পাহাড়ি মানুষগুলোর কথা বলে কোটি কোটি টাকা আমরা ফাণ্ড আনি, তার সবটাই আমাদের বিপুল বেতন দিতে ব্যয় হয়ে যায়। গত চার মাসে আঠারোটা পাহাড়ি গ্রাম ত' আমি ঘুরলাম। যাদের জন্য এই প্রকল্প, তাদের জন্যই কোন টাকা নেই। তাদের গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, টিউবওয়েল নেই, বাচ্চাদের একটি স্কুল নেই কি একটি টিকা দেবারও ব্যবস্থা নেই। আজ জয়েন করার পর থেকে ছয় মাস হয় একটা তিন পাতার বুলেটিন লিখে, লে-আউট, ডিজাইন করে বসে আছি...কর্তারা এটা প্রকাশের অনুমতি দিচ্ছেন না...আমার লাইন ম্যানেজার আমাকে এই ছয় মাসেও একটা কাজ দেন নি...গোটা প্রকল্পে কোন কাজ নেই...আসা-যাওয়া, গাল-গল্প, খাওয়া-দাওয়া, মাস শেষে লাখ লাখ টাকা স্যালারি ড্র করা...কিন্তু সব কি অর্থহীন!'

'অবন্তিকা-' নিকোলাস আমার চোখে চোখ রাখে, 'আমি তোমার চেয়ে বয়সে বছর আটেকের বড় হবো। ইউএন-এর কাজে আমার প্রথম এ্যাসাইনমেন্ট ছিল বসনিয়ায়। সেখানে চার বছর থাকা কালে গোটা পূর্ব ইউরোপ দেখেছি আমি। তারপর কাজ পেলাম শ্রীলঙ্কায়। সেখানেও চার বছর। আমি জানি এই ইউএন সিস্টেম কি ফ্রাস্টেটিং! বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় হচ্ছে কিছু কর্মকর্তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে। গড়ে উঠছে একটি গ্লোবাল এলিট ক্লাস। কিন্তু, আমাদের কোন কাজ নেই। অলস হস্তী। মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করি যে আমার বাবা কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ করা মার্কিনী। আমি কিন্তু বুশকে ঘৃণা করা একজন মার্কিনী। তারপরও এই ইউএন সিস্টেমে আমি কিভাবে নিজেকে টিকিয়ে রাখছি? প্রতি মূহূর্তে আমার আত্মার সাথে আপোষ করে? আফিগানিস্থান, ইরাক, সোমালিয়া, শ্রীলঙ্কা, বসনিয়া...কোথায় একটি যুদ্ধ উপদ্রুত শিশুকে আমরা বাঁচাতে পারছি? পৃথিবীর একটা সমস্যারও কি আদৌ কোন সমাধান করতে পারছি? মাঝে মাঝে খুব যে গ্লানি বোধ হয় না তা' না...কিন্তু আমার মা...অল্প বয়সে বিধবা হয়েও তিনি আর বিয়ে করেন নি...যেটা আমাদের সোসাইটিতে বিরল...মা- হয়তো বিশ্বাস করবে না- বয়ফ্রেণ্ডও ছিল না তার- দিস ইস ভেরি আনইউজুয়্যাল ইন আওয়ার সোসাইটি... গত আট বছর ধরেই তাঁর দূরারোগ্য বোন ক্যান্সার। হ্যাঁ, আমি হয়তো আর একটু বাস্তববাদী হতে পারি। সোলন কেটারিংয়ে এক/একটা থেরাপিতে এত খরচ না করে মা'র চলে যাওয়া মেনে নিতে পারি...কিন্তু, এখনো আমি সেই পরিমান বাস্তববাদী হতে পারছি না...তাই খুব বাজে লাগলেও এই চাকরিটা আমি করে চলেছি। এত টাকা ইউ,এন, ছাড়া আমাকে আর কে দেবে? তোমার কি টাকার দরকার নেই, অবন্তিকা?'

'টাকা আমারও দরকার নিকোলাস। তাই ত' গত ছয় মাস আমি একদম চুপ ছিলাম। এই অফিসে...তুমি জান একটা অংশ আছে যারা কোন কাজ করে না...কিন্তু, মাস শেষে মোটা অঙ্কের বেতন পকেটে নিয়ে গলফ খেলা, গাড়ির মডেল বদলানো আর বারে যাওয়ার কুৎসিত দম্ভকারী মানুষগুলোই প্রতিদিন তোমার আমার মতো দু'একজন সৎ মানুষের পেছনে এত নির্মমভাবে লেগে আছে...এত নিষ্ঠুর অপমান করছে উঠতে-বসতে...কি করে ওরা বললো যে আমি কাজ করতে চাচ্ছি আমার *ইণ্ডিভিজুয়াল শাইনিং*-এর জন্য? এ কথার পর রিজাইন না করে আর কি করতে পারি?'

'তুমি কি আমার অপমানগুলো দেখতে পাও না, অবন্তিকা? একটু কাজ করতে চাওয়ার জন্য সাদা হাতি আমলাগুলোর কাছে আমি রোজ কি অপমান সহ্য করছি? সেটা দেখে একটু ধৈর্য্য ধরো! তুমি চলে গেলে এই অফিসে আমি ভীষন একা হয়ে যাব। নাকি তুমি...' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তুমি আমার চোখে

আবার চোখ রাখলে, ' নাকি তুমি আমার কাছ থেকেই পালাতে চাইছ?'

আমি চমকে উঠি।

...মূহুর্তকালের জন্য।

তারপর ওর চোখের দিকে চেয়ে বলি, 'যদি বলি দু'টোই?'

নিকোলাস মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ বসে থাকে।

'কি দোষ করেছি আমি তোমার কাছে জানি না। আমি জানি আমি বিবাহিত। বসনীয়ায় পোস্টিংয়ের সময় মাজিদাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। সে বসনীয় মুসলিম। তোমার মতো ইন্টেলেকচ্যুয়াল নয় অবশ্য। তার কাজের টেবিলে তোমার মতো মিশেল ফুকোর বই নেই। তবে বিয়ের আগে সে সুন্দরী ছিল। কিন্তু...আমরা পুরুষ! ঈশ্বর জানেন আমাদের কি সমস্যা...দু'টো সন্তানের মা হবার পর আজ যখন মাজিদার কোমরে...ফরগিভ মি...সেই বাঁক আর নেই...নেই তার বাদামি চুলের দূরন্ত উচ্ছাস...তখন একটি নতুন দেশে কাজে এসে যখন আমি আমার কোন সহকর্মীর কালো চুলের জলপ্রপাত দেখি...দেখি তার জলপাই ত্বকের সবুজ লজ্জা...আমি জানি তুমি আমার মুগ্ধতাকে ভয় পাচ্ছ, অবন্তিকা! তোমার ভাল লাগছে আবার ভয়ও করছে। কারণ, ঠিক এই মূহুর্তেই আমার হাতে কোন সমাধান নেই। তুমি তাই আত্মরক্ষা করতে চাচ্ছ, এ্যাম আই রাইট? যাতে আরো বেশি জড়িয়ে না পড়ো? যেন আমাকে ক্রমাগত না দেখতে দেখতে আমাকে ভুলে যেতে পারো তুমি? তাই নয় কি? অফিসে যদি এই শয়তান আমলাগুলো না-ও থাকতো, তবু হয়তো তুমি রিজাইনই করতে...তাই না?'

'হয়তো,' আমি অস্ফুটে মাথা নাড়ি, 'বহু আগে একটা সোভিয়েত ছবি দেখেছিলাম। *দ্য লিজেণ্ডস্ অফ রুস্তম*। বীর রুস্তম সুন্দরী তাহমিনাকে বিয়ে করার বছর খানেক পরে একদিন স্বপ্নে দেখে যে ধাবমান অশ্বে ছুটে চলার পথে হঠাৎই কোত্থেকে একটা কালো ফাঁস এসে তার গলায় আটকে বসে তার শ্বাসরুদ্ধ করে দিচ্ছে। ঘুম ভেঙ্গে রুস্তম দ্যাখে তাহমিনার কালো চুল তার গলায় জড়িয়ে আছে।'

'এ সিনেমার গল্প আমাকে করার অর্থ?'

'অর্থ এই যে তোমার আগেও হয়তো কাউকে কাউকে আমি ভালবেসেছি। কিন্তু কারো জন্যই আমার প্রতিদিনের কাজ, আমার ছুটে চলা ব্যাহত হয় নি। মাঝে মাঝে নিজের উপর ধিক্কার লাগে। আগে অফিস থেকে বাসায় ফিরে বই পড়তাম, হয়তো কিছু লিখতাম...কোন না কোন নতুন উদ্যম...আর এখন বাসায় ফিরে শুধুই ঘোরের ভেতর থাকা...এই ছ'টা মাস ধরেই এই মোহ বন্দিত্ব আমার আর সহ্য হচ্ছে না...'

আমি ওর দিকে মুখ তুললে নিকোলাস বিষণ্ন হাসে, 'তাই বীরপুরুষ রুস্তমের মতো বীর নারী তুমিও এই ঘোরের ভেতর আর থাকতে চাইছো না?'
'অনেকটা তাই।'
'বেশ। তবে তাই হবে। তোমার সাথে আমি নিজে থেকে আর কোন যোগাযোগ করবো না। যত কষ্টই হোক, আমি...আমি এটা করবো...মেনে চলবো...আমাকে মেনে চলতেই হবে! আমি তোমাকে আর তাহলে রেসিগনেশন উইথড্র করতে বলবো না। ওকে?'
'আর এছাড়া অফিসে নাফিসারা খুব ঝামেলাও করছিল। তুমি কেন আমার ডেস্কের কাছে, আমার রুমে এত ঘন ঘন আসো? কেন এত কথা বলো আমার সাথে? এ নিয়েও নাফিসা, খন্দকারদের খুব সমস্যা। নিকোলাস, তোমরা পশ্চিমের মানুষরা ত' বোঝ না...আজো আমাদের সমাজে এক পুরুষ সহকর্মী অন্য কোন নারী সহকর্মীর কাছে বারবার এলে কত সমস্যা হয়!'
'কিন্তু, নাফিসা নিজেই ত' আমার রুমে কত আসে! বরং তুমিই কখনো আমার রুমে ঢোক না। সে ত' ছোট বেলা থেকে ষোল বছর ওয়েস্টে থেকেছে। তোমার চেয়ে সে অনেক বেশি ওপেন, অনেক বেশি ওয়েস্টার্ন। অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে তোমার ওরিয়েন্টাল শাইনেসই আমার বেশি ভাল লাগে। কিন্তু, আমি দেখছি যে সারাক্ষণ সবাইকে ভয় করে চলো তুমি। কিসের ভয়? নাফিসা আমার রুমে ঢুকতে পারলে তুমি কেন ঢুকতে পারো না? কেন আমি তোমার ডেস্কের কাছে গেলে তুমি আমার সাথে প্রায়ই অপমানকর সব আচরণ করো?'
'তাতেও ত' গোটা অফিস জুড়ে নাফিসা আর খন্দকার রটিয়েছে যে তোমার আর আমার প্রেম। ইন্দ্রজিৎ আর পিটারের কাছে এই নামে কমপ্লেইনও ঠুকেছে!'
'পিটার- ওল্ড হ্যাগার্ড ব্রিটিশ...এই ব্রিটিশগুলো খুব কমপ্লেক্স আর ক্রুকড্! শোন, আমাদের মার্কিন সরকারের যে বিদেশ পলিসিই থাকুক না কেন, আমরা এ্যামেরিকানরা এ্যাভারেজলি কিন্তু সরল সোজা আর দিলখোলা...এটা নিশ্চয়ই মানবে। আর ইন্দ্রজিৎ! আমি তাকে খুন করবো, অবন্তিকা! কোন্ সাহসে সে তোমার সাথে ফিল্থে অমন ইনডিসেন্ট ব্যবহার করলো? হি ইজ আ স্টকার! আর ঘটনাটা তুমি আমার সাথে কখন শেয়ার করলে, অবন্তিকা? না, রেসিগনেশন দেবার পর। ইউএন-এর মতো জায়গায় সে একটা মেয়েকে হ্যারাস করে পার পেয়ে যাবে?'
'আর ইউএন ইউএন করো না। আর তাছাড়া সব তো আমি চুকিয়েই দিচ্ছি!'
'হ্যাঁ- স-ব!' তুমি অস্থিরভাবে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ো।

## ৪

গতকাল আমি আবার তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম, নিকোলাস! দেখলাম তুমি আমার মুখের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছ অজস্র এলাচ আর লবঙ্গ। আরে... একবার তোমার খুব সর্দি-কাশি হওয়ায় আমি তোমাকে কিছু এলাচ আর লবঙ্গ দিয়েছিলাম। তার আগের দিন তুমি আমাকে একটি মিউজিক সিডি উপহার দিয়েছিলে। দেবার সময় বলেছিলে, 'দিন-রাত কম্পিউটারে লো ভলিউমে তুমি কি শুধু ট্রাডিশনাল বেঙ্গলি মিউজিকই শোন? তোমাদের সুরের সাথে তাল মিলিয়ে আমি আমাদের দেশের কিছু কান্ট্রি মিউজিকই দিলাম। হার্ড রক, র‍্যাপ কি পপ দিচ্ছি না!'

...উপহারটা পাবার পর থেকে অস্বস্তি লাগছিল। তোমাকে কি দেওয়া যায়? এরই ভেতর তোমার সর্দি-কাশি বেঁধে বসলো। খুব ইচ্ছা হচ্ছিলো লবঙ্গ এলাচের সর্দি নিরোধক চা আমিই তোমাকে করে খাওয়াই। কিন্তু অফিসে সেটা সম্ভব কি? অথচ তুমি ত' পার। প্রথম যেদিন বীন আর বিফ স্টেক রান্না করে এনে কলিগদের সাথে শেয়ার করতে গিয়ে জানলে যে আমি বিফ খাই না, ঠিক তার দু'সপ্তাহের মাথায় বীন আর মুরগী রান্না করে আনলে। মার্কিনী থ্যাঙ্কস্ গিভিং ডে-র রান্না। লবণ ছাড়া সেদ্ধ মুরগী আর আলু দেখে আমি একটু হেসেই ফেলেছিলাম। বলে ফেলেছিলাম যে বাঙালি রান্না বাঙালি রান্নাই। উত্তরে তুমি মুখ বেজার করে ও কিঞ্চিৎ রেগে গিয়ে বললে, 'ওহ, ডু ইউ থিঙ্ক অল বাংলাদেশী ফুড আর ইয়ামি?' শালা ত' পুরা রেসিস্ট! তবু পরের দিন লজ্জা লজ্জা মুখে বিশাল এক প্যাকেট লবঙ্গ আর এলাচ কিনে এনে তোমাকে দিতে দিতে বুঝাই কি করে এই মশলা জলে ফুটিয়ে গরম করে চায়ের সাথে খেলে সর্দি সেরে যায়।...সেই তুমি কেন আমার মুখে সব এলাচ ছুঁড়ে মারছো? দেখে মনে হচ্ছে ভীষণ রেগে আছ তুমি!

'ইউ আর সো একসেন্ট্রিক, অবন্তিকা! ইউ ক্যান নেভার বি হ্যাপি ইন লাইফ! কেন তুমি আমার দেওয়া উপহারগুলো আমারই ডেস্কে রেখে চলে গেছ? চাকরি ছেড়েও শান্তি হয় নি? আমাকে তোমার পুরোপুরি ভুলে যেতে হবে? আমাকে মুছে ফেলতে হবে তোমার স্মৃতি থেকে? তাহলে এই নাও! আমিও তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি...'

'না- না- আমার কথা শোন! একবার আমার কথা শোন!'

'কিচ্ছু শুনব না আমি...শোন, তুমি কোনদিন আমাকে ভুলতে পারবে না! আমার স্মৃতি তোমাকে সারা জীবন পীড়া দেবে! মনে রেখো-'

৫

আর কি ঈর্ষা ছিল তোমার, নিকোলাস! অফিসে একদিন ফিন্যান্সের মাহবুব ভাইয়ের সাথে কি একটা কথায় হেসে উঠতে গিয়ে দেখি তুমি ভ্রু কুঁচকে, থমথমে মুখে আমাকে চেয়ে দেখছো। হঠাৎই আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগে। অফিসে অন্য ছেলেদের সাথে কথা বলার সময় নিজে থেকেই একটু সাবধান হয়ে যেতে থাকি। বেশি হাসলে নিকোলাস যদি? দূর, কে এই নিকোলাস? কোথা থেকে উড়ে আসা এক বিদেশী! এর জন্য আমি আমার স্বদেশী মানুষদের সাথে...আমারই দেশে ও আমারই ভাষায়...প্রাণ খুলে একটু কথা বলতে পারবো না? একটু জোরে হাসতে পারবো না? ছেলেরা কি সব দেশেই এমন হিংসুটা হয়? আমার প্রথম দুই প্রেমিকই খুব ঈর্ষা ও সন্দেহকাতর ছিল বলে সেই প্রেমগুলো টেঁকে নি! বিশেষতঃ দ্বিতীয় প্রেমিক...জনৈক বামপন্থী...আমাকে সে পারলে রিক্সাঅলা বা চানাচুরঅলাদের সাথেও সন্দেহ করতো...সম্ভবতঃ আজো করে...বামপন্থীর এই চেহারা দেখার পর থেকে গোটা পুরুষজাতির প্রতিই আমার কিছুদিন প্রবল বৈরাগ্য দেখা দেয়...কিন্তু, ফিন্যান্সের মাহবুব ভাই যে খুব মজার মজার গল্প করতে পারে! গোটা অফিসের সব কয়টা বাংলাদেশী স্টাফের ভেতর এই লোকটাই কূট নয়। দ্বিতীয় আর একদিন মাহবুব ভাইয়ের সাথে আমাকে হাসতে দেখে নিকোলাস খানিক পর আমাকে একা পেয়ে বলেই বসলো, 'আই সি, মাহাবুব ইজ রিয়েলি স্পেশ্যাল ফর ইউ!'

ছিঃ পশ্চিমা পুরুষদের সম্পর্কে এতদিন জানতাম যে তারা উদার। স্ত্রী বা প্রেমিকাকে অনেকের সাথে মিশতে দেয়। এ ত' বাঙালি ছেলেদের চেয়ে কোন অংশে কম হিংসুটে না। বরং বেশি। আজকাল দেখি আমাকে জেরা শুরু করেছে, 'অমুকের সাথে এই কথায় হাসলে যে বড়? তমুক তোমাকে ডেকে তখন কি বললো?' ভুল করছো নিকোলাস! আমি কিন্তু একটু ফেমিনিস্ট! এত সন্দেহ আর ঈর্ষা শুরু হলে কবে যে উল্টা হাঁটা দেব তার ঠিক নাই।

*স্বভাষী বিভাষী*

*স্বদেশের ছেলের সাথে কথা যেই বলেছি স্বভাষায়,*
*বিদেশী ছেলের চোখে ঝলকালো গোপন হিংসা...*
*রক্তমুখে তীব্র বেদনা*
*সন্দেহ নিরুপায়!*

*নীলচোখ ভিনদেশী ঈর্ষা করে শ্যামবর্ণ ছেলে,*
*অনুতাপে অনুবাদ করি তাকে*
*কি আমি বলেছি স্বভাষীকে,*

*'যা কিছু কথা হয়েছিল,*
*নিছকই দাপ্তরিক কুশল বিনিময়...*
*প্রেমভাষ নয়!'*

*ভিনদেশী সহকর্মী তবু ক্রুদ্ধ বিষম,*
*'বিশ্বাস করি না নারী-*
*তোমরা ত' প্রবল ছলনা,*
*প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে সমান...*
*যে ভাষা বুঝি না আমি,*
*সে ভাষায় বলেছো বুঝি ওকে*
*না বলা প্রেমের বানী?*
*কেন অত হাসি শুধু শুধু?*
*নিছকই কুশল বিনিময়ে?*
*বিশ্বাস করি না তোমাকে!'*

*ঈর্ষায় আতপ্ত বিদেশী।*
**কান্না ও হাসির অনুবাদ**

*তোমার ত' দোষ নেই,*
*আমার কক্ষ থেকে আমিই কি ওড়াইনি লক্ষ হাসির পায়রা?*
*দর্পিত পুরুষ তুমি,*
*তোমার কি ভুল?*
*যদি সেই হাসির শব্দে তুমি*
*ফের ছুটে আসো আমার কক্ষে?*
*অন্য কোন সহকর্মীর সাথে কথা বলবার ছলে?*

*তোমার কি দোষ?*
*শোন, কথার অনুবাদ হতে পারে,*
*গল্প, কবিতা ও উপন্যাস সকল...*
*হাসির কবে কোন্ অনুবাদ ছিল?*
*কিম্বা কান্নার?*

*প্রেম আর সংরক্ত অভিমান...*
*এই যে আশ্চর্য নীরব লজ্জা,*
*ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর মতো তোমার ত্রস্ত চলা-ফেরা,*
*অর্থহীনতার সকল অর্থময়তা!*

৬

গতকাল রাস্তায় হঠাৎই একটা ডাক শুনে ফিরে তাকালাম।
'অবন্তিকা আপা! অবন্তিকা আপা!'
'মাহবুব ভাই? কেমন আছেন?'
'আর থাকা! আপনি যে রিজাইন করলেন, আর একটা দিনও ত' অফিসে আসলেন না! পিটার আজকাল আপনার কথা বলে খুব আফশোস করে!'
'পিটার?'
'হ-ব্রিটিশ বুইড়া এখন টের পাইতাছে যে অফিসে কারা কাজের লোক ছিল আর কারা ছিল না। ইন্দ্রজিৎ, নাফিসা আর খন্দকারের কথায় নাইচা শুধু আপনার সাথেই কি খারাপ ব্যবহার করছে? নিকোলাসের সাথে করে নাই? অথচ সারা অফিস জানতো যে ঢাকা অফিসে আপনারা দুইজনই কাজের লোক! আইজ আপনি আর নিকোলাস থাকলে অফিস কোথায় যাইত? সেই নিকোলাসও ত' পিটারের ক্যাট ক্যাট কথার জ্বালায় টিকতে পারলো না!'

'নিকোলাস নেই?'
'কবে চইলা গেছে! আপনি রিজাইন করার মাস তিনেকের মাথাতেই ত' চইলা গেল!'
'ওহ...আবার কি আমেরিকাতেই ফিরে গেল?'
'না- এখন শুনছি বাগদাদে। ইরাকে চলে গেছে। যাবার আগে খুব চুপচাপ হয়ে গেছিল। আগে যেমন সারাদিন খাটত আবার সারাদিন সবাইরে হাসাইত, গল্প করতো...তেমন মানুষটা আর ছিল না! আপা, হাতে কি খুব তাড়া? চলেন না, কোথাও বইসা একটু চা খাই। ভাগ্যে পুরাণো মানুষের সাথে দেখা হইয়া গেল!'
চায়ের দোকানে বসে অনেক গল্প করেন মাহবুব ভাই। খুব রিসেন্টলি বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন তিনি। অফিসে ইন্দ্রজিৎ-এর করাপশনে কোটি ডলারের দুইটা প্রজেক্ট পেতে গিয়েও পাওয়া যায় নি। ফিল্ডের ব্র্যাঞ্চগুলোও স্থবির। নাফিসা ও খন্দকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও আলস্য চরমে। পিটারের অবস্থা শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়রে'র মতো। একটু স্বাধীন কণ্ঠস্বরের জন্য যে দু'টো মানুষের সাথে পিটার সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করেছেন...সেই নিকোলাস ও আমার নাম ধরেই নাকি বৃদ্ধ এখন প্রায়ই মন খারাপ করেন। তবে, স্বকৃত পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্তও করা শুরু করেছেন পিটার। গত মাসে ইন্দ্রজিৎকে স্যাক করেছেন তিনি। অফিস যদি এখন আবার একটু ঠিকঠাক হয়!
'আপা, এখন কোথায় আছেন?'
'আছি- ছোটখাট একটা জায়গায়!'

'আমি কই কি...একবার পিটারের সাথে আইসা দেখা করেন। না হয় ইন্দ্রজিৎ হারামজাদার উস্কানিতে একদিন সে আপনারে দুইটা বকা দিছে...বাপেও ত' মেয়েরে বকা দেয়...কি দেয় না? পরে ত' বুড়া মানুষ আপনারে অনেক রিকোয়েস্টও করছে...বুড়া মানুষটারে অত কষ্ট দিয়া চইলা আসা কি আপনার ঠিক হইছে?'

একটু খারাপ আমারও লাগতে থাকে। পিটার আসলে অত খারাপ ছিল না। সত্যিই...বাবার বয়সী মানুষটার সাথে চলে আসার আগে অতগুলো কড়া কথা না বললেও আমার চলতো! আর এত কথা শোনানোর পর এখন আর ফিরে গিয়ে দেখা করা যায় না। কিং লীয়র...কিং লীয়র...প্রত্যেক বৃদ্ধের আত্মায় একজন করে কিং লীয়র বাস করে...আমার সরকারী চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত, অভিমানী বাঙালি বাবার ভেতর যেমন ছিল...পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইউ,এন,-এর নানা প্রকল্পের সাঁশালো পরিচালক হিসেবে কাজ করা পিটার আর্মস্ট্রংয়ের ভেতরও সেই সরল ও আপন দুই কন্যা দ্বারা প্রতারিত, বৃদ্ধ রাজার কিছু অংশ রয়েছে। আমি কি রূঢ় কিন্তু সত্যভাষিনী কর্ডেলিয়া? যে বাবাকে জানায় লবণের মতো ভালবাসা? আর নাফিসারাও চিরকাল থাকে বৈকি! চিনি আর মিছরির মত ভালবেসে যে বৃদ্ধ পিতাকে তারা জেলে পোরে! অসহায় বৃদ্ধ কোথায় আর কার কাছে যাবে? কত জায়গায় কাজ করলাম। কত জায়গায় মেজাজ দেখালাম। কিন্তু পিটারকে নিয়ে আমার ভেতর যে অপরাধবোধ তার সাথে আর বৃদ্ধ এবং কর্তৃত্বপরায়ণ পিতার সাথে রাগ করে ঘর ছেড়ে যাওয়া অভিমানী কন্যার ভেতরের অপরাধবোধেরই কেবল তুলনা চলে। শেক্সপীয়রের 'কিং লীয়র'-এর রাজত্ব কি আসলে কোন প্রতীকী রাজত্ব? যৌবনের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পৌরুষ ও কর্মজগতের মালিকানা হারিয়ে পুরুষ যখন বৃদ্ধ হয়...তখন তার যে প্রবল অসহায়ত্ব...আত্মজাদের সে জড়িয়ে ধরতে চায়...সত্যবাদী আত্মজা জানায় পিতার চেয়ে স্বামীকে সে কম ভালবাসবে না, মিথ্যুক কন্যারা মিষ্টি কথা বললেও পরবর্তীতে বাবাকে সংসারে বিড়ালের মূল্যটাও দিতে চায় না...মাহবুব ভাই বকবক করেই যাচ্ছে। না, উনি অবশ্য 'কিং লীয়রে'র উপমা দেন নি। কিন্তু ওনার কাছ থেকে পিটারের কথা শুনতে শুনতে ধাঁ করে এসব কথা মাথায় আসছে। মাহবুব ভাই সেই আগের মতোই সহজ সরল আছে দেখছি। বেচারা নিকোলাস, এহেন মানুষকেও প্রতিদ্বন্দী ভেবে ঈর্ষা করেছে বিভিন্ন সময়!

'পিটারও বেশিদিন নাই। ইন্দ্রজিৎকে স্যাক করার পর সে নিজেও রিজাইন করছে। আর দু'তিন মাস থাইকা...হাজার হোক প্রজেক্ট ডিরেক্টর...আপনার আমার মতো এক মাসের নোটিশ দিয়া ত' যাইতে পারে না... আর নতুন প্রজেক্ট ডিরেক্টর আসার পর সে চলে যাবে!' মাহবুব ভাই লাচ্ছির গ্লাসে স্ট্র-তে ফুঁ দেয়।

'তার মানে নিকোলাস নেই, এইই তো?' আমি পুনরায় উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাই।

চুলায় যাক ইন্দ্রজিৎ, সুজানা, এ্যালেক্স, নাফিসা, খন্দকার (অফিসে আমার শত্রুদের ভেতর যে সবচেয়ে বেশি শত্রুতা করেছিল)...শত্রুকেও ক্ষমা করে দিতে পারি যদি নিকোলাসের নামটা আর একবার কাণে শুনতে পাই।
'নিকোলাস ত' বহুদিন ধইরাই নাই। সে আর নতুন কি খবর?'

*আদিগন্ত ঘূর্ণি হাওয়া*

*আদিগন্ত ঘূর্ণি হাওয়ার মতো*
*সশব্দ ছুটে আসো তুমি*
*বারবার আমারই কক্ষে,*
*কি বলতে চাও তুমি?*
*ও বিদেশী ছেলে?*

*তুমি ত' দেবতা জিউস!*
*বজ্র-বৃষ্টির অবিসংবাদিত নায়ক!*
*তুমি আসা অর্থ আকাশে ঝলসাবে বজ্র*
*(বজ্র, বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী,*
*সেকি সহজ গান?)*
*অকৃপণ শস্পা উদ্ভাসে মুখরিত হবে মেঘ-*
*তুমি আসো নামহীন অজস্র ছুতোয়,*
*কখনো কলম চাইতে-*
*কখনো প্রতিবেদনে আচানক ব্যবহৃত*
*কোন বাংলা শব্দের অর্থ জানতে,*
*যদিও বন্ধনীতে তার অর্থ দেওয়া ছিল!*

৭

কাল টিভিতে সংবাদে বাগদাদে আত্মঘাতী গাড়ি হামলায় কিছু মার্কিনীর মৃত্যুর খবর শুনলাম! আশা করি তুমি সেই গাড়িতে ছিলে না। অদ্ভুত ব্যপার হলো আমাদের পুরো পরিবার একটা সময় বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িত থেকেছে। 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক নিপাত যাক!' শ্লোগান শিখতে শিখতে আমি বড় হয়েছি। তোমার সাথে পরিচয়ের সপ্তাহ খানেকের মাথায় একদিন বলেও ফেলেছিলাম কিভাবে বাংলাদেশের স্বাধীণতা সংগ্রামে আমাদের বিরোধিতা করেছে তোমার দেশ। পাঠাতে চেয়েছে সপ্তম নৌবহর। বাংলার শেখ মুজিব, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ আর চিলির আলেন্দের মতো তৃতীয় বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক নেতাকে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হত্যা করেছে, আফগানিস্থানে

সোভিয়েতদের পতন ঘটাতে তালিবান বাহিনী যে তোমার দেশেরই সৃষ্টি...এসব বেশ জোরের সাথে যখন বলছিলাম, তোমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছিল। শেষে হেসে বলেছিলে, 'এসব অভিযোগ সত্যিই অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এশিয়া, আফ্রিকা আর ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন পলিসি বড়ই জনবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক। আই ডু এগ্রি উইথ ইউ।'

...আমেরিকা অনেকের কাছেই স্বপ্নের এক দেশ। আমারই দু'তিনটা ভাই ও বেশ কিছু কাজিন থাকে সে দেশে। আমার কখনো যেতে ইচ্ছাই করে নি। কিন্তু, আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয় একবার যাব সেখানে! *'টম! লণ্ডন!'* এই দু'টো মাত্র শব্দ সম্বল করে এক বেদুইন কন্যা জাহাজে চেপে লণ্ডন শহরে পৌঁছে খুঁজেছিল তার ইস্পিতকে এবং নাকি পেয়েওছিল! আমিও যদি তোমার দেশের সবগুলো অঙ্গরাজ্য খুঁজে খুঁজে একদিন পৌঁছে যাই তোমার বাড়ির দরোজায়? কি মজা হবে তখন, না? নাকি মির্চা ও মৈত্রেয়ীর মতো আর বৃদ্ধ বয়সে দেখা হবে আমাদের? মির্চা-মৈত্রেয়ীর প্রেমে মেয়েটির বাবা ভিলেন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের প্রেমে কারা ভিলেন ছিল? যে কোন মিশ্র প্রেমে যারা ভিলেন হয়! খোদ পিটার আমার পাশে তোমাকে দাঁড়াতে বা বসতে দেখলে উসখুস করতো...যা সে নাফিসা বা অন্য কোন মেয়ের পাশে তোমাকে দেখলে করত না! তুমিও তাই শেষের দিকে পিটারের সামনে আমাকে এড়িয়ে চলতে। বৃদ্ধ কি কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন? শ্বেতপক্ষে আমাদের ভাল লাগা আরো সহ্য করতে পারে নি সুজানা! আশ্চর্য এই শ্বেতাঙ্গ নারীদের মন! সে নিজে ত' দিব্যি এক সোমালীয় কালো ছেলেকে বিয়ে করেছে। তবু সে সহ্য করতে পারত না যে তুমি আমার সাথে মেশো! আর অফিসের বাঙালি বা এশীয় পক্ষে তোমার পাশে আমাকে সহ্য করতে পারে নি নাফিসা, খন্দকার, ইন্দ্রজিৎ ত্রিপুরা সহ আরো কেউ কেউ।

*নক্ষত্রদীপ*

*ও নীল চোখের ছেলে তুমি,*
*শিউরে উঠছো কালো চোখ*
*এই মেয়েটির দৃষ্টিতে,*
*ভেসে যাচ্ছ অচিন পুরুষ*
*তাম্রবর্ণার শরীরের ধারাপাতে-*

*তোমার চোখে মুগ্ধতার অবিনশ্বর আলো,*
*তোমার শ্বাসে বনস্পতির ঘ্রাণ-*
*শিকার শেষে ক্লান্ত হলে যুবা?*
*মৃতা হরিণীর রক্তে হোক অবিশ্বাস্য স্নান!*

*আজ বৃষ্টির মতো চুল ছেড়েছি,*
*কপালে এঁকেছি সূর্যের মতো টিপ-*
*তুষার দেশের ছেলে এসো আজ*
*জ্বালি নক্ষত্রদীপ!*

*আমার ঘর আজ অলৌকিক সঙ্গীতের,*
*ধূপ, মোম, ফুল ও লাক্ষা, অগুরুর*
*এ সব তোমারি জন্য বিদেশী!*

*ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি,*
*রেখেছি কনক মন্দিরে তব কমলাসন পাতি!*

৮

অনেক দিন থেকেই এক জায়গায় আটকে আছি। খুব ছোট-খাট জায়গায় একটা কাজ করছি। আজকাল কোথাও বের হই না। দিন শেষে ঘরে ফিরে...হাস্যকর...বুড়ো বয়সে নতুন করে শিক্ষক রেখে গান শেখা শুরু করেছি। ছোটবেলায় একসময় ত' শিখেছি। কৈশোরের শেষে প্রবল অসুখে গান বাদ দিয়েছিলাম। ঝুঁকে পড়েছিলাম লেখায়। এখন আবার পুরণো তানপুরাতেই নতুন তার বাঁধছি। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের সুরে ভুলতে চাচ্ছি তোমাকে। লাভ নেই। তোমার অভিশাপ অব্যর্থ। তোমাকে কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। এ কথা ঠিক যে আজ দু'বছরের উপর চোখের দেখা না থাকায় আজকাল আবার আমি প্রবল কেজো। সকালে উঠে অফিস। সারা দেশের নানা ছোট-বড় কাগজে অনুরোধের ঢেঁকি গেলা টাইপ লেখা দেওয়া। ভাল চাকরির খোঁজ।... নতুন প্রেমে পড়ি নি গত দুই বছরে। তোমার সাথে আমার শেষ দেখা ২০০৯-এর জানুয়ারিতে। এরপর আর কোন প্রেমে পড়া হয় নি আমার। পড়তে পারি নি। সেদিন ফেসবুকে সার্চ দিয়ে তোমাকে দেখলাম। কিন্তু, ফ্রেণ্ডশিপ রিকোয়েস্ট পাঠাই নি। কোনদিন পাঠাবো না। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখব তোমাকে। সেদিন গুগলে সার্চ দিয়ে শ্রীলঙ্কা সমস্যার উপর তোমার লেখা একটা পেপার দেখে কাঙালের মতো ডেস্কটপে সেভ করে রাখলাম। এই পেপারের প্রতিটা অক্ষর যে তোমার লেখা! মাঝে মাঝে কল্পনা করি যেন ফ্লাইং সসারে চেপে মহাশূণ্যের কোন এক স্থানে তোমার সাথে আমার দেখা হলো। ভিন্ন কোন গ্রহে? মঙ্গল গ্রহে? বাগদাদ কত দূর ঢাকা থেকে? কখনো কখনো কল্পনা করি গাধার পিঠে চেপে আমি যেন নিখাদ এক আরবীয় মেয়ে...পুরণো বাজারের রাস্তায় পানি আনতে বের হয়েছি...সেখানে তুমি এলে! তুমিও আরব পোশাক পরেছো। তোমাকেও আরবীয় পুরুষের মতো দেখাচ্ছে! একটা পাকা ডুমুর ফলে ভরে যাওয়া

গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তুমি বললে, 'নেকাব খুলবে? তোমাকে এর আগে কোথায় দেখেছি যেন?'
আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'কোথায় আবার? পদ্মা-মেঘনার অববাহিকায় তুমি আমাকে দেখেছো। এখন দেখছো এই দজলা-ফোরাতের দেশে!'
'ওহ্, দাঁড়াও! তুমি অবন্তিকা, না? না- না- তুমি শেহেরজাদি! যে একহাজার এক রাত ধরে গল্প বুনে চলে!'
'না বুনে উপায়? যতদিন- যতদিন তোমার ও আমার এই প্রণয় ও বিরহের ঋতুসম্ভব আখ্যান সম্পন্ন না হয়...ততদিন ত' আমাকে গেঁথে যেতেই হবে একহাজার ও একটি গল্পের মালা!'
'বাংলাদেশে...*ইন দ্য মান্থ অব অক্টোবর...ইউ টুক মি টু আ টেম্পল এ্যাণ্ড টোল্ড আ মিথ বিফোর দ্য আইডল অফ আ গডেস্...দ্য মিথ অব ব্লু লোটাস*!'
'বুঝেছি...নীলপদ্ম আর অকাল বোধনের গল্প শুনতে চাইছো তুমি!'

*অকাল বোধন*

*বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে*
*একশো আটটি নীলপদ্ম খুঁজে আনলেন রাম,*
*দেবী কাত্যায়নীকে অঞ্জলি জানাতে-*
*অকাল বোধনের বিনম্র সে অর্ঘ্য,*
*দুর্গা যেন চপলা বালিকা কোন,*
*অলক্ষ্যে চুরি করলেন একটি নীলপদ্ম-*
*এদিকে পূজার লগ্ন বুঝি বয়ে যায়!*
*পুরোহিত আশঙ্কাগ্রস্থ...*
*নীল চোখে তীর ছোঁয়ালেন রাম,*
*'অয়ি ঈশানী! মা চণ্ডী!*
*লোকে বলে আমার চোখ নীলপদ্মের মতো,*
*তবে এই অঞ্জলি পূর্ন হোক ভগবতী!'*

*সহাস্য প্রতিমা তখন ফিরিয়ে দিলেন পদ্ম.*
*বললেন, 'যথার্থ পত্নীপ্রেম তোমার! রণজয়ী হও!'*
*তোমার চোখও অম্লি নীলপদ্ম জেনো!*

*ঐ শোন, পূজার ঢাক বাজছে!*
*বাতাসে শিউলির ঘ্রাণ,*
*যদি কোন রাক্ষস হরণ করে আমাকে,*
*তুমিও কি অকাল বোধনে*
*অমন অঞ্জলি দেবে?*

৯

'অ-ব-ন্তি-কা-'

ঘুমের ঘোরে কে ডাকছে আমায়।

'না- না- আমাকে ডেকো না- আমি কদর্য এশীয়...আই এ্যাম এ্যান আগলি এশিয়ান!'

'কে বলে তুমি কদর্য? তোমরা দক্ষিণ এশীয় মেয়েরা পৃথিবীর মাঝে সুন্দরীতমা! তোমাদের শরীর শ্বেত নারীদের মত শীর্ণ ও বালকস্বভাবা নয়। ষঢ়ঋতুর ফুলের সম্ভার তোমাদের দেহে। *প্রব্যাবলি দ্য মোস্ট বিউটিফুল ওমেন্স বডিস ইউ ওমেন ডু পোজেজ হেয়ার...ওলমোস্ট একিউরেট কার্ভস...মনসুন ক্লাউড হেয়ার...* জলপাই ত্বক, কালো চোখ আর কালো চুলে কিছুটা দক্ষিণ আমেরিকার মেয়েদের সাথেও মিল আছে তোমাদের। তোমরা না অতিশয় কৃষ্ণ, না অতিশয় পাণ্ডুর...'

'সরে যাও- সরে যাও- তুমি মার্কিনী! ইয়াঙ্কি! তোমাকে ভালবাসলে আমার বামপন্থী বন্ধুরা আমাকে ধিক্কার দেবে! কেন আসো তোমরা আমাদের দেশে? চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে? বাগদাদের সব তেল নিয়ে নিতে? কেন আসো তোমরা বাংলা, আরব আর বলিভিয়ায়? যাও!' হঠাৎ আমি অকারণেই যেন ক্ষেপে উঠলাম।

'এভাবে কথা বলবে না অবন্তিকা! আই এ্যাম নট এ্যান সিআইএ এজেন্ট! আমার বাবা ভিয়েতনাম যুদ্ধে যেতে চান নি বলে তাকে জেল খাটতে হয়েছে!'

'আমি তোমার উপনিবেশ নই! আই এ্যাম নট ইওর কলোনী! অফিসের সব ফ্রাস্টেশন, সব যন্ত্রণা রোজ তুমি আমার ওপর ঝাড়ো। যেন তোমার টর্চার নিতেই আমার জন্ম! নাফিসার সাথে পারলে গিয়ে করো। কিম্বা, সুজানার সাথে! তুমি ওদের দু'জনের সাথে সব সময় ভেজা বেড়ালের মতো ভদ্র ব্যবহার করো। ঐ দুই খাণ্ডারনি সারাদিন আমার সাথে যতই খারাপ ব্যবহার করুক, তুমি ওদের সামনে ওদেরই পক্ষ নেও। আমাকেই বকা দাও। তারপর একা হলেই তোতা পাখির মতো বলবে, আই এ্যাম সরি অবন্তিকা! না- অনেক ক্ষমা করেছি তোমাকে! আর না!'

'বোকা মেয়ে...ছেলেরা যাকে ভালবাসে তার পক্ষ কি সবার সামনে নিতে পারে? আসলে নাফিসা আর সুজানা দু'জনেই আমার উপর একটু উইক। তাই তোমাকে যে আমি একটু আলাদা চোখে দেখি...এটা ওরা সহ্য করতে পারে না বলেই তোমার সাথে মিসবিহেভ করে...আমি সেটা বুঝেই ওদের...'

'সেটা বুঝে কি? লজ্জা করে না তোমার? ঘরে বউ রেখে আমার ডেস্কের পাশে কাজে-অকাজে দিনে চোদ্দবার আসো...আবার সুজানা নাফিসার মাথায়ও

সান্তনার হাত বোলাতে চাও...একটা সুন্দর চেহারার জোরে অফিসের সব মেয়ের সাথে প্রেম করতে যাও...ইউ হিপোক্রিট প্লেবয়!'

'তুমি তোমার লিমিট ক্রস করছো অবন্তিকা!'

'লিমিট আমি ক্রস করছি না তুমি? অফিসের অন্য কোন ছেলের সাথে তুমি আমার কথা বলা সহ্য করতে পারো না...সারাক্ষণ আমাকে চোখে চোখে রাখো...সারাক্ষণ তোমার সন্দেহ...কি অধিকার আছে তোমার আমার উপর? আমি তোমার অনেক কলিগের একজন। ব্যস, এর বেশি ত' কিছু না! তুমি নাফিসা আর সুজানার সাথে গল্প করতে পারবে। কিন্তু আমি এ্যালেক্স কি মাহবুব ভাইয়ের সাথে গল্প করতে গেলে দোষ, না? এই নাও...তোমার সব প্রেমপত্র আমি ছিঁড়ে ফেলছি...এই ই-মেইলের প্রিন্ট আমি ছিঁড়ে ফেলছি...*আই নো লঙ্গার ওয়ন্ট টু রিমেইন দ্য শাই এণ্ড মিস্টেরিয়াস ইস্ট টু ইওর আইজ*...আমি আর লাজুক ও রহস্যময়ী পূর্ব হয়ে তোমার কাছে থাকতে চাই না- চাচ্ছি না...' আমি চিৎকার করি।

'ছিঃ এই অর্কিড রঙের কামিজে তোমাকে আজ কি ফেমিনিন লাগছিল...আর কেমন পুরুষ মানুষের মত চিৎকার করছো এখন!'

ধাঁ করে একটা চড় কষালে তুমি আমার গালে। পরক্ষণেই আমার কামিজের হাতা চেপে ধরলে প্রবল বাসনায়...

'সরো-' আমি কেঁদে ফেলি, 'আই এ্যাম নট ইওর কলোনী। আমি তোমার উপনিবেশ নই, নিকোলাস! তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘোড়া, বন্দুক আর চাবুক নিয়ে একবার এসেছিল আমাদের এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রাষ্ট্রে...আমাদের ভাষার উপর তোমরা চাপিয়ে দিয়েছ তোমাদের ভাষা...আমাদের ধর্ষণ করে তোমরা জন্ম দিয়েছ অনেক বর্ণসঙ্কর!'

'আর যদি প্রেম হয় আমাদের?'

'নো- ইউ ইম্পেরিয়ালিস্ট! তোমার সাথে আমার প্রেম হয় না- প্রেম হতে পারে না!

উত্তরে তুমি আমাকে প্রবল ভাবে জড়িয়ে ধরলে...এবার আর প্রেম নয়...আমি তোমার ভেতর ঔপনিবেশিক প্রভুদের জোরটা টের পাচ্ছি নিকোলাস! দ্রুতগতি বাষ্পীয় শকট, অশ্ব, ইঞ্জিন চালিত রেল, চাবুক, সমুদ্রগামী জাহাজ, ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের পশ্চিমা প্রতাপ! উত্তরে আমাদের আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন, চরকা ও স্বরাজ, ম্যাঞ্চেস্টার বনাম *মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই/ দিন দুঃখিনী মা যে তোদের এর চেয়ে বেশি সাধ্য নাই*, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, র‍্যাডক্লিফ ও দেশভাগ, জাতিসঙ্ঘ, বিশ্বব্যাঙ্ক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, স্ট্যাচু অব লিবার্টি, ডলারের গায়ে লেখা 'ইন গড উই ট্রাস্ট,' তামা রং ভারতীয়দের উপর গোরা সৈন্যের হামলা...কেন আমি

এমন? সবকিছুতেই আমি কেন রাজনীতি না ভেবে পারি না? অথচ, আমার প্রতি তোমার মুগ্ধতাকে নাফিসার কত যে ঈর্ষা! কিন্তু...এত জোরে তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছো কেন? কেন গুঁড়িয়ে দিতে চাইছ?

*নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড*

*আমরা দু'জন ছুঁয়ে যাচ্ছি,*
*ভেঙ্গে ফেলছি পরস্পরের সীমান্তদেশ,*
*সীমানারেখা, নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড...*

*আমরা দু'জন দু'টো পৃথিবী-*
*দুই মহাদেশ, ভিন গোলার্দ্ধ*
*নিরক্ষ ও বিষুব রেখার দু'জন মানুষ,*
*আমরা দু'জন ভালবাসছি! ভালবাসছি!*

*এই বাংলার মেয়েরা জেনো যাদুকরী,*
*তাম্রবর্ণা শরীরগুলো আগুনমুখো,*
*পললবহা, বান ভাসাবে-*
*গলিয়ে দেবে তোমার তুষার,*
*গ্রীষ্মদেশের প্রবলা নদী।*

*আমরা দু'জন ছুঁয়ে যাচ্ছি,*
*ভেঙ্গে ফেলছি পরস্পরের সীমান্তদেশ,*
*সীমানারেখা, নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড!*

'ছাড়ো! ছাড়ো!' আমি জোরে ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করি।

'তুমি বিভ্রান্ত অবন্তিকা! তোমার চোখে আমার প্রতি প্রেম আছে! কিন্তু, একই সাথে তুমি জাতীয়তাবাদী...পশ্চিমের ছেলে বলে তুমি আমাকে গোটা পশ্চিমের সাথে গুলিয়ে ফেলছ! উপনিবেশকারীদের সাথে গুলিয়ে ফেলছ? তাই সমর্পন করতে এসেও সরে যাচ্ছ!'

'তুমিও কি আমাকে পূর্বের উপনিবেশ হিসেবে, চির লাজুক-শান্ত-শ্যামল হিন্টারল্যাণ্ড বা পশ্চাৎভূমি হিসেবে গুলিয়ে ফেলছো না? তোমার চোখেও প্রেমের পাশে সেই মালিকানাবোধই দেখতে পাচ্ছি। যে মালিকানার গৌরব নিয়ে তোমরা আমাদের তেলখনি, শস্যক্ষেত আর সমুদ্র বন্দরের দিকে তাকাও! কিন্তু, কতদিন এমন হবে? এমনই থাকবে সব? আমাকে ছেড়ে দাও!'

'ভুল অবন্তিকা! ভুল! থার্ড ওয়ার্ল্ড কম্যুনিজম তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। রাদার লেট আস লাভ ইচ আদার!'

তুমি পুনর্বার আমার কাঁধের কাছটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করো।
'এবার তোমার মার্কিনী চেহারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সরো!' শেষবারের মতো আমি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করি, 'আই এ্যাম নট ইওর কলোনী! আমি তোমার উপনিবেশ নই!'

১০

...শাদা হাওয়ার উপর দিয়ে আমি হাঁটছিলাম নিকোলাস...বাতাসে বাতাসে যখন ঝুলছে অবাচীনতা...প্রজ্ঞারা বাক্সবন্দী...আসলে শাদা হাওয়ার উপর দিয়ে আমি হেঁটেছিলাম কি? আমার জুতো মৃত্তিকার আধা ইঞ্চি ওপরে...তখনো চরাচরের সবুজ ঘাস শিশিরে আচ্ছন্ন...কিন্তু, আমি সহসাই পৌঁছে গেলাম তোমাদের কাঁচ ঘরে... তুমি আমার ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়ালে, যেমন আগেও দাঁড়াতে...আমার হাতে তুলে দিলে তুমি কয়েকটি কাগজ।
'কি এগুলো?'
'আমি তো তোমার ভাষা পড়তে পারি না। আমার টেবিলে এই কাগজগুলো তুমি রেখে গেছিলে। তোমাদের ভাষায় লেখা...এক বছর আগে তুমি রেখে গেছিলে আর আমি সেই থেকে এই কাগজগুলো পাহারা দিয়ে চলেছি।'...

*ডিসেম্বর ২০০৮-জানুয়ারি ২০১১*

# ইন্দুবালা, শিউলি ফুল ও মাঘন ঋষির মৃত্যু

*'শিউলি ফুল শিউলি ফুল*
*এমন ভুল এমন ভুল'*

যেমন শিউলি ফুল আশ্বিনে ফুটে থাকবে থরে-বিথরে। এই আমানুল্লাপুর গ্রামে বেশ কয়েকটা শিউলি গাছ থাকায় দুর্গা পূজার আগে থেকেই সেই ফুলের বাস রাতে ছড়াতে থাকবে আর সকাল না হতেই এ গ্রামের মাঘন ঋষিদের বাড়ির উঠান ছেয়ে যাবে, ঢেকে যাবে লাল কি কমলা বৃন্তের সেই সাদা ফুলে! অবস্থা এমন যেন দু' পা ফেলতে গেলেও পা মাড়িয়ে যাবে ফুলের পাপড়িতে। তবু, মাঘ মাসেও...আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ পার হয়ে সেই মাঘ মাসেও শিউলি ফুল ফুটেছিল। যেমন মাঘ মাসেই মাঘন ঋষির জন্ম হয়ে থাকবে। সেটা ১৯৭০ সাল। চারদিকে এই মুচি পাড়াই হোক আর ব্রাহ্মণ পাড়াই হোক, হিন্দু কি মুসলমান পাড়া...সবখানে শুধু নৌকার গল্প শোনা যাবে। অগ্রহায়ণে দেশের কোন্ সমুদ্দুর পাড়ে খুব এক ঝড় হবি নে! সেই ঝড়ে লাখে লাখে মানুষ মরবি নে! বেবস্ত্র সোমত্থ নারী-পুরুষের ছবি পেপারে ছাপা হবি নে! মাঘন ঋষির বাপ আঘন ঋষি এই গ্রাম ছাড়িয়ে থানা শহরের সবচেয়ে জমজমাট মোড়টায় বাবুদের জুতা সেলাই আর পালিশের বাক্সটি নিয়ে রোজকার মতো বসতে গিয়ে প্রায় প্রতিদিনই অদ্ভুত নানা ঘটনা দেখে বাড়ি ফিরবে আর সেই সব গল্প সে আর কার কাছে করবে? পেটটা পেল্লায় ভারি হতে থাকা পোয়াতি বউয়ের কাছে ছাড়া?

'জানিস বউ, আজ জুতা পালিশ করতি সেই একেবারে সাতক্ষীরা শহরে চলি গিছিলাম। কি মিছিল! মিছিলের সামনি সামনি একটো করে নৌকা! আর কি সব শ্লোগান! পিণ্ডি না, ঢাকা! তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা!'

'পিণ্ডি কি গো?'

'ঐ মাউরারা যেকেনে থাকে তার রাজধানি হবি নে! শোন্ বউ, সাতক্ষীরায় কাল ভাসানী আসবে। আর আগামী শনিবার খোদ শ্যাখ মজিবর!'

'তুমি ঋষি মানুষ। বাবু-সাহেবদের বুট-জুতো পালিশ করি দু'বেলা পেট চালাও! তোমার এতে কি?'

এমন খোঁটাতেও আঘন ঋষি রাগ করবে না। বরং সরল হেসে বলবে, 'সবাই বলতিছে যে দেশ স্বাধীন হলি মুচি-বামুন থাকবি নানে, হিন্দু-মুসলমান থাকবি নানে, বাঙালি-বিহারি থাকবি নানে...

'হুঁ...মানষি কত তা' বলে আর তুমিও য্যামন নাচ!'

'নাগো বউ!' চারদিকে একটু তাকিয়ে লজ্জা লজ্জা করে গেঞ্জির নিচ থেকে দু'টো রঙ-বেরঙ ছবির পোস্টার বের করে আনবে আঘন, 'দ্যাখ! এতে কি লেকা জানিস? থানা শহরের যে চৌরাস্তার ল্যাম্প পোস্টের নিচে রোজ আমি আমার জুতা পালিশের বাক্স নিয়ি বসি, সেকেনে আজ কলেজের ছাত্ররা আসিছিল। ঠিক ল্যাম্প পোস্টের উপরই তারা এই পোস্টার দু'টো সেঁটে কত বক্তৃতা! 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' আর কাজ করতি করতি টায়ার হলি পর মোড়ের চা দোকানের সামনে আমার গ্লাসটি নিয়ি যখন যাই...মুচিকে দোকানের গ্লাস-কাপ ত' ওরা দেবে নানে...তাই নিজির এই কালাই করা গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ি যখন বলি, 'সাহেব! দাও মোরে এট্টু চা!'...আজকাল কি ভারি আজব জিনিস জানিস ত' বউ...দেশে একন শুদু গোলমাল, শুদু ঝকমারি...এই কলেজের ছাত্ররা আজ গাড়ি ভাঙতিছে কি কাল টায়ার পুড়াতিছে, পুলিশ শুদু ফায়ার করতিছে...তবু কেমন জানি বড়লোক-ছোটলোক ভেদ কমি যাতিছে, 'বিসমিল্লা' চায়ের দোকানের মালিক রহমান সাহেব আজ আমারি বেঞ্চিতে বসতি বললো...তা' দ্যাখ ঐ বেঞ্চিতে বামুন-কায়েত কি ভদ্রলোক মুসলমানরা বসে, আমার কি বসা ঠিক হয়? কিন্তু তবু রহমান সাহেব আজ কইলো কি, বসো গো আঘন! মুচিই কি আর রিক্সাঅলাই কি...রাম-রহিমই বা কি...আমরা সবাই বাঙালি! হ্যাঁ রে বউ, 'বাঙালি' মানে কি? তা' শোন্ তখন ধবধবা সাদা শার্ট-প্যান্ট আর খদ্দরের চাদর পরা কয়েকজন ছাত্র কইলো, রহমান ভাই- আমাদের আঘন দা'কে দোকানের কাপেই চা খেতে দাও। ও তো পয়সা দিয়িই চা খাবে, নাকি? আর ইসলামে দ্যাখো কোন জাতি ভেদ নাই কিন্তু। এ হিন্দুদের দেখাদেখি আমাদের মন্দ অভ্যেস।

রহমান সাহেব লজ্জা পায়ি কইলো- খাক না দোকানের কাপে চা। মানা করতিছি নাকি?

আমিই শরম পেয়ে কইলাম, না- না- আমার নিজের গ্লাসেই চা খেয়ে অভ্যেস। তা' বাদে কলেজের ছেলেরা আমাকে বেঞ্চিতে বসতে কইলো। আমি অবশ্য বসিনি রে বউ, ওদের কাপে চা-ও খাই নি কো। কারণ ভদ্রলোক জাতরে বিশ্বাস নেই। সে বামুন-মুসলমান যাই হোক...কলেজে গেলো কি দু'পাতা ইংরিজি পড়লো...অম্নি আজ কি মনে করি তোমাকে মাথায় তুলবি নে, কাল যে ছোট জাত বলি পাছায় লাথি কষাবি নানে...তার কি গ্যারান্টি বল্? তয় কি কলেজের ছাত্ররা বক্তৃতা করে ভাল! আমাদের পেপার পড়ে শোনায়। ঢাকায় ভাসানী নাকি বলিছে...কি জানি বলিছে...হুম্, আয়ুব আর ইয়াহিয়া খানেদের

'আসসালামু আলাইকুম' বলিছে...এর মানে হইলো বিদায়...ঐ যে সুমুদ্দুরের পাড়ে ভোলার চরে ঝড়ে লাখে লাখে মানুষ মরিলো, বউ-বিটিদের উলঙ্গ ছবি সব ছাপা হলো নিউজ পেপারে...অথচ খানেদের সরকার কুনো রিলিফ-কাপড় কি খাবার না দিল...তাতেই মৌলানা সাহেব রাগ করিছেন! আর দ্যাখ এই পোস্টারে কি লেকা? আমি পড়তি না পারলিও তুই ত' পড়তি পারিস। শ্বশুর মশায় তো তোকে পড়া শিখিয়েছে। তুই ত' রামায়ণ পড়তি পারিস। এখেনে নাকি লেখা 'পূর্ব বাংলা শ্মশান কেন? জবাব চাই!' ওরা কলেজ স্কুলের ছাত্র ত' বউ তাই কত কতা মুকস্ত। মাউরাদের কি কি বেশি আর বাঙালিদের কি কি কম। ছাত্ররা বলতিছে বাঙালিদের স্বাধীনতা লাগবি। বলতিছে সব বাঙালি সমান। হতিও পারে। না-ও হতি পারে। আমি ঋষি মানুষ। শুখার দিনে শহরে মুচিগিরি করি আর বিষ্টি বাদলায় ঘরে বসি বেতের কুলা, টুবরি, ঝুলি বুনি। তবু সবাই তো বলতিছে আর মাস দুই বাদেই ইলেকশন। ইলেকশনে মজিবরের নৌকা মার্কায় ভোট দিলি আমরা বাঙালিরাই নাকি রাজত্ব পাব নি...বাঙালি কি রে বউ? বাঙলা কতা বলি তাই বাঙালি? সব বাঙালি কি তাই বলি সমান হতি পারে? রিক্সাঅলা আর জজে সমান? উকিলে আর মুচিতে সমান?'

*'যদি বর্ষে আঘনে, রাজা যায় মাঘনে'*

এমনি ত' ছিল সেই গণ্ডগোল না হোক সংগ্রামের কয়েক মাস আগের কথা। সে সব কথাই কি মনে নেই আঘন ঋষির বউ আর মাঘন ঋষির মা ইন্দুবালা ঋষির? তার স্বামী আঘন ঋষির আঘন বা অগ্রহায়ণ মাসে জন্ম হয়েছিল বলে শাশুড়ির কাছে সে শুনে থাকবে। শাশুড়ি রজকিনী ঋষি তাকে আরো বলে থাকবে যে আঘন ঋষির জন্মলগ্নে সেই ঘোর অগ্রহায়ণে সত্যিই বানের ঢল নেমেছিল। এই আমানুল্লাপুর গ্রামের জিয়ালি নলতা পাড়ার ঋষি বাড়ির সামনের উঠান ভর্তি হয়ে গেছিল বৃষ্টির জলে। রজকিনীর স্বামী মাত্র দু'দিন আগেই বিষ দিয়ে কায়েত পাড়ার একটি গরু মেরে লুকিয়ে তার চামড়া এনে উঠানে রেখেছিল শুকাবে বলে। বৃষ্টিতে সেই চামড়া এখন শুকায় কোথায়? অবস্থা এমন যে পোয়াতির আঁতুড় ঘরে ব্যথা উঠবার সময় থেকে বিয়োনো অবধি দু'দিন দু'রাত সমানে বৃষ্টি....আকাশ থেকে ঢল...যেন মা গঙ্গা সাক্ষাৎ শিবের জটা থেকে মর্ত্যে কুল প্লাবিনী হয়ে নেমেছেন...যেন গঙ্গার ধারা খোদ আকাশ থেকে সমানে বেয়ে নেমে আঁতুড় ঘরে দাইয়ের জ্বালানো মাটির উনুন নিভিয়ে দেবে যে কোন সময়...ঘরে আনা একটি আস্ত গরুর কাঁচা চামড়ার গন্ধ রোদে শুকাতে না পেয়ে চারপাশের বাতাস ভারি করে তুলছে...অথচ দু' গাঁ দূরের বাদ্যকর পাড়া থেকে রতন ঢুলি শুকনো চামড়ার ফরমাশ করে গেছিল...তেমন এক বৃষ্টির রাতে...আঘন মাসের সতেরো তারিখে মাঘন ঋষির বাবা আঘন ঋষির জন্ম হয়ে থাকবে বটে! ভানু

বেওয়া দাই সদ্যোজাত শিশুকে দু'হাতে দুলিয়ে খনার বচন নামতার সুরে পড়বে, 'যদি বর্ষে আঘনে/ রাজা যায় মাগনে। দেশে ভিখের আকাল হবে কিনা আল্লাহ্ জানে! আম্মাগো!' আর আঘনের ছেলে মাঘন ঋষির জন্ম হবে গণ্ডগোল শুরুর আগে...শ্যাখ মজিবরকে মাউরারা প্লেনে বন্দি করে নিয়ে যাবার আগে...হঠাৎ করেই সাতক্ষীরা, বনগাঁ আর যশোর রোড ছাপিয়ে হাজার হাজার মানুষ ওপারে যাবার জন্য হুড়মুড় শুরু করার আগেই...যখন চান্দিকে 'বাঙালি' 'বাঙালি' বলে কান্না খুলনায় মিল কারখানায় বিহারিদের হাতে রোজ বাঙালি কাটা পড়তিছে বলে সম্বাদ মেলে...ইয়া লম্বা লম্বা নৌকা বানায়ে কলেজের ছেলেরা শুদু মিছিল করে আর বলে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো'...নৌকার লোকরা এই মুচি পাড়ায় অবধি এসে মুচি পাড়ার উঠানে বসে জল-বাতাসা খায় আর নৌকায় ভোট চায়... এদিকে শীত জাঁকিয়ে নেমেছে... সেই শীতে শহরের রাস্তায় কলেজের ছেলেরা টায়ার পোড়ালেও পোয়াতি ইন্দুবালার ঘরে হু হু জাড় আর ঠাণ্ডা... ইন্দুবালার এই প্রথম সন্তান হবে আর ভরা অবস্থা তার...সাত কি আট মাস চলছে...তবু আঘন ঋষির বাড়ি ফিরতে মাঝ রাত...ঘরে ফিরেই দু'টো খেয়েই বাপ-মা'র চক্ষুটি এড়িয়ে ইন্দুবালার ভর পেটের উপর সোহাগে কান চেপে ধরবে আর সেবার মাঘ মাসেও কত যে শিউলি ফুল ফুটবে... বুঝি সংগ্রাম কি যুদ্ধ শুরু হবার আগে... অনেক অনেক মানুষ মরে যাবার আগে গাছে ফুলের অমন অকাল ফলন হয় ঘরে ঢুকবার আগে উঠান হতে কুড়িয়ে আনা এক মুঠো শিউলি ফুল সে ফেলে দেবে অমনি অমনি ইন্দুবালার কোচড়ে...আর সেবার শিউলি ফুলের এমন ঘ্রাণ হবে...বুঝি সংগ্রাম কি যুদ্ধ শুরু হবার আগে অথবা সমুদ্দুরের পাশে ভোলার চরে বিয়ে হয়ে যাওয়া ইন্দুবালার যে কাকাতো বোন সেই ঝড়ের পর তার স্বামী-সন্তানসহ আর কোনদিন ফিরে আসতে পারে নি...যাদের লাশ ঠুকরে খেয়েছিল কাক ও শকুন আর ইন্দুবালার অশেষ কান্নাকাটিতে অস্থির হয়ে আঘন ঋষি বেশ কয়েকদিন কয়েক আনা পয়সা খরচ করে ঝড়ে মরা মানুষদের ছবি অলা পেপার কিনে এনেছিল...সেই সব ছবিতে অনেক অনেক বেবস্ত্র আর সোমথ নারী-পুরুষের ছবি ছাপা হলেও ইন্দুবালার পিঠাপিঠি বড় কাকাতো দিদি ছবিবালার ছবি তাতে ছিল না! শুধু কোন্ এক দাড়িঅলা মৌলানা সাহেব নাকি এসব ছবিতে খেপে গিয়ে ঢাকার এক মিটিংয়ে আইয়ুব খানেদের মানে মাউরাদের বলেছে 'আসসালামু আলায়কুম!' মুসলমানদের ভেতর এ কথার অর্থ অনেক সময় 'আসো' যেমন বুঝায় আবার 'যাও'-ও বুঝায়! প্রতি রাতে আঘন ঋষির কাছে মজিবর, ভাসানী, আগরতলা মামলা, বাঙালি, বিহারি, মাউরা...এ সব শব্দ শুনতে শুনতে আর বুঝতে বুঝতে অথবা কিছুই উদাস মনে না শুনে ও না বুঝে...শুধুই আসন্ন প্রসবা কুকুরীর মতো তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ শক্তিতে উঠান ভরা শেফালি ফুলের গন্ধ নিতে নিতে একরাতে ইন্দুবালা ঋষির মনে হবে বুঝি এই মাঘের হিম আকাশ ছেয়ে ফেলেছে অসংখ্য

শিউলি ফুল! না কি তার চোখের ভুল? আকাশের অত অত তারাই কি নেমে এল উঠানে? ভোর রাতের শুকতারা কি সন্ধ্যা রাতের সন্ধ্যাতারা... ইন্দুবালার মাতামহ তারা চিনত ভালো। মুচি মানুষ হলে কি হয়। গুরুর দয়ায় কবিরাজি আর জ্যোতিষ শাস্ত্র শিখেছিল বেশ। নাতনীকে কোলে করে জ্বলজ্বলে শিকারি কালপুরুষ কি ধ্রুবতারা চিনিয়েছে। চিনিয়েছে সপ্তর্ষি মণ্ডল। প্রথম প্রথম বিয়ের পর ননদিনীদের কাছে আকাশের তারা চিনাতে যাওয়ার আদিখ্যেতায় অনেক কথাও সইতে হয়েছে, 'বাহ্, ঋষি ঘরের মেয়ে মানুষ হয়ে যে পুরুত ঠাকুরদেরও হার মানাতিছ বউদি! তোমার দাদুর পৈতে ছিল নাকি?' এরপর আর কে কথা বাড়ায়! সে মুচির মেয়ে, মুচির বউ...মুচির মা হবে! তাই সই। দাদুর মতো বংশ বৃত্তি অতিক্রম করে রামায়ণ পড়তে চাওয়া, কবিরাজি আর তারা গুনতে শেখা মুচির জন্য অধর্ম বটে! তবু এই আট মাসের পোয়াতি ইন্দু বালা আকাশের দিক দিশা আর ভুলতে পারে কই? দাদু যে তাকে সব শিখিয়ে গিয়েছিল! ভরা পেটে আকাশের দিকে চাইলেই কত তারা! আসলে তারা নয় সেসব। বাপ-ঠাকুর্দাদের আত্মারাই মৃত্যুর পরে আকাশে ঠাঁই পেয়ে আমাদের আলো দেখায়! তখন আঁতুড় ঘরের বেড়ার ফুটো দিয়ে হু হু ঢুকে পড়বে নিরাকার উত্তরের বাতাস আর অজস্র শিউলি ফুলের সুঘ্রাণের ভেতর নাক টান করে শ্বাস নিতে নিতে তীব্র ব্যথায় নীল হয়ে যাবে ইন্দুবালা ঋষি... ভোরবেলা জ্ঞান ফিরলে সে দেখবে তার মাথার কাছে কোলাহল করছিল পড়শি বউ-ঝিয়েরা।

'ছেলে হয়েছে তোর ইন্দু!'

গরম জলে দাই সদ্য প্রসূতির রক্তমাখা গা ধুইয়ে দিতে দিতে বলবে, 'এই মাঘেও এত শিউলি ফুল গাছে...না জানি দেশে কোন্ অশান্তি শুরু হয়! মাঘে ছেলে হলো তোর...মাঘন রাজা!'

মাঘ থেকে মাঘন। আর এক 'মাগন' অর্থ ভিখ-ঝিক করা। ভিক্ষে করে খাওয়া। না, স্বামী আঘন ঋষি বেঁচে থাকতে ইন্দুবালাকে ভিক্ষে করতে হয় নি। ছেলে মাঘন যত দিন বেঁচেছিল কি ছেলে মাঘন যতদিন বেঁচে থাকবে...ততদিন কি আর ইন্দুবালাকে ভিক্ষে করতে হয়েছে? ততদিন আমানুল্লাপুর গ্রামের জিয়ালা নলতা পাড়ার এই ঋষি বাড়ির কোন মেয়েমানুষকে রাস্তায় নামতে হয় নি। অথচ, আজ পাঁচ বছর হয় আগের এক মাঘে... ইন্দুবালার এক মাত্র বেটার...আর ত' চার মেয়ে...চার মেয়েই এখন শ্বশুরবাড়ি...মাঘ মাসে জন্মানো তার বেটা যার নাম রাখা হবে মাঘন...পাঁচ বছর আগে ঠিক মাঘের এক ভোররাতেই সে মারা যাবে। মারা যাবে? নাকি তাকে ক্রসে দেবে? আর সেই থেকে আজ পাঁচ বছর হয় বিবশ অঙ্গ ইন্দুবালার বেটার বউ সুমতি ঋষি... জোয়ান মেয়ে ছেলে...রাস্তায় রাস্তায় সংসার চালাতে ভিখ-ঝিক করে বেড়াবে। বেটা মাঘন বেঁচে থাকলে এতদিনে তার বয়স হয়ে যেত চল্লিশ। ইন্দুবালার আঠারো বছরে বিয়োনো প্রথম সন্তান যদি হয় মাঘন, তবে ইন্দুবালার বয়স আজ পঞ্চাশ পেরিয়ে আরো আট বছর বেশি হবে। এমন অঙ্ক

কষতে শেখাও সেই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুচির জন্য...চাঁড়ালের জন্য... শূদ্রের জন্য যে নিষেধ করেছিলেন, যে কাজ ভগবান শূদ্রকে করতে আজো নিষেধ করেন এবং চিরকালই করবেন...ইন্দুবালার মাতামহ দীননাথ ঋষি যদি সেই কাজই আগ বাড়িয়ে সারাজীবন করার মতো দুঃসাহসী হয়েছিল, তবে আর আশ্চর্য কি যে জীবনভর ইন্দুবালার মাথার উপর দেবতাদের অভিশাপ ঘুচবে না? নয় এই বয়সেই ইন্দুবালা কেন বিধবা হবে, হবে পুত্রহীনা ও পঙ্গু? এ অস্পৃশ্যের শাস্ত্র পড়তে চাওয়ার ফল! সত্যিই তো, ইন্দুবালার চেনা যে মুচি পরিবারের পুরুষেরা দিনভর সেঁকো বিষ দিয়ে কি তীর মেরে গরু-ছাগল মেরে বেড়াচ্ছে আর চামড়া চুরি, জুতা পালিশ আর কুলা-ঝুড়ি বোনা ছাড়া যাদের আর কোন কাজ কোনদিন ছিল না বা থাকবে না, শাস্ত্র বাক্য যারা কোনদিন অমান্য করবে না, মুচি হয়ে ছেলেকে যারা কখনো স্কুলে পড়তে পাঠাবে না...তারাই ত' ভাল থাকে। ইন্দুবালা একে শূদ্র তায় মেয়েমানুষ হয়ে দাদুর কাছে কবিরাজি শিক্ষা করেছে। আঁক কষতে, বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তে আর আকাশের তারা চিনতে শিক্ষা করেছে। সে-ও তো ভগবানের কথা ডিঙ্গিয়ে চলা, নয়? আর ইন্দুবালার স্বামী আঘন ঋষিই কি...স্বামীর নাম মুখে আনা ঠিক নয়...অবশ্য এ শুধুই ভাবনা...মুখে বলা ত' নয়...তা' সেই আঘন ঋষিই কি সুস্থির মানুষ? ছেলেকে তার শখ হলো স্কুলে পড়ায়। আমানুল্লাপুরে সুবিধার স্কুল নেই বলে ছেলেকে সে পাঠিয়ে দেবে নিজের বোনের বাড়ি সেই খানপুর গাঁয়ে। ছোট ছেলে বাপ-মা'র চোখের সামনে না থাকলে কি ঠিক থাকে? পাঁচ ক্লাস পড়া শেষ না করতেই মাঘন কি জড়িয়ে গেছিল নকশালিদের দলে? আর কে না জানে এই নকশালরা ভগবানের সব বাছ-বিচার উল্টে ফেলতে চায়? শুধুই কি জাত-অজাত? তারা যে চায় সব মানুষ সমান হবে আর ধনী গরিব কিছুই থাকবে না? এমন কথা মুসলমানদের আল্লাহও বুঝি বলে? মাঘন বেছে বেছে মিশবে...মাঘন বেছে বেছে মেশা শুরু করেছিল...সেই সব কিছু উল্টে ফেলতে চাওয়া নকশালিদের দলে যারা বড়লোক কুপিয়ে মেরে ফেলত...সংগ্রামের পর পর এই দক্ষিণ বাংলার তল্লাটে তল্লাটে যারা জোতদারদের খুন করে জমি বিলাবে গরিবদের ভেতর...মাঘন কেন তাদের সাথেই মিশবে? এ সবই কি রক্তের দোষ নয় ইন্দুবালা? যে দোষ...শাস্ত্র আর ভগবানের টেনে দেওয়া সীমারেখা পার হয়ে চলা, চকখড়ি দিয়ে আঁকা বৃত্তের দাগ পা দিয়ে ঘষটে মুছে ফেলার এই দোষ কি দাদু দীননাথ, বাবা আঘন ঋষি আর মা ইন্দুবালার কাছ থেকেই মাঘন পাবে না? পায় নি? কি হতো যদি মুচি পাড়ার আর দশটি ছেলের মতো মাঘনও শিখতে পেত কি করে সেঁকো বিষ দিয়ে গরু মারতে হয়, কি করে নিহত পশুর চামড়ায় লবণ মাখিয়ে শুকাতে হয় রোদে বা শহরের রাস্তার কোন চৌরাস্তার মোড়ে ল্যাম্প পোস্টের নিচে বসে বাবু-সাহেবদের পায়ের জুতা সেলাই বা রং পালিশ করতে হয়। ভগবান বলেন যার যা ধর্ম। বামুনের ধর্ম পাঁচালি পাঠ আর শুদ্দুরের ধর্ম জুতা সেলাই। উল্টাতে গেলেই গোলমাল। ইন্দুবালার শ্বশুর ভরত ঋষি বেঁচে থাকতে পর্যন্ত দেবতাদের এই বিধান এ বাড়িতে মানা হবে।

মানা হতো। শ্বশুর কথাটি কইতেন কম। নিজ হাতে গরু মারতে কি চামড়া শুকাতে তার কোন শরম হয় নি। কিন্তু শ্বশুরের ছেলের হলো বাবুয়ানা স্বভাব। যেন বামুন বা বৈষ্ণবটি...জীব মারতে তার কষ্ট হয়...তাই বেছে নেয়া হলো শহরে গিয়ে জুতা সেলাইয়ের নরম কাজটি...কাজও নরম, তাই পয়সাও বেশি না...আর যত না জুতা সেলাই তার থেকে বেশি মাথায় শুধু ভদ্রলোক হিন্দু মুসলমানদের কাছ থেকে শোনা রাজনীতির গল্প! কে আয়ুব খান, কে ভুট্টো, শেখ মুজিব, ভাসানি, ইন্দিরা গান্ধি....বাপ রে! ছেলে হামা না দিতেই বাপের মাথায় ঝোঁক চাপে কি না ছেলেকে পড়াশুনা শিখিয়ে দিগগজ বানাবে! তাই কি হলো? আর তাই কি হয়? মাথার উপর ভগবান আছেন না? তিনি কি তার নিজের হাতের গড়া বিধান এত সহজে উল্টে দেবেন? চামারের ছেলের বিদ্বান হওয়া কি আই,এ, বি,এ, পাস হওয়া তো হলোই না, মাঝখান থেকে বাপ-দাদার আয়-রোজগারের একটা বৃত্তিও শিখলো না! এদিকে মরণ ঘনিয়ে এসেছে তার কপালে! পাঁচ বছর আগের মাঘের এক ভোররাতে কালো জামা আর কালো চশমা পরা, বন্দুক কাঁধের মানুষেরা তাকে ডেকে নিয়ে যাবে উঠানের এই শিউলি গাছের তলা থেকেই...আরো অদ্ভুত দ্যাখো...পাঁচ বছর আগের সেই মাঘেও গাছে ফুল থাকবে...শরতের ফুল শীতেও যখন ফোটে বা ফুটেছিল, তখন বুঝতে হয় বা বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে ভগবানের এঁকে দেওয়া বিধানের ওলট-পালট ঘটছে যার শেষ হয় আর জীবের মৃত্যুতে...অবশ্য পেপারে নাকি লেখা হবে ছেলেকে তার পুলিশ অস্ত্রের কারখানা থেকে গ্রেপ্তার করেছিল। তখনো ইন্দুবালার অঙ্গ বিবশ হবে না। তখনো তার বেটার বউ সুমতিকে রাস্তায় ভিখ চাইতে হবে না আর পনেরো বছরের বড় নাতনী পদ্মকে স্কুল ছেড়ে বুড়ি ঠাকুর মা'র বাহ্যি-পেচ্ছাপ পরিষ্কার করা, রান্না আর ছোট ভাই-বোনদের দেখার কাজ শুরু করতে হবে না। কালে কালে সবই শুরু হয়ে গেছিল অবশ্য, যখন মাঘন ঋষিকে পাঁচ বছর আগের মাঘের তেইশ তারিখের এক ভোররাতে উঠানের শিউলি তলা থেকে কালো পোশাকের পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায়...ফুটফুটে, ভরা পূর্ণিমার আলোয় মা-বউ-বড় মেয়ের কান্নার ভেতরে চলে যেতে যেতে অলক্ষ্যে একটি দুটি শিউলি ফুল মাঘনের ঈষৎ বাবড়ি চুলের মাথার উপর পড়েছিল, পড়বে, পড়ে...

২

১৭ই জানুয়ারি ২০০৫-এর ভোররাতে মাঘন ঋষির পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ও নিহত হবার খবরটি ছড়িয়ে পড়তে পড়তে আমাদের এই ছোট্ট উপজেলা শহরে বেলা ন'টা বা দশটার মতো বেজে যাবে। চায়ের দোকান, পেপার বিক্রির স্টল যেখানে রাতের বাসে ঢাকা থেকে রাজধানির পেপারগুলো আসে কি ছোট-খাট সরকারি অফিসগুলোয়...সবখানেই পৌঁছে যায় আমাদের এই ছোট্ট শহরে প্রথম পুলিশের হাতে কারো মৃত্যুর খবর। আমাদের এই ছোট শহরের কাঁঠালবুনিয়া

বাজারের কয়েকজন দোকানদার ফিসফিস করে আমাদের জানাবে যে সেই ভোর রাতে বাজারে ঝাঁপ তোলা তাদের দোকান ঘরের ভেতর ঘুমানোর সময় প্রায় আট কি দশ রাউন্ড গুলির শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে যাবে। এবং তারপরই পুলিশ তাদের ঘুম থেকে তুলে একটি লাশ দেখিয়ে বলবে যে সন্ত্রাসীদের সাথে বারুদ বিনিময়ের সময় মাঘন ঋষি হত হয়েছে। অবশ্য এই কাহিনী শুনবার পরও মাঘন ঋষিকে আমাদের অনেকেই চিনবে এবং অনেকেই চিনবে না। আমরা যারা তাকে চিনব তারা তাকে একজন নিরীহ, গরিব মানুষ হিসেবেই চিনব। যদিও তার সম্পর্কে এলাকায় মাঝে মাঝেই বাতাসে গুজব শোনা যাচ্ছিল যে ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়েই অভাবের সংসার থেকে ছেলেকে তার বাবা আঘন ঋষি কাছেই ইব্রাহিমপুরে পিসির বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে প্রাইমারি ক্লাস শেষ না করেই সে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রুদ্রবরণ সাহার মাধ্যমে অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়বে। আরো শোনা যাচ্ছিল যে দশ কি এগারো বছর আগে মাঘন শোলার বিলের জলে মুক্তিযোদ্ধা রাকিবুল ইসলাম ও স্কুলশিক্ষক বদরুদ্দিন মাহবুবকে রাম দা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করবে। সাথে তার সঙ্গীসাথীরাও থাকবে অবশ্য। মামলায় মাঘন ঋষি প্রধান আসামিদের একজন হয়েও বেশ কিছুকাল জেল হাজতে থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে বলে আমরা জানতে পাব। বাতাসে আরো ভাসছিল যে সে 'জনযুদ্ধে'র মানুষ হিসেবে এই ক'দিন আগেই দুর্গাপুর গ্রামের মঞ্জুর, ফতুল্লাপুর গ্রামের মিরাজ ও রিপনের সাথে জনযুদ্ধের প্যাডে হাতিপাড়া গ্রামের কমল দাসের বাড়িতে তিন লাখ টাকা চাঁদা আর বড়ইপোতা গ্রামের সুশান্ত শীলের বাড়িতেও আড়াই লাখ টাকা চাঁদা চাইবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমরা যে মাঘন ঋষিকে চিনব বা দেখব তার সাথে এই গায়ের লোম খাড়া করা গল্পগুলোর নায়ক মাঘন ঋষির সাথে মেলানোটা কষ্টের। বাতাসে যে মাঘন ঋষির গল্প শোনা যায় আর উপজেলা শহরের চায়ের দোকানে দুপুর বারোটার পর ঘুম চোখ মুছতে মুছতে যে মাঘন আসে, দু'জন কি একই মানুষ? না তা' আদৌ হওয়া সম্ভব? ছোট-খাট একটা মানুষ। নেহাতই হাল্কা-পাতলা গড়ন। মাথার চুল সামনের দিকে চলে এসেছিল। শ্যামলা রঙ, ভাসা ভাসা চোখ। আর দশটা সাধারণ মানুষের মতো চেহারা। তবে, হ্যাঁ...খুব সাধারণ হয়তো না। খুব সাধারণ হলে তাকে দু'বেলা দু'টো খেতে হলেও কিছু করতে হয়। মাঘনের কোন কাজ-কর্ম নেই। দুপুর বারোটায় চোখ মুছে সে এই উপজেলা শহরের সবচেয়ে বড় চায়ের দোকানটায় আসে। সেখানে তার কাছে হোণ্ডা চড়ে আরো কিছু মানুষ জন আসে। আমরা জানি যে তারা 'জনযুদ্ধে'র মানুষ। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা চায়ের দোকানে হৈ চৈ করবে। কখনো সন্ধ্যার আগেই আবার কখনো হয়তো সন্ধ্যার একটু আগে বা পরে তারা ফের হোন্ডায় চড়েই, বাতাসে ধূলো উড়িয়ে কোথায় যেন যায়? আমাদের ছোটবেলায় যখন সাইক্লোস্টাইল প্রেসের দোকান ছিল, তখন এই

প্রেসেও মাঝে মাঝে দিনমান পড়ে থাকবে এই লোকগুলো। সন্ধ্যার দিকে কালি-ঝুলি মেখে ভূত হয়ে হাতে একগাদা কাগজ নিয়ে বের হবে। আমরা জানব যে ওগুলোকে বলে নকশালিদের পোস্টার। আর এই আমরা বড় হতে হতে যখন কিনা সাইক্লোস্টাইল ছাপাখানা আর নেই, আমাদের উপজেলা শহরের কম্পিউটার-ফটোকপির দোকানেই তারা আসবে (তারা মানে তাদের ভেতর যারা জোয়ান ছিল তারা একটু বুড়োটে হয়ে গেছে। তাদের কেউ কেউ আবার বেঁচে নেই। অনেক আগেই পুলিশের গুলিতে বা জেলখানায় শেষ হয়ে যাওয়ার কথা তাদের। নতুন মানুষেরা তাদের জায়গায় পার্টিতে আসবে)। কিন্তু, আমাদের এই দক্ষিণ বাংলায় নকশালিদের এই যে সাতাত্তর ভাগের রাজনীতি...এ তো আমাদের বাপ-দাদাদের সময় থেকেই চলে আসছে...এখানে ঘরে ঘরে 'পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি,' 'ইস্ট পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল),' 'বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল),' 'পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল),' 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি,' 'জনযুদ্ধ' কি 'লাল পতাকা।' এমনকি যারা আওয়ামী লীগ, বিএনপি কি জাতীয় পার্টি করে, তারাও দিনের বেলা সরকার গড়ার ঐ পার্টিগুলো করে আর রাতে তারা নকশাল। আমাদের কার ঘরে একটা ভাই, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই কি কেউ না কেউ নকশাল নয়? দেশ স্বাধীনের পর থেকে কি আরো ভাল করে বললে সেই পাকিস্তান আমল থেকেই ত' এমনটা হয়ে আসছে! কাজেই মাঘনকে চায়ের দোকানে হোণ্ডা চড়ে আসা 'জনযুদ্ধে'র নেতারা চা-সিঙারা খাওয়াক কি বেকার মাঘনকে তারা মাস কাবারে কোনমতে সংসার চালানোর কিছু পয়সা দিক...মাঘন যদি এইসব নকশাল দলের কোনটার সদস্য হয়ে থাকে, তবে পার্টি তাকে সংসার চালাতে পয়সা দেবেই...তাতে দোষের কি? আর মাঘন যে খুব লাট-বেলাটের মতো চলে তা'ও না। বড় মেয়ে পদ্মটা তার স্কুলে যায়। অন্য দু'টো ছেলে যমজ...বছর দুই বয়স। পদ্মর বয়স আট/নয় বছর হবে। ঘরে মা আছে আর বউ। মাঘনের চেয়ে ঢের ঢের বড় সন্ত্রাসী আমাদের এই এলাকায় আছে। ঐ যারা দিনের বেলায় আওয়ামী লীগ কি বিএনপির বড় লিডার, এলাকার এমপি আর রাতের বেলা নকশাল! সত্যিকারের নকশালদের থেকে এরাই খুন-খারাবি, চাঁদাবাজি করে বেশি। আমাদের এই তল্লাটে সন্ত্রাসী হিসেবে ক্রসফায়ারে মাঘনকে দেবার আগে আরো অন্তত একহাজার সন্ত্রাসীকে কি ক্রসে দেওয়া যেত না? অথবা এই মাঘন সেই মাঘন নয়? আমাদের ভেতর যে দু-একজন ঘটনার সময় ভোররাতে মাঘনকে তার বাড়ির উঠানের শিউলি তলা থেকে মাঘের হিমে সাদা পোশাকের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে দেখেছে বা দেখে থাকবে, তারা বলে বা বলবে যে এ মাঘন সেই মাঘন হতেই পারে না! এমনো হতে পারে যে কোন দুর্দ্ধর্ষ সন্ত্রাসীর নামের সাথে মিল বলেই আমাদের মাঘন ধরা পড়লো? আর পুলিশের গল্প ছড়াতে কি লাগে? আজ মাঘনের নামে,

কাল তোমার বা আমার নামে 'টপ টেরর' সিল মেরে বাজারে গল্প ছড়াতে খুব বুঝি সমস্যা? সত্যি কথা বলতে কি, মাঘন ঋষি মারা যাবার পরই পুলিশের বরাতে আমাদের স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোয় নানা ধরনের খবর ছাপা হয়। একই প্রতিবেদনে পুলিশ সোর্স আর অন্য মানুষদের বক্তব্যে সম্পূর্ণ উল্টা কথা ছাপা হতে থাকে। তখন আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি যে এক মাঘ জ্যোৎস্নার রাতে জিয়ারি নলতা গ্রামের ঋষি বাড়ির উঠানে শিউলি তলা থেকে বেঁটে-খাটো, রোগা, শ্যামলা ও ভাসা ভাসা চোখের যে নিরস্ত্র মানুষটিকে সাদা পোশাকের পুলিশ মা-বউ-মেয়ের কান্না আর প্রতিবেশীদের ভয়ার্ত নৈঃশব্দ্যের ভেতর থেকে হ্যান্ড কাফ পরিয়ে নিয়ে যায়, সে আদৌ কোন সন্ত্রাসী ছিল কিনা? মাঘন ঋষি সন্ত্রাসী ছিল কি ছিল না সেটা বুঝতে আমরা স্থানীয় সংবাদপত্রের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি, বারবার খবরটা মন দিয়ে পড়তে থাকি এবং তারপরও বুঝতে পারি না যে মাঘন ঋষি সন্ত্রাসী ছিল কিনা, সন্ত্রাসী হয়ে থাকলে সে কতটুকু সন্ত্রাসী হয়ে থাকবে কিম্বা পুলিশের এই হত্যা ভুল কি সঠিক?

**স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রতিবেদন**

**সাতক্ষীরার উপজেলায় ক্রসফায়ার**

**চরমপন্থী মাঘন ঋষি নিহত, অস্ত্র উদ্ধার, ঢাকা, কুষ্টিয়া ও বগুড়ায় ক্রসফায়ারে আরো ৪ সন্ত্রাসী নিহত**

গতকাল ভোর ৩টার সময় সাতক্ষীরার তালা উপজেলার জিয়ালা নলতা নামক স্থানে পুলিশের সাথে ক্রসফায়ারে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল জনযুদ্ধ) নেতা মাঘন ঋষি নিহত হয়েছে। এ সময় ২ পুলিশ আহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১টি পাইপগান, ১টি বন্দুক ও ৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে।

সংশ্লিষ্ট থানার ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল দুপুরে পুলিশ মাঘন ঋষিকে (৩৫) তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে থানায় ৫টি হত্যাসহ ১১টি মামলা রয়েছে। পুলিশ তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রাতে জিয়ালা নলতা এলাকায় অস্ত্র উদ্ধার করতে যায়। রাত ৩টার সময় সেখানে পূর্ব থেকেই ওঁত পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা মাঘন ঋষিকে ছাড়িয়ে নিতে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। এসময় সন্ত্রাসীদেরই ছোড়া গুলিতে মাঘন ঋষি নিহত ও পুলিশ বাহিনীর দুই সদস্য আহত হয়। সন্ত্রাসীরা ৫০ রাউন্ড ও পুলিশ ২০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। ঘটনাস্থলে সন্ত্রাসীদের ফেলে যাওয়া ১টি পাইপগান, ১টি বন্দুক ও ৩ রাউন্ড গুলি পুলিশ উদ্ধার করেছে। ওসি আরো জানান, গতকাল সকাল সাড়ে দশটায় নিহতের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি ও দুপুরে সাতক্ষীরা সদর

হাসপাতালে মর্গে লাশের ময়নাতদন্ত শেষে লাশ তার স্বজনদের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

## কে এই মাঘন ঋষি?

তালা উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নের আমানুল্লাহপুর গ্রামে ১৯৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন মাঘন। তার বাবা আঘন ঋষি ঝুড়ি, ডালা তৈরি করে কোনো রকমে অভাবের সংসার চালাত। সংসারে দারিদ্র্যের কারণে ছোট থেকেই উপজেলার খানপুর গ্রামে তার পিসির বাড়িতে থাকত। সেখানে প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া শেষে জড়িয়ে পড়ে অপরাধ জগতে। পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি আঞ্চলিক নেতা রুদ্রবরণ সাহার মাধ্যমে সে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে। পরবর্তীতে মাঘন ঋষি তালা অঞ্চলের প্রভাবশালী এবং রাজনৈতিক পরিবারের শেল্টারে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ঐ পরিবারের এক নেতার ভাড়াটিয়া হিসেবে ১৯৯৪ সালে ৬ই নভেম্বর ঘোনার বিলে তালার মুক্তিযোদ্ধা রাকিবুল ইসলাম ও স্কুলশিক্ষক বদরুদ্দিন মাহবুবকে তার সহযোগীদের মাধ্যমে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। চাঞ্চল্যকর এই মামলায় মাঘন ঋষি ছিল অন্যতম আসামি। ঐ মামলায় সে দীর্ঘদিন জেলহাজতে থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

## গ্রেফতারের পূর্বে মাঘন ঋষি

মাঘন ঋষি দীর্ঘদিন পর জেলহাজত থেকে ছাড়া পেয়ে চরমপন্থী জনযুদ্ধের সক্রিয় সদস্য হিসেবে উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলে চাঁদাবাজি করতে থাকে। মাঘন ঋষি তার সহযোগী হিসেবে দুর্গাপুর গ্রামের মঞ্জুর, ফতুল্লাপুর গ্রামের মিরাজ ও রিপনের সাথে জনযুদ্ধের প্যাডে হাতিপাড়া গ্রামের কমল দাসের বাড়িতে তিন লাখ টাকা চাঁদা আর বড়ইপোতা গ্রামের সুশান্ত শীলের বাড়িতেও আড়াই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে চিঠি দেয়।

## যে স্থানে ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটেছে

জেলার সবচেয়ে ভয়ংকর সন্ত্রাসী জনপদ তালা সদর ইউনিয়নের জিয়ালা নলতা গ্রাম। এই গ্রামেরই পাশেই খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা। পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী হাফিজুর রহমানের বাড়ি এই গ্রামে। রাত তিনটার দিকে ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটার পর গতকাল সকালে সেখানে একাধিক ব্যক্তির সাথে আলাপ করলে তারা জানায়, গভীর রাতে হঠাৎ ৭/৮ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা

গেছে। ঘটনাস্থলের দুশো গজ দূরে কাঁঠালবুনিয়া বাজার। কয়েকজন দোকানদার নাম না প্রকাশ করার শর্তে জানায়, গুলির শব্দের কিছুক্ষণ পর পুলিশ আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তোলে এবং একটি লাশ দেখিয়ে বলে, সন্ত্রাসীদের সাথে গুলি বিনিময়ে চরমপন্থি মাঘন মারা গেছে।

**স্বজনদের বক্তব্য**

নিহত মাঘনের স্বজনেরা জানায়, এলাকার একটি পরিবারের সাথে মাঘনের বেশ কিছুদিন যাবত বিরোধ চলে আসছিল। গত কয়েকদিন পূর্বে গ্রাম্য শালিসে মাঘনকে মারপিটসহ নাকে খত দেয়ানো হয়। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ঐ পরিবারের লোকজন পুলিশকে দিয়ে মাঘন ঋষিকে গ্রেফতার করে এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

*দৈনিক সংবাদ দূত, ১০ম বর্ষ, ৩৩৫ সংখ্যা, সোমবার ১৭ই জানুয়ারি ২০০৫ সাল।*

'কি মুস্কিল! এতো রশোমন!'

'রশোমন?' আমরা খুব অবাক হয়ে বাশার ভাইয়ের দিকে তাকাব যিনি মাঘন ঋষির মৃত্যুর পাঁচ বছর পর আমাদের এই ছোট্ট উপজেলা শহরে আসবেন ঢাকার একটি অফিসের পক্ষ হয়ে...একা মাঘনই নয়...আমাদের এই তল্লাটে গত পাঁচ বছরে যত মানুষ পুলিশ কি র‍্যাবের সাথে বিনা বিচারে গুলি খেয়ে মরেছে...তাদের পরিবার-পরিজন, স্থানীয় মানুষ, সাংবাদিক, থানা-পুলিশ সবার সাক্ষাৎকার নিয়ে গবেষণা করবেন। গোটা বাংলাদেশই নাকি তিনি ঘুরে বেড়াবেন। আরো বিশেষ করে 'নকশাল' বলে পুলিশ যাদের মেরেছে ও মারবে তাদের জন্যই তাঁর এই কাজ। বাশার ভাই আমাদের তল্লাটেরই ছেলে। শোনা যায় তিনিও আণ্ডার-গ্রাউন্ড রাজনীতিরই মানুষ। কয়েক বছর ঢাকায় থেকেও এখন আবার পুরনো সাথীদের যাদের কিনা প্রশাসন একের পর এক গুলি করে মারছে...যদিও বাশার ভাইয়ের মতে...প্রশাসন কখনো সত্যিকারের চোরাকারবারি কি অস্ত্রের আড়তদারকে মারে না...সেই সব পুরনো সাথীদের কেন আর কি দোষেই বা খুন করা হয়েছে সেসব বিষয়ে কাজ করতেই নাকি তাঁর এই আসা। আমরা, এই তল্লাটের কিছু 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো' ছেলে, পড়াশোনা শেষ অথচ বেকার...এমন ক'জনা তার সাথে জুটে গেছি।
'রশোমন কি?'

পুরোনো সংবাদপত্রের ফাইল থেকে চোখ তুলে বাশার ভাই মুচকি হেসে সিগারেটে টান দেন। চায়ের কাপের তলানি শেষ করে আমাদের ক্লাবঘরটি খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে উত্তর দেন, 'ঐ একটা জাপানি সিনেমা আর কি। এক

তরুণ দম্পতি বনের ভেতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় এক ডাকাত এসে লোকটিকে মেরে তার বউকে ধর্ষণ করে। পরে আদালতে ভিন্ন ভিন্ন জবানবন্দি। ডাকাত বলছে এক কথা। মৃত লোকটির বউ বলছে আর এক কথা। গাছের আড়াল থেকে এক কাঠুরিয়া সব দেখেছে। সে বলছে আর এক রকম। আবার প্ল্যানচেটে মৃত মানুষটির আত্মা বলছে অন্য রকম। কোনটা তাহলে সত্যি? এই দ্যাখো মাঘনকে নিয়ে তিন রকম কথা শুনছি। পুলিশ বলছে সে ছিল টপ টেরর। তার পরিবার সংবাদপত্রের কাছে দাবি করছে যে সে ছিল গরিব, নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষ। আবার তোমাদের মত সাধারণ মানুষের মত হচ্ছে যে কিছু এক্সট্রিম লেফটিস্ট গ্রুপের সাথে পরিচয় থাকলেও মাঘন টপ টেরর নয়। অমন পরিচয় এই এলাকায় সবারই সবার সাথে আছে। মাঘনকে টেরর হিসেবে ক্রসফায়ারে দিলে তার আগে এই এলাকার অন্তত আরো এক হাজার মানুষকে ক্রসফায়ারে নেওয়া লাগা। এখন আমি ঢাকা থেকে আসা মানবাধিকার কর্মী কোন্ কথাটাকে সত্য মনে করবো?'

৩

যেহেতু এভাবেই ইন্দুবালা ঋষি তার একমাত্র ছেলের মৃত্যুর পর ভগবানের শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘনের শাস্তি, শূদ্র-অস্পৃশ্য-নারীর জন্য চকখড়ি দিয়ে এঁকে দেওয়া গণ্ডি পা ঘষটে পাড়িয়ে যাওয়ার শাস্তি জানতে থাকবে তার বিবশ অঙ্গের যন্ত্রণায়, বেটার বউ সুমতির গ্রাম ছাড়িয়ে উপজেলা, উপজেলা ছাড়িয়ে জেলা শহর পর্যন্ত ভিখ-ঝিক করার গ্লানি আর বড় নাতনীর দিনমান অক্লান্ত গৃহশ্রমে...আমাদের মনে হবে মাঘনের বুড়ি মা-বউ-মেয়ের মতো মন্দ দশায় আর কেউ নেই। আরো যেহেতু এই গ্রামের কেউ কেউ তাদের ভিটে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের হুমকি ধামকি দিচ্ছে, সেহেতু মাঘনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর সেই হত্যা বিষয়ে খোঁজ-খবর করতে ঢাকা থেকে আসা বাশার ভাইকে আমরা বলবো এ তল্লাটে যত মানুষের মৃত্যুই ক্রসফায়ারে হয়ে থাক না কেন, সবার আগে মাঘনের মা ইন্দুবালার বাড়িতেই যাওয়া যাক।

'পদ্ম! ও পদ্ম!'
'আসি দিদিমা!'

মাটির ঘর লেপা কোনমতে শেষ করেই উঠানের চাপকলে মাটিমাখা হাত ধুয়ে দৌড়ে আসে পদ্ম। দিদিমার মল-মূত্রেও এতটুকু মেয়ের কোন ঘৃণা নাই। কেমন দয়া মাখা শরীর এইটুকু মেয়ের তাই শুধু ভাবে ইন্দুবালা ঋষি। দেশ স্বাধীনের পরে অনেক মানুষই যেমন ইন্দুবালাদের মতোই গরিব থেকেছে, কেউ কেউ ধনীও হয়েছে খুব। মাটির বাড়ি থেকে টিনের বাড়ি, টিনের বাড়ি থেকে দালানকোঠা, নতুন দালানে নতুন নতুন যন্ত্র...যেমন টেলিভিশন কি জল ঠাণ্ডা ও

বরফ করার যন্ত্র...কত কি এসেছে! ইন্দুবালা সতেরো বছরের মেয়েটি এই ঘরে যেমন এসেছিল, তেমনি রয়ে গেছে সবকিছু। বলতে কি আরো খারাপ হয়েছে। মাটির ঘরের এই দেয়াল ঝুরঝুর। ওখানে উঠানে গর্ত। দিন-রাত পদ্ম আর কত লেপবে? লেপা-পোঁছা, ছোট ছোট তিনটি ভাই-বোন আর বুড়ি দিদিমার গু-মুত পরিষ্কার, রান্না, কাপড় কাচা...নাতনীর দুই হাতের চামড়া খসখসে হয়ে উঠছে। বয়সের তুলনায় তাকে বড় দেখায়। ক্লান্ত দেখায়।

'ডাবর দেব দিদিমা?'

হ্যাঁ, এই গরিব চামারের বাড়িতেও একটি কাঁসার ডাবর আছে বৈকি। ইন্দুবালা তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল। সেটাই এখন ইন্দুবালার প্রস্রাব ফেলতে লাগে।

'না-' ঘরের একমাত্র খাটটায় বালিশে আধা-শোয়া অবস্থা থেকে একটু উঁচু হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করতেই বুকের কাছে দম তার খিঁচে বের হয়ে আসতে চায়।

'তুমি থাকো দিদিমা! আমি দেখি!'

পদ্ম উঠে মাথার কাছের জানালাটা খুলে দেয়। একটু হাওয়া আসে তাতে। বেটার বউ সুমতি তাকে বলে না বটে কিন্তু ইন্দুবালা কি বিছানায় শুয়েই টের পায় না যে এ গ্রামের মানুষ কেউই আর চায় না যে তারা দুই অনাথ বিধবা আর তাদের বড় হতে থাকা এই নাতনী আর ছোট ছোট তিনটা বাচ্চা তাদের সাকুল্যে এই ভিটাখানা আঁকড়ে বেঁচে থাকে? তল্লাটের মাতব্বরেরা দিন গুনছে কবে ইন্দুবালা মরবে আর তখন সুমতিকে তার ছেলে-মেয়ে সুদ্ধ এই ভিটা থেকে উচ্ছেদ করে তার বাপের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেবে? মরবে না! ইন্দুবালার এত সহজে মরণ নেই!

'পদ্ম আছে? সুমতি ঋষি? ইন্দুবালা?'

দরজায় কারো গলার স্বর। উঠানের সামনে গিয়ে একটু খুশিই হবে পদ্ম। বাবার সাথে পরিচয় ছিল হাবিবুর কাকার। সেই হাবিবুর কাকা...তালার প্রাইমারি স্কুলের টিচার...সাথে আরেক অচেনা ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছেন। ছোটবেলা হাবিবুর কাকা আর পদ্মর বাবা নাকি একই স্কুলে পড়ে থাকবে। সঙ্গের ভদ্রলোক একটি চেকশার্ট পরা। বাবা বা হাবিবুর কাকাদেরই বয়সী।

'পদ্ম মা, উনি তোমার এক কাকা হন। বাশার কাকা। ঢাকা থেকে আসিছেন। তোমার বাবাকে যে বিনা বিচারে র‍্যাব মেরে ফেলিছে, তা' নিয়ি কথা বলতি চান। তোমার মা কই?'

'মা আজ বেশি দূর যায় নি গো ভিক্ষে করতে কাকা! এসে পড়বে আধা ঘন্টার ভেতর। আপনারা বসেন!' পদ্ম তাদের দু'টো মোড়া এগিয়ে দেয়।

ইতঃস্তত লাগে হাবিবুরের। ছেলেবেলায় মাঘনের সাথে এক স্কুলে যখন সে

পড়েছে, তখনো তাদের অবস্থা এত খারাপ ছিল না যে এ বাড়ির বউ-মেয়েদের ভিক্ষে করতে হবে। হাবিবুর নিজেও গরিব ঘরের সন্তান। তার বাবা পরের জমিতে বর্গা দিত। হ্যাঁ, মাঘনের বাবা আঘন কাকা জুতা সেলাই করতো। তবু, বাড়ির মেয়েদের ত' ভিক্ষা করতে হয় নি? আর, এই দ্যাখো পদ্ম...স্কুলে তাকে ছাত্রী হিসেবে পান নি কি তিনি? মেয়েটির মাথা খারাপ ছিল না। কিন্তু পড়া-শুনা ত' মাথায় উঠেছেই, এখন একে বিয়ে দেয়াও কঠিন। বাবা নেই। টাকা নেই। দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু বাপ যার ক্রসফায়ারে মারা যায়, তেমন দাগি সন্ত্রাসীর মেয়েকে কে বিয়ে করবে? অথচ সত্যিই কি মাঘন সন্ত্রাসী ছিল? যেটুকু দোষে মাঘন 'সন্ত্রাসী,' সেটুকু দোষে কি হাবিবুরও সন্ত্রাসী নন? এই দক্ষিণ বাংলার কোন্ যুবক ছেলে...হিন্দু-মুসলিম, ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত যেই হোক...হাতে জীবনে একবার অস্ত্র ধরে নি? আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিক্সে কে একবার জড়ায় নি? হাবিবুর নিজেও জড়িয়েছেন। এখন হয়তো বহুদিন হয় আর নেই সে রাজনীতিতে। যে বাশার আজ ঢাকার এক মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে দক্ষিণ বাংলার তল্লাটে তল্লাটে বিনা বিচারে মেরে ফেলা মানুষদের পরিবার-পরিজনদের ইন্টারভিউ নিতে এসেছে, সে-ও কি একসময় জড়িত থাকে নি 'নিষিদ্ধ' রাজনীতিতে? হাহ্...হাবিবুরও আজ শাসক শ্রেণীর ভাষায় ভাবছেন...'নিষিদ্ধ,' 'চরমপন্থী,' 'নকশাল', 'আলট্রা লেফট,' 'উগ্রপন্থী বাম'...তোমার রক্তে পলায়ন হাবিবুর! বর্গা চাষীর ছেলে থেকে নিদেনপক্ষে ভদ্রলোক প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার হতে যে যে আপোস দরকার হয় তা' তুমি করেছ! অথচ, তুমিই কি একদিন দীক্ষিত হও নি সেই অমর শ্লোগানে, 'বিপ্লব কোন ভোজসভা নয়, নয় সূচিকর্ম বা প্রবন্ধ রচনা?'

উঠানে পদ্ম দু'টো মোড়া পেতে দিলে বাশার কাগজ-কলম বের করে। সাথে ক্ষুদে মাইক্রো-টেপও চলতে থাকে, '...তোমার বাবাকে যেদিন ধরে তুমি কি সেদিন বাড়িতে ছিলে?

'হ্যাঁ, ছিলাম।'

'কোথা থেকে ধরেছিল?'

এমন কথার উত্তরে পদ্ম একবার মাথা নিচু করে তার ওড়নার খুঁট ধরে আঙুলে পেঁচায়। তারপর অস্ফুটে একটা শ্বাস ফেলে মাথার উপর দিয়ে শিউলি গাছটির দিকে একবার তাকায়। আঙুল তুলে দেখায়, 'ওই ওই জাগারতে। ভোরের দিকি ধরিছিল।'

'মারছিল কোন জায়গা?'

'এদিক খেজুরবিনে, হাটখোলা কোনদিকি সেখানে।'

'তারপর লাশ?'

'লাশ পুলিশি নিয়ে গিছিল পোস্ট মাটামে। সেইখানতে আমরা আবার নিয়ে আইছি বাড়ি।'

বাশার ভাই আর হাবিবুর ভাইকে দু'টো মোড়ায় বসতে দিয়ে আমরা মৃত মাঘনের বাড়ির উঠানের গাঁদা ফুল ও জবা গাছ এবং ফুলশূন্য শিউলি গাছটিও দেখতে থাকি। মাঘনকে আমরা চিনলেও বা চায়ের দোকানে মাঘনের সাথে প্রায়ই আমাদের দেখা হলেও তার মৃত্যুর পর গত পাঁচ বছরেও আমরা তার বাড়িমুখো হই নি। আজ পাঁচ বছর পর মাঘনের এই বছর পনেরোর কিশোরী মেয়েটিকে দেখতে দেখতে হঠাৎই আমাদের মনে পড়বে...কিম্বা বলা ভাল যে মাঘনের মেয়ের মুখে 'পোস্ট মাটাম' শব্দটা শুনবার পর আমাদের মনে পড়বে বছর পাঁচেক আগে মাঘনের মৃত্যুর সংবাদে কৌতূহলী জনতার স্রোতে আমরাও ভিড়ে গিয়ে মাঘনের লাশ দেখতে উপজেলা হাসপাতালের মর্গের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম... মাঘনের ক্রন্দনরতা যুবতী স্ত্রী ও তার ফ্রক পরা বছর দশেকের একটি মেয়েকে আমরা তখন দেখে থাকব...তখনো সেই মেয়েটির স্তন ওঠে নি আজ যেমন উঠেছে...তখনো তার চুল এত লম্বা হয় নি আজ যেমন হয়েছে...এবং পদ্মকে লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎই আমাদের মনে হবে যে শ্যামলা এই কিশোরীটি যথেষ্ট সুশ্রী। আমাদের এই ভাবনা স্রোত থিতিয়ে উঠবার আগেই উঠানে দেখতে দেখতে অনেক পাড়া-পড়শি ভিড় করবে যারা এলাকায় বহু দিন পর আসা ও প্রায় ভুলে যাওয়া এখানকারই মানুষ বাশার ভাইকে নতুন মানুষ ভেবে যথেষ্ট কৌতূহলী। বাশার ভাইকে অডিও টেপ আর নোটবুক হাতে পদ্মকে প্রশ্ন করতে দেখে তাদের কৌতূহল আরো বেড়ে যাবে এবং বাশার ভাই, এই অভিযানে বাশার ভাইয়ের ছায়া সঙ্গী হাবিবুর ভাই ও পদ্মকে কেন্দ্রে রেখে তারা উঠানে অর্ধ-বৃত্ত জমায়েত তৈরি করে নিজেদের ভেতর নানা গুঞ্জনে মত্ত হবে, 'উনি কে গো? চিনতি পারলাম না?'

'নতুন এয়েচে!'

'কি করতি চান?'

'আহ্, দ্যাখো না? ইন্টারভিউ নিতিছে সে মাঘনের মেয়ের!'

'পাঁচ বছর পর ইন্টারভিউ নিয়ি কি হবিনে?'

'হবিনে একটা কিছু!'

'উনি কি সাংবাদিক? কোন্ টিভি চ্যানেলের? নাকি সরকারের লোক?'

'সরকারের লোক হলি বোধ করি পদ্মদের কিছু সাহায্য দিবি। পদ্মদের তইলি দিন ফিরলো। তা সরকারের লোক আমাদের নামটা লিখবি না? আমরা কিছু পাব না?'

ইত্যকার নানা সংলাপের ভেতরই বেলা বারোটার সূর্য আরো হেলে যেতে থাকলে পদ্মর মা সুমতি ঋষি তার রোজকার ভিক্ষা সেরে বাড়ি ফিরে উঠানে জড়ো হওয়া মানুষ দেখে ভড়কে যাবে, 'বাড়িতে এত লোক কিসির? ও পদ্ম, তুই কার সাথে কথা কতিছিস? হাবিব ভাই কখন আলেন? গরিবির বাড়িতি হাতির পাড়া!'

'লজ্জা দিতিছো বৌদি? মাঘনটা চলি যাবার পর আমি গরিব স্কুলমাস্টার তোমাদের জন্য কিছু করতি পাল্লাম না তাই...আর...শোন, ইনি বাশার ভাই! ঢাকার মানুষ। সরকার থেকে মানে তোমার র‍্যাব থেকে যাদেরই বিনা বিচারে ক্রসে দেওয়া হতিছে উনি তাদের সবার পরিবারের সাথে কথাবার্তা কতি আসিছেন। একটু জিরোয়ে নিয়ে বসো ত' বৌদি!'

বাশার ভাইয়ের এমতো সংলাপের পর মৃত মাঘনের উঠানে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি জনতার জটলায় গুঞ্জরণ বেড়ে যাবে। যেমন, সুমতির জিরনোরই বা কি দরকার? এতদিন পর কেউ যদি সত্যিই তার স্বামীর হত্যার বিচার বিষয়ে তদন্ত করতে আসে, তবে সুমতির কি উচিত নয় এখনি সাক্ষাৎকার দিতে বসে যাওয়া? তবে এই বাশার লোকটিরই বা কি এমন গরজ সে এক মরে যাওয়া মুচির ভিক্ষে করে বেড়ানো বউয়ের বাড়ি এসেছে কথা-বার্তা কইতে? সরকার কি সত্যিই র‍্যাবের ক্রসে দেওয়া, ক্রসে মরে যাওয়া মানুষগুলোর হত্যার বিচার করবে? তাই কি হয়; না তা' হওয়া সম্ভব ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব হট্টগোলের ভেতরেই সুমতি চাপকলে মুখ-হাত ধুয়ে দু'টো এনামেলের প্লেটে খানকয়েক চিঁড়ের নাড়ু আর দু' গ্লাস জল বাশার ও হাবিবুল ভাইয়ের সামনে রেখে বলবে, 'আমি যে ভিখ-ঝিক করে খাই তা' সারা এলাকার মানষি জানে। আমি কিছু লুকাবো নানে। এখন ভিখিরির ঘরে...জাতে মুচি আমরা...জল খাতি মানা না থাকলি খাতি পারেন। আমাদের খাবার খালি বুঝবো যে অভক্তি করেন না আমাদের...'

'না- না- ঠিক আছে!' বাশার ভাই তড়িঘড়ি একটি চিঁড়ের নাড়ু গালে পুরলে সুমতির ক্লান্ত মুখে একটা অস্পষ্ট হাসির আভাস দেখা যাবে ও সে তখন পদ্মকে তাড়া লাগাবে দু' কাপ চা বানিয়ে আনার জন্য।

'কন দাদারা, কি জানতি চান?'

'র‍্যাব যে আপনার স্বামীকে নিয়ে গেছিল, তার কাছে কি কোন অস্ত্র বা বন্দুক পেয়েছিল?'

'না- কি পাবে? আপনি এই গ্রামের লোকের কাছে শোনেন। পাশের আরো দুই গ্রামের সবার কাছে জানতি চান। সবাই স্বীকার করবিনে যে তার কাছে কোনো বন্দুক পায়নি। আমরা গরিব মানুষ দাদা। বন্দুক দিয়ি, অস্তর দিয়ি কি করব?'

'কথা উনি ঠিকই কইছেন। ওনার স্বামীরে র‍্যাব মারিছে ঠিকই। কিন্তু কোনো অস্তর-শস্তর পায় নি কো।'

'আপনার স্বামীকে কি ওনার রাজনীতি করার কারণেই ধরেছিল?'

'কি জানি দাদা। রাজনীতি উনি কি করবেন? ছেলেন মুচি মানুষ। ছোট জাত। আমার এই উঠানেরতে...খ্যাতা-কাপড় সব নাড়ে দেয়া...ওই জাগারতে ধইরে নিয়ে গেল। ওই জাগায় বসেই সে কুলা টুলা বানাতো। কাজ করতো। কত কথা শুনি। শুনলাম যে ৬০ হাজার টাকা দিয়ে মারায় দেছে বিরোধী পার্টি।'

'কারা টাকা দেছে, নাম বলা যাবে?' গুড়ের চায়ে দ্বিতীয় বারের মত চুমুক দিয়ে বাশার ভ্রূ কুঁচকায়।

'তাই কি কওয়া যাবিনে? তবে আশপাশের সবাই জানে।'

'উনি মারা যাওয়ার পরে আর কি থানা থেকে পুলিশ এসেছিল?'

'না, আর আসেনি।'

'কোন সাংবাদিক?'

'না।'

'আপনি কি কোন মামলা করেছেন?'

'না। কীভাবে করব? আমাদের তো একটা লোক নেই। টাকা নেই। সমাজ নেই। ক্ষমতা নেই। পুলিশ এমনি এমনি ভালো লোকডারে মাইরে ফেলে দিল। পুলিশির নামে কেস করে কি বাঁচা যাবে? দেখেন আমার আজ মন ভালো নেই। কালকে রাত্রিতে সালিশ হয়েছে আমার নিয়ে। এখানে আমরা থাকতি পারব কি পারব না তাই নিয়ে সালিশ। এত কষ্ট যে, আমি আমার বাড়ি থেকে বেরুতিই পারি না। এত হিংসার ভিতরে আছি যে কি কব! সব শুনলি বিশ্বাস যাবেন না! আবার ভিখ না করলি যে পেট চলে না দাদা!'

বাশার ও হাবিবুল ভাই গুড়ের চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালে আমরাও তাদের সাথে সাথে মৃত মাঘনের বাড়ির উঠানের সামনে দিয়ে বের হবার সময় ফুলশূন্য শেফালি গাছটির কয়েকটি অর্ধ মৃত পাতা আমাদের মাথার উপর টুপটাপ ঝরে পড়লে আমরা তখন এক বৃদ্ধাকে ভেতরের ঘর থেকে চিৎকার করতে শুনতে পাব, 'এত লোক এত সাম্বাদিক আলো আমার ছলের কতা শুনতি। আমারে কেউ একবার সামনে নেলো না!' চলৎশক্তিহীন তার শরীরে পেঁচানো সাদা থান, রুক্ষ ও ছোট করে ছাঁটা চুল বা সেই চুলের পলিত শ্বেতাভা এক ঝলক আমাদের চোখে তখন পড়বে অথবা পড়বে না। আর এভাবেই এ গ্রামে ইন্দুবালা, শিউলি ফুল ও মাঘন ঋষির গল্পের প্রথম পর্বটুকু সমাপ্ত হবে কিম্বা হবে না।

*রচনা: ১৪-২৪ ডিসেম্বর ২০১০।*

# স্বপ্ন সংহিতা

*ক. অধি-কবিতা :*

*এ নয় মৃত্যু কফিন,*
*অধীত টাইমট্রেক্স*
*ভিড়ের সদ্গতি যথা*
*খুঁটে খেল উন্মার্গ শকুন*
*বৃথাই মঙ্গল-হাড়*
*হাতে করে ঘুরলো চণ্ডাল।*

আকাশ ছেঁড়া-খোঁড়া এখন- হাল্কা পাটল রং। সেই বিস্তীর্ণ জলদেশ, যা কোথাও হ্রদ কোথাও নদী কোথাও সমুদ্র তাই হ্রদনীলনদীরূপোসমুদ্রনীল জল মিলে মিশে গাঢ় সবুজ...তারই উপর দিয়ে চলে গেছিল সেই কাঠের দীর্ঘ আয়ত ব্রিজ...কাঠ কি লোহার সাঁকো...কি কাঠলোহাব্রোঞ্জ মিলেমিশে আজ বিস্মরণ- যেমন ঐ ছেঁড়া আকাশ।

আমার জানা ছিল, চোখ দিয়ে যার শেষ ছোঁয়া যায় না তেমনি দীর্ঘ ঐ ব্রিজ আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, অপেক্ষা করছিল ব্রিজের নিচে সারবাঁধা যত উবরী-কবিতী-জঙ-কোষ-লক্ষ্মীবিলাস-কোষা-বন-বার্কী-বালামী-ঘাসী-বেশাল-লিপি নৌকা। ঘন মাস্তুল ও অজস্র পালতোলা সে লিপিনৌকার সারিকে জাহাজ বলেই ভুল হতে পারে। কিন্তু, না- নৌকার মাল্লাদের আমি চিনি না- সম্ভবত আজ তাদের সাথে আমার পরিচয় হতে পারে। যেমন ত্রিজ্ঞানী রাজকন্যা আমাকে জানান। সে কথনে পরে আসা যাবে...*জীবন আমার ভাসমান ছিল কিনা/ ছিল কিনা হিমশৈলের নিখাদ টুকরো/ জ্বলে ওঠা একটি জ্যামিতিক চোখ/ ছন্দোবদ্ধ করাত-টুকরো/ হায় জীবন আমার...*

সে কথায় পরে আসা যাবে।

প্রায়ই যেমন হয়:

আমার বাসার সামনের গলিটায় সকালে বেড়াতে গেলে নারীর স্তন অথচ পুরুষের শিশ্নবিশিষ্ট একদল উদ্ভট গড়নের মানুষ আমার দিকে নর্দমার আবর্জনা ছুঁড়ে মারতে থাকে...ফলত সেই সব সকালে প্রাতঃভ্রমণ থামিয়ে শক্ত মুখে ঘরে

ঢুকি আমি- একাই খাবার খেতে হয় টেবিলে বসে যেহেতু কেউই বেঁচে নেই- মা বাবা ভাই বোন- বছর ছয়েক আগে এক অজানা রোগে তারা সব মরে গেলে 'পর আমি তাদের হাড়গুলো আমার প্রিয় ফুলের টবগুলোয় পুঁতে ফেলি। কারণ লগসের শৃঙ্খলা তখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি- নৈয়ায়িক নিয়মের বালাই ছিল না কোন বেগুনী এ ব্রহ্মাণ্ডে, ঈশ্বর জানেন। সেহেতু পড়শিরা আমার দায়িত্ব নিতে আসে...ফলতঃ ভায়োলিন বাজে ও আদিখ্যেতায় মেজাজ চড়ে যাবার কারণে আমি তাদের গুলি করেছিলাম কিনা জানি না- কিছুদিন পর গোটা মহল্লা উজাড় হয়ে যায়। সাদা চাদরগুলো তাদের মুখের উপর থেকে কেবলি সরে যায়- বাতাস তাদের কাফনগুলো উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়...অনাবৃত শরীরগুলোয় ক্রমাগত হিলিয়াম কণা...ক্রমশ মৃত প্রতিবেশীরাও শুভ্র হাড় আর অরূপ গ্রীবাযুক্ত কঙ্কালে পরিণত হয়...তাদেরও আমি টবে পুঁতে ফেলি।

যে কথা বলছিলাম।

যেসব সকালে বাড়ির সামনের গলিতে হাঁটতে গেলে নারীর স্তন অথচ পুরুষের শিশ্নবিশিষ্ট একদল উদ্ভট গড়নের মানুষ আমার দিকে নর্দমার আবর্জনা ছুঁড়ে মারতে থাকে, সেসব সকালে আমি প্রাতঃভ্রমণ বাদ দিয়ে ঘরে ঢুকি ও শক্তমুখে প্রাতঃরাশ করি। ফলত মাঝে মাঝেই আমার খুব প্রসাধন করতে ইচ্ছা করে।

আয়নার সামনে এসে দাঁড়াই- যেহেতু আমার আয়নাটি ত্রি-স্তর কাচ বিশিষ্ট (এ পৃথিবীর তাবৎ আয়নাই কি ত্রি-স্তর কাচ বিশিষ্ট? কে জানে উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে কিনা পদার্থবিদ্যা!) আর যত বিষণ্ন ও শিশিরভেজা ওষ্ঠ-রঞ্জনী হা: যত কাজলের কার্বন যৌগ:

*মেকআপ- মুখোশের সন্ততি যাহা*
*মুখোশ। পার্সোনা? হে আমি,*
*হে রোমক সম্রাট!*
*কোথায় আমার সুপ্রিয় অভিনেতা দল?*
*রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত। তবে যত নট-নটী আছ,*
*নাট্যশালে করো আয়োজন-*
*পরে নাও পার্সোনা- মুখোশ যত,*
*উজ্জ্বল সুকুমার বীর ও ভাঁড়ের*

ত্রি-স্তর আয়নায় আমার প্রথমে ফুটে ওঠে উষা ও পার্সী অগ্নি। এ সেই আয়না যার সাহায্যে এক মানুষ অপর মানুষের স্বপ্নে ঢুকে যেতে পারে। না কোন মন্ত্র, না কোন গুপ্ত বিদ্যার আয়োজন: শুধু এ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মুখটি স্মরণে এনে বলতে হবে,

*আমি তোমার স্বপ্নের ভেতর ঢুকে যাব,*

*তোমার স্বপ্নে আমার আবির্ভাব-*
*না: কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না তুমি।*

না, তেমন কোন মন্ত্রসিদ্ধ বা যাদুকরী আয়নার প্রয়োজন নেই। এমনকি রেল স্টেশনে কুড়িয়ে পাওয়া টুকরো ঘষা কাচ হলেও চলে। প্রয়োজন শুধু উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মুখটি স্মরণ। আর এটাই কঠিন। অধিকাংশ সময়েই আমরা মানুষেরা আমাদের পরিচিত মানুষদের এমনকি খোদ প্রেমাষ্পদেরও মুখটি স্মরণে আনতে পারি না। মুখ ছিল শুধু সেই ত্রিজ্ঞানী রাজকন্যার। তাই ত্রি-স্তর আয়নায় আমার প্রথমে ফুটে ওঠে উষা ও পার্সী অগ্নি। অতঃপর স্বাধিকারপ্রমত্ত অরণ্য- অরণ্যের প্রান্তে মার্জিত বোগেনভালিয়ার ঝাড়, শ্বেতপাথরের প্রাসাদের রেখা--- কাচের কফিনে আধ-শোওয়া বসে আছেন ত্রিজ্ঞানী রাজকুমারী, 'আজো তুমি আসবে না আমাকে দেখতে? এত একা থাকি? কবে তুমি সত্যি সত্যিই তোমার ঘরটা ছেড়ে রওনা দেবে, বলো?'

'আজই, রাজকুমারী। আপনার নির্দেশে এ শহরের মড়কের পর প্রতিটি শবদেহের হাড়গুলো সফেদ না হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করছি। আজ ১৩ই চৈত্র-আপনি বলেছিলেন আজই রওনা দিতে?

'হ্যাঁ- ঠিকই। কিছু মনে থাকে না আজকাল।' রাজকুমারী এলায়িত হাসেন। তাঁর ডিম্বাকৃতি মুখ ঘিরে চূর্ণ কুন্তলের হিমাভা, ফের তার নিঃশ্বাস আছড়ে পড়ে আমার আয়নায়, 'আমার কাছে আসতে অনেক বিপদে পড়বে তুমি। মাথা ঠাণ্ডা রেখো। সবটা বলবোও না আমি তোমাকে। শুধু বলি, প্রথমে তুমি দেখা পাবে এক পিঠাঅলার (পিঠাঅলার গল্পটুকু কিন্তু আমি তোমায় কিছু বলবো না- সে গল্প নির্মাণ করবে তুমি, যাতে সময় নেবে এক বছর), তারপর দেখা হবে তোমার এক পুরোনো বান্ধবী ও তার দুই উপ-পতির সাথে- এ সাক্ষাতে সময় নেবে দু' ঘণ্টা যা তোমার কাছে মনে হবে মিনিট দশেক। তারওপর যে নতুন দেশে পৌঁছবে তুমি, সে দেশে কুষ্ঠআরোগ্য নিকেতন, মানসিক প্রতিবন্ধীদের হাসপাতাল আর ভবঘুরে পতিতা কেন্দ্র ছাড়া কিছুই থাকবে না। বড় অসুস্থ হয়ে পড়বে তুমি সেখানে। বছরখানেক বন্দিত্বের পর মুক্তি পাবে তুমি...এক শস্যক্ষেত্রে তোমার সাথে দেখা হবে এক সিংহ বাহিনী নারীর। এরপর তোমার সামনে পড়বে অনিঃশেষ ধু ধু এক দ্রাক্ষা-কুঞ্জ, যেখানে পরিবারের মৃত সদস্যদের সাথে পুনরায় দেখা হবে তোমার। কিন্তু এক আর্মি ইনভেস্টিগেশনে পুনরায় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সবার শেষে, আজ সন্ধ্যায় তুমি দেখা পাবে সেই অতল বিস্তীর্ণ জলধির- এক আয়ত কাঠের ব্রিজ, মনে রেখো- আর জনা তেত্রিশ মধ্যবয়সী মাল্লা। সাবধান, এটাই হবে কঠিনতম যাত্রা। সবশেষে আমার দেখা পাবে তুমি।'

**খ। আদি পুস্তকঃ**

*৪১:২ ফরৌন স্বপ্ন দেখিলেনঃ নদী হইতে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট গাভি উঠিল...।*
*৪১.৫- তাহার পরে তিনি নিদ্রিত হইয়া দ্বিতীয়বার স্বপ্ন দেখিলেন; এক বোঁটাতে সাতটি স্থূলাকার উত্তম শীষ উঠিল। যোশেফ এই দুই স্বপ্ন ব্যখ্যা করলেন এভাবেঃ ৪১:২৯- সমস্ত মিশর দেশে সাত বৎসর অতিশয় শস্যবাহুল্য হবে (পবিত্র নূতন নিয়ম)।*

যেভাবে
পিঠাঅলার
স্বপ্ন বা গল্পটি
নির্মাণ করতে যেয়ে
আমি নিজেই পিঠাওয়ালী হয়ে উঠেছিলামঃ

...কত কত দিন পর মড়ক ও শাপাচ্ছন্ন আমাদের এই মহল্লা ছেড়ে নগরীর প্রাণকেন্দ্রের দিকে আমি যাত্রা শুরু করি। প্রথম আধা মাইল না কোন মানুষ না কোন যানবাহন আমার চোখে পড়ে। আধা মাইল হাঁটার পর শহরের 'আজব বাজার' স্কোয়ারের কাছে আমি পৌঁছে যাই। ছোটবেলায় এ স্কোয়ারে বাবার হাত ধরে বহুদিন এসেছি আমি। তখন কি গমগম করতো গোটা স্কোয়ার! পুরনো দিনের কথা ভুলতে, মিটাতে তৃষ্ণা, স্তব্ধ এ স্কোয়ারের কৃত্রিম কিন্তু আজো সচল ফোয়ারায় আঁজলা পাততে নত হই আমি।
'পিঠা খাবে মা?'
তাকিয়ে দেখি এক প্রৌঢ় পিঠাঅলা। কাঁধে তার সাদা কাপড়ের এক ছোট থলে। সম্ভবতঃ পিঠাগুলো উষ্ণ। থলের কাপড়ে বাষ্পীভূত জলকণা তেমনি বলছিল।
'দশটাকার বেশি খরচ করতে পারব না। তাতে যা হয় দ্যান।' এটুকু বলে সাদা কাপড়ের আবরণ ভেদ করে সফেদ ভাপা ও মেরুন চন্দ্রপুলি আমার দৃষ্টিগোচর হয়।
'একটা ভাপা আর দু'টা চন্দ্রপুলি...'
পিঠাঅলা তার ডান হাতের টিনের কৌটা ভর্তি সস্তা কাগজের মোড়কগুলোর একটিতে কথামতো একটি নাদুসনুদুস ভাপা আর দু'টো চন্দ্রপুলি পুরে দিয়ে স্কোয়ারের অর্ধ মৃত গাছগুলোর উপর দিয়ে গটগটিয়ে হেঁটে চলে যায়। প্রসন্ন মুখে কাগজের মোড়ক সরাতে যেতেই আমি চোখ তুলে দেখি জনা চার নারী পুরুষ (তিনজন যুবক ও একজন যুবতী) আমার সামনে দাঁড়িয়ে।
'আমরা খুব ক্ষুধার্ত-' তিন যুবক ও এক যুবতী আমাকে বলে।
'মুস্কিল!' আমি মনে মনে ভাবি। নিজে আমি ক্ষুধার্ত নই এ মূহূর্তে। নেহাৎ শখের বশেই পিঠা ক'টা কেনা, তা' নিজে আমি পিঠা না খেলেও তো সাকুল্যে

তিনখানা মোটে পিঠা আমার মোড়কে। ব্রিবত লজ্জায় ঠোঙা খুলে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। তিনটা নয় তো আটটা পিঠা। আমি তিনজনকে তিনটা পিঠা দিয়ে নিজেও একটি খেতে শুরু করি...তখনি দেখি স্কোয়ারের উত্তরকোণ থেকে জনা দশেক মানুষের একটি দল আমার দিকে আসছে। বিভিন্ন বয়সের মানুষ এ দলে- বুড়োবুড়ি যেমন, ছোট ছেলে-মেয়েরাও আছে...তারা ঘিরে ধরে আমাকে, 'তোমার পিঠের গন্ধ খুব সুন্দর। তাছাড়া আমাদের খুব খিদাও লেগেছে!'

পুনর্বার ব্রিবত হয়ে আমি ঠোঙার ভেতর দৃষ্টি দেই (চারটা পিঠে দিয়ে আমি দশজনকে খাওয়াই কি করে?)...সম্ভবত আমি ভুল দেখছি। এ হতেই পারে না! কমসে কম বিশ-ত্রিশটা পিঠা দেখি আমার ঠোঙায়...আমি আমার সামনে জড়ো হওয়া জনা দশেক মানুষের হাতে পিঠা তুলে দিতে দিতে দেখি স্কোয়ার ভর্তি মানুষের ঢল নেমেছে। তাদের মুখে একটাই কথা, 'পিঠা দাও! পিঠা দাও! আজ অনেক অনেক দিন হয় আমরা ক্ষুধার্ত। বহুদিন আমাদের দেশে কোন শস্য নেই!' দশ, বিশ, পঞ্চাশ, শতক, সহস্র...হাজার হাজার মানুষের বাড়ানো হাত আমাকে ঘিরে ধরেছে। আর এ কোন্ অতি-প্রাকৃত শক্তি আমায় ভর করলো? ঠোঙারও অবস্থা দ্যাখো- এইটুকুনি ঠোঙা অথচ পিঠে যেন ফুরোতেই চায় না। জনতা কাঁধে তুলে নেয় আমাকে, 'নারীদেহ যদিও রজঃস্বলা ও সেহেতু স্বতঃই অপরিচ্ছন্ন- কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন। তুমি এ দেশের প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি উপত্যকায় ক্ষুধায় ধুঁকে মরতে থাকা মানুষদের মুখে পিঠা তুলে দাও!'

পুরুষেরা কাঁধে তুলে নিল আমাকে, রমণীরা চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত করে তুললো আমার পা। জনতার কাঁধে চেপে আমাকে ঘুরতে হলো মৃতপ্রায় এ দেশের প্রতিটি গ্রাম ও শস্যক্ষেত, অরণ্য আর উপত্যকা। সমুদ্র সৈকত ও নিশ্চল বন্দরসমূহ।

এভাবে।

হ্যাঁ, এভাবেই...

বিরাণ ও শস্যহীন এক দেশের পিঠেওয়ালী হিসেবে দু'টো বছর কেটে যায় আমার। একসময় দেশের দুর্ভিক্ষ শেষ হলে, জনতার কাছে আমি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠি। শূন্য হয়ে যাওয়া এবং মাহাত্ম্য হারিয়ে ফেলা ঠোঙা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে এবার আমার নিরুদ্বিগ্ন যাত্রা- নির্জন শ্বেতপাথরের প্রাসাদে কাচের কফিনে শুয়ে আছেন দুর্গেশ নন্দিনী।

আমারই অপেক্ষায়।

## পুরোনো বান্ধবী ও তার দুই প্রেমিক

ঝুলনকে আমি দেখি না অনেকদিন। অথচ, আজ পাঁচ বছর পর তার সাথে দেখা হওয়ার কোন কারণই ছিল না। যখন দুর্ভিক্ষ থেকে মাথা তুলে একটি গোটা জাতি পুনর্বার নিয়ন বাতির পোশাকে সাজিয়ে ফেলছে তার বিপনিবিতান, স্টেডিয়াম, আর্ট গ্যালারি...তখন শহরের শেষ প্রান্তে, সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ও দিনটি ১৩ই চৈত্র- পুরোনো সিংহদ্বারের যেখানে গর্জিয়ে উঠেছে জঙ্গল ও যা আমার নিষ্ক্রমণ পথ, সেখানেই ফিরে ঝুলনের সাথে দেখা হলো আমার। শাড়ি পরতে চিরদিনই ভালবাসত সে- আজ তার শ্যামলা ও দীর্ঘ শরীরে কেমন জড়িয়ে আছে এই ঘোর কমলা বর্ণ শাড়ি! কিন্তু তার দুই কাঁধে মাথা হেলিয়ে আছে যে দুই তরুণ...তারা কারা? যে রঞ্জন ভাইকে এত ভালবেসে বাবা-মা'র অমতে পালিয়ে বিয়ে করলো, সে নেই কেন?

'ঝুলন, এই ছেলে দু'টো কে? ছিঃ রঞ্জন ভাই কোথায়?'
ঝুলন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, 'সে ত' তোমাকে ভালবাসত উল্লুক! ন্যাকামি করে তুমি তপস্বিনী সেজে রইলে- আমি জোর করে পেতে চাইলাম। ও তোমার উদাসীনতাকে আঘাত করতেই আমার আহ্বান ফেরালো না! এখন দিন রাত শহরের লাল আলো এলাকায় পড়ে থাকে!'
...কোথাও ঝিঁঝিঁ রাগে মাদলের শব্দ। মাদল নয়। ও ঝুলনের হাসি। শঙ্খিনী সাপের মতো শরীর মোচরায় ঝুলন। পদ্যের ছন্দে গলা চড়ালো,

*মোর পতি গ্যাছে সখী অন্য নারী পাশে,*
*দুই জার হস্তে নিয়া পথে ঘুরি তাই।*

'যাঃ ঝুলন- তুই গোল্লায় যা! আমার কি?'
আকাশের দক্ষিণে জ্বলজ্বল করছে ওটা...শতভিষা নক্ষত্র। দূর কোন মন্দিরে কাঁসার ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ। ভোররাত প্রায়। যদিও এখনো চারপাশে অন্ধকার।...

## সিংহবাহিনী অসুর বিনাশিনী

স্বদেশ ছাড়ার পর নতুন যে দেশে আমি পা রেখেছিলাম তা' ভরা ছিল শুধুই কুষ্ঠ আরোগ্য নিকেতন, মানসিক প্রতিবন্ধী সেবাশ্রম আর ভবঘুরে পতিতা পুনর্বাসন কেন্দ্রে। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি দু'চারজন যাও ছিল তারা নগরপাল। প্রথম দেখাতেই তারা আমার কোমরে রশি বেঁধে ফেলল, হাতে শক্ত লোহার শেকল, 'হে ভিনদেশী মেয়ে! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সুস্থ। তুমি কু'রোগী নও, নও উন্মাদ। আমাদের অসুস্থ পুরুষদের সুস্থ ও সবল সন্তান উপহার দেবে তুমি...'

না !

'আমার মরণপণ আর্তনাদের তীব্রতা অগ্রাহ্য করেই কতিপয় নগরপাল আমাকে ছুঁড়ে দিল এক মানসিক প্রতিবন্ধী তরুণের সেলে।

'জি জে জু জি জে জু জি জি'...একমুখ অদ্ভুত শব্দ আর লাল, সিক্ত লালায় বেঢপ বয়স্ক শিশুটি তার আদিম উল্লাসে কামড়ে দিতে এলো আমার গাল, বাহু ও ঠোঁট। এমন নির্বোধ জীবও ধর্ষণ শিখেছে তাহলে?

না!

কৃষ্ণ তমিস্রায় অনাদি সময় ঢেকে থাকা এই পাথুরে সেলে আমার চিৎকার কোন শব্দই তোলে না?

...ক্রমশ সেই বয়স্ক ও নির্বোধ ধর্ষকের সাথে এক নিরুদ্বিগ্ন পাশাপাশি থাকার ক্ষমতা তৈরি হয়ে যায় আমার। রক্ষীরাও ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকে আমাকে পাহারা দেবার বিষয়টি। স্ফীতকায় আমার গর্ভদেশে একটি সুস্থ নবজাতকের আকাঙ্ক্ষা তাদের সুখী করে তুললে একরাতে প্রচুর তাড়ি খেয়ে হল্লায় মাতে তারা। আমি তখন পাথুরে টাওয়ারের উপর দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম আমার শরীর...

খসখস লাল পর্ণমোচী পাতার মত শূন্য থেকে নিচে নামতে নামতে আমার অভ্যন্তরস্থ জায়মান ভ্রূণ এক অনন্ত উচ্ছ্বাসময় শোণিত স্রোত তৈরি করেছিল আমার উরুসন্ধি ও দুই পায়ে...

**তখন..**

পৃথিবীর মেয়ে আমি। যেমন শস্যক্ষেত্রেরও। বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছিল এক দিগন্তব্যাপী স্তব্ধ ধানক্ষেতে। শারদ গোধূলির আলো এবং সে আলোর একক অনুরণন ছাড়া কোথাও কোন শব্দ ছিল না। ধানক্ষেতের মাঝে বয়ে যাওয়া নালার কালো, থির জলে নত গঙ্গাফড়িং। ধানক্ষেতে এবার ঢেউ উঠেছে। তখন সে পূর্ণা নারীকে আমি দেখতে পাই- তার মুখের আদল বড় চেনা লাগে। সিংহের উপর তিনি বসে। ডান হাতে খড়্গ, বাঁ হাতে বর্শা- হরিদ্রাভ মুখের হাসিটি তবু বিষণ্ণই।

'কে তুমি মা?'

'চিনতে পারছো না? আমাকে আগে দ্যাখো নি কখনো?'

...হ্যাঁ, দেখেছি ত' এই নারীকে আগেও বহুবার। কিন্তু সে কেবলি মৃত্তিকার প্রতিমায়। ইনি যে প্রত্যক্ষ।

'গত পাঁচ বছর বড় কষ্টে তোর জীবনটা কেটেছে। হত্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, পলায়ন ও ত্রাস...আয়...আমার পাশে দাঁড়িয়ে এই খড়্গটা হাতে নে। যত অপশক্তি, যত অসুর...তাদের সবার মুণ্ড নে তুই।'

'মাগো, তুমি ডন কুইক্সোটের মত কথা বলছো। এই ধানক্ষেতে বাতাস

ছাড়া ত' কিছুই নেই। এখানে অসুর কই? কার সাথে যুদ্ধ করবে তুমি?'

মা তবু হাসেন, 'অসুর সর্বত্র। বাতাসে অদৃশ্য অসুর। অসুর রৌদ্রে। পূর্ব-পশ্চিম ও ঈশান-নৈঋতে। আজ অসুর বধের দিন!'

...শূন্যে লক্ষ করতালে হি-হি- ধড়শূন্য যত অসুর মুণ্ডের হাসি। উন্মত্ত আমি খড়্গ চালাই। রক্ত ছিটে আসে গালে।

**গ। 'Sa+tyros'**

*'টায়ার নগরী অবরোধকালে মহাবীর আলেকজান্ডারকে নগরবাসীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। একরাতে আলেকজান্ডার নৃত্যরত অর্ধ ছাগ-দেবতা Satyr কে স্বপ্ন দ্যাখেন। স্বপ্ন-ব্যাখ্যাতা অ্যারিস্টানড্রোস দেবতার নামবাচক শব্দটিকে দু'ভাগে ভাগ করেন ''Sa+tyros' অর্থাৎ `Tyre is thine' বা 'টায়ার তোমার।' আলেকজান্ডার জয়ের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়ে তীব্র আক্রমণ চালান। ট্রয় তার অধিকারে আসে।'*

...আঙুরক্ষেতে একদা মৃত পরিজনদের সাথে আবার দেখা হলো আমার। প্রত্যেকেই ময়লা কাপড় পরে খুব খাটুনি খাটছিল।

'আমরা এখানে যুদ্ধবন্দি,' বাবার অবসন্ন মুখে কুঞ্চন। আলাপ স্থায়ী হতে পারে না। তামার শিরস্ত্রাণ, উর্দির বুকে ব্যাজ সাঁটা এক আর্মিকোর এসে উপস্থিত হয়। কয়েক ঘণ্টা জেরার পর মৃত কিন্তু বর্তমানে জীবন্ত পরিজনদের একটি ওয়াগনে তুলে নেয় তারা।

...একা আমি পড়ে থাকি। *ও আত্মা আমার, চলে যাওয়া গত দিনটির পর বিষাদগ্রস্ত সন্ধ্যা। ও আত্মা আমার, আগামী দিনটার পর শোকগ্রস্ত সন্ধ্যা।*

আকাশ ছেঁড়া-খোঁড়া এখন- হাল্কা পাটল রং। সেই বিস্তীর্ণ জলদেশ, যা কোথাও হ্রদ কোথাও নদী কোথাও সমুদ্র তাই হ্রদনীলনদীরূপোসমুদ্রনীল জল মিলে মিশে গাঢ় সবুজ...তারই উপর দিয়ে চলে গেছিল সেই কাঠের দীর্ঘ আয়ত ব্রিজ...কাঠ কি লোহার সাঁকো...কি কাঠলোহাব্রোঞ্জ মিলে মিশে আজ বিস্মরণ- যেমন ঐ ছেঁড়া আকাশ। আমার জানা ছিল, চোখ দিয়ে যার শেষ ছোঁয়া যায় না তেমনি দীর্ঘ ঐ ব্রিজ আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, অপেক্ষা করছিল ব্রিজের নিচে সারবাঁধা যত উবরী-কবিতী-জঙ-কোষ-লক্ষ্মীবিলাস-কোষা-বন-বার্কী-বালামী-ঘাসী-বেশাল-লিপি নৌকা। একটি কবিতী নৌকার শক্ত পাটাতনে পা রাখি আমি- দুলে ওঠে পাটাতন...হাঃ হাঃ উত্তুঙ্গ হাসির আছড়ে পড়া জলশব্দে আমার

চৈতন্য হয়। দেখি আমাকে ঘিরে কবিতীর চওড়া, পুরুষ্ট খোলসে বসে আসে তেত্রিশ জন প্রৌঢ় মাল্লা। প্রত্যেকের রোদে পোড়া কালো চামড়া, সন্নত স্বাস্থ্য এবং প্রত্যেকেরই শরীরে একটি করে প্রত্যঙ্গ নষ্ট। কারো ঠোঁট কাটা, কারো নাক, কারো একটি কান নেই, কারো একটি চোখ উপড়ানো- তবু খুব বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের এরা প্রত্যেকেই।

'এসো খুকি- এসো- আরে, দ্যাখ্, আমাদের নেতার মেয়ে এসেছে রে!'

লোকগুলো আমাকে নিয়ে কোন নিষ্ঠুর পরিহাস করছে। স্বরনালী থেকে ফ্যাসফ্যাস...বোবা আতঙ্কের একটা শব্দ নিজের অজান্তেই ছিটকে বের হয়ে আসে।

'ভয় পেও না। তোমার বাবা ছিল আমাদের শ্রেষ্ঠ দলপতি। আকাশের সঙ্কেত বুঝতে, বুঝতে মেঘ ও সমুদ্রের তুরীয় লক্ষণ...তাঁর মতো পারঙ্গম ছিল না কেউই। সুতরাং আমরা সবাই মিলে তাকে আমাদের দলপতি হিসেবে নির্বাচিত করি। কিন্তু, নেতা হিসেবে নির্বাচিত হবার পর থেকেই তিনি স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন। নৌকা ও নৌপথের, সুদূর বাণিজ্যযাত্রার প্রচলিত গণতান্ত্রিক নিয়মগুলো তিনি নিষিদ্ধ করে দ্যান। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে আমরা তাকে হত্যা করি। তার শরীর একটি ধারালো ইস্পাতের ছুরিতে খণ্ড খণ্ড করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিই। এই সে ছুরি!'

ঠোঁটকাটা একটি কুৎসিত চেহারার মাল্লা পুরোনো একটি মরিচা পড়া ছুরি আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। চিত্রার্পিত রোদ, আকাশের নীলিমা ও শেষতঃ নিজেকে অবাক করে দিয়ে আমি নিজেই হেসে উঠি...ঝনন্ হাসির মত্ততায়...লক্ষ্য করি বেপরোয়া মাল্লাগুলোর চোখেমুখে ফুটে উঠেছে ভয়...কারণ আমি দু'হাত দিয়েই টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ফেলছি ছুরিটা? ছুরিটা দু'হাতে টুকরো টুকরো ছিঁড়তে থাকি আমি...কিন্তু আমার কোন যন্ত্রণা হচ্ছে না...মাল্লাগুলো প্রচণ্ড ভয়ে এ অপরকে জড়িয়ে ধরে। ছুরি ত' নয় যেন কাগজ কি তুলো ছিঁড়ছি আমি...

স্তব্ধতা। সমুদ্র নেই। নৌকা ত' নয়ই। মাল্লারাও নেই। এক অতিকায় অরণ্যের ভেতর দিয়ে এবার আমার চলা। দিন কি রাত ঠাওর হয় না। রাক্ষুসে বন্য ফার্ন তার পাতার শুঁড়ে ক্রমাগত জড়িয়ে ধরছে আমার ক্ষতবিক্ষত পায়ের পাতা। গাছের বল্কলে আরণ্যক পিঁপড়েদের সংসার...ধারেকাছেই কোথাও রক্তভুক কোন অনাম্নী নিশাচর নড়াচড়া করছে। রবার দিয়ে ঘষে তুলে ফেলা পেন্সিলের দাগের মতোই অন্ধকার মুছে গিয়ে আবার ভোর হয়। সম্ভবত অরণ্যের শেষ সীমানায় আমি পৌঁছে গেছি- ঐ ত' মার্জিত গোলাপি বোগেনভালিয়া, শ্বেতপ্রাসাদের দেহরেখা! কোন মানুষ নেই। এক, দুই...প্রাসাদের সিঁড়ি ভাঙ্গি।

'এসেছ?'

অলিন্দে সেই কাচের কফিন। এক মোমপ্রতিমা তরুণী আধ শোওয়া বসে আছে সেই কফিনে। আমি নতজানু হই।

'এসো'- বলে তরুণী আমাকে আলিঙ্গন করে। আমার কপালে-ঠোঁটে-বিক্ষত

পায়ের পাতায় বারবার চুম্বন করে। অতঃপর আমাকে টেনে নেয় কোলে। কাচের কফিনের ভেতর আমরা দু'জন পরস্পরকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরি...যতক্ষণ না আমাদের স্বতন্ত্র দি-অস্তিত্ব বিলীন হয়ে আসে।

...তখন আমি রাজকন্যার শরীর ধারণ করেছি কিনা অথবা রাজকন্যা আমার শরীর ধারণ করেছে কিনা অথবা দু-জনেই আমরা হয়েছি কিনা একটি শরীর...

চারপাশে পুরু তামাকের গন্ধ। ঘরের ভেতরে জানালার খড়খড়িগুলো টানা। ড. রিজওয়ান সিদ্দিকির ঘরে কত যে বই! তিনি তার পাইপে ধোঁয়ার রিং তৈরি করেন কিছুক্ষণ। চশমার কাচ মোছেন। অবশেষে ভারি দয়ার্দ্র চোখে আমার দিকে তাকান, 'আজ আমাদের- যাদের কিনা তোমরা সাইকিয়াট্রিস্ট বা মনোচিকিৎসক বলে ডাকো, আমাদের মতো একটি ক্লাস কিন্তু মানবসমাজে বরাবরই ছিল। প্রফেট জোশেফ বা নবী ইউসুফ খুব ভাল স্বপ্ন-ব্যাখ্যাতা ছিলেন। সে হিসেবে ফ্রয়েড ত' সেদিনের ছেলে! আসলে সভ্যতা যত কঠিন হয়ে উঠছে, পরিবার ও সমাজ ততই মৃত হয়ে উঠছে, ব্যক্তি ততই অরণ্যে চলে যেতে চাইছে। নিজেকে দুর্গের আড়াল করে ফেলতে চাইছে।'

'নারী ও পুরুষ উভয়ের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ঐ বিকট দর্শন মানুষগুলো কারা যারা আমার দিকে আবর্জনা ছুঁড়ে মারছে?'

'হয়তো তোমার শত্রুরা যারা খুব কাপুরুষোচিত ভাবে তোমার দিকে কাদা ছুঁড়ছে।'

'ঐ রাজকন্যাটি কে?'

'রাজকন্যা তোমার সত্তারই একটি অংশ। পূর্ণাঙ্গ, একাকী অথচ স্বাধীন- কাউকে যার প্রয়োজন পড়ে না। তুমি যা হতে চাও।'

'ঐ পিঠাঅলা কে? আমার ঠোঙা থেকে পিঠা ফুরাচ্ছেই না, এর অর্থ কি?'

'পিঠা সবসময়ই মিন করে প্রাচুর্য। হতে পারে তা' তোমার প্রাণশক্তি, সৃজনশীলতা, ফেমিনিনিটি বা সেক্সুয়ালিটি...যে কোন কিছুই।'

'কেন আমি দেবী দুর্গাকে স্বপ্নে দেখব? আমি ত' তেমন ধার্মিক নই।'

'ব্যাপারটা অত সোজা না। পশ্চিমে যেমন ভার্জিন মেরি, বাংলায় দুর্গা হলেন নারীর তাবৎ পূর্ণতার প্রতীক। শক্তি, রূপ, জ্ঞান, শ্রী- সবকিছু। তোমার অসুরবধের স্বপ্নটাও দারুন। অমন স্বপ্ন দেখতে পারাটা ভাগ্যের ব্যাপার!'

'আমার বান্ধবী ঝুলন আর ওর দুই...'

'হতে পারে ঝুলনও তোমার সত্তার অপর অংশ। যে কোন কারণেই হোক তুমি একটি নিঃসঙ্গ জীবন চাইছো। আবার রক্ত-মাংসের জীবনের প্রতি পিপাসা আজো তোমার সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি। ঝুলন ঐ রক্ত-মাংসের জীবনের প্রতীক।'

'কারা ঐ তেত্রিশ মাল্লা যাদের নির্বাচিত নেতা তাদের গণতন্ত্র কেড়ে নেওয়ায়

তারা নেতাকে হত্যা করে?'

'চুপ!' ড. সিদ্দিক দুই ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে চারপাশে একবার তাকান, 'এমন স্বপ্ন দেখাও যে ভয়ানক ব্যাপার তা' জানো তো? এই স্বপ্নের কথা আর কাউকে বলো না!'

'আর...আঙুর ক্ষেতে আমার বাবা-মা, আর্মি ইনভেস্টিগেশন?'

'হুমম্...এক দিনে সব প্রশ্নের উত্তর ত' দেওয়া সম্ভব নয়। সম্ভবত প্রফেট্ জোশেফও তা পারতেন না।'

...ডাক্তার স্মিত হেসে তার হাতঘড়িতে চোখ বোলান। পরবর্তী পেশেন্টের সময় হয়ে গেছে।

*রচনা ও প্রকাশ: ১৯৯৮, খোলা জানালা, দৈনিক মুক্তকণ্ঠ।*